ISSN : 2709-2348

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা : ৩ ॥ বসন্ত ১৪২৭

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সংখ্যা : ৩ ॥ বসন্ত ১৪২৭

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সংখ্যা : ০৩ ॥ বসন্ত ১৪২৭

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

প্রকাশক
রেজিস্ট্রার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

স্বত্ব
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সংখ্যা : ৩ ॥ বসন্ত ১৪২৭ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২১

মুদ্রণ

নামলিপি
মোস্তাফিজ কারিগর

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

The Rabindra Biswabidyalaya Patrika
[Bilingual Journal of Rabindra University, Bangladesh]
Editor : Biswajit Ghosh
Volume : 03 ॥ Basanta 1427 ॥ February 2021
ISSN : 2709-2356

অনলাইন সংস্করণ : www.rub.ac.bd

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সম্পাদক

বিশ্বজিৎ ঘোষ

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ মাইনুল ইসলাম

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সম্পাদনা পরিষদ

বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক)
মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন (সদস্য)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ মহীবুল আজিজ (সদস্য)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লায়লা ফেরদৌস (সদস্য)
চেয়ারম্যান, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোছাঃ শারমিন আক্তার (সদস্য)
চেয়ারম্যান, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মো. রওশন আলম (সদস্য)
চেয়ারম্যান, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোঃ মাইনুল ইসলাম (সহযোগী সম্পাদক)
প্রভাষক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য, অভিমত বা মন্তব্যের দায় সম্পাদনা পরিষদের নয়, তা একান্তই লেখক/লেখকবৃন্দের।

সূচি

মহীবুল আজিজ ॥ দুটি পুরোনো কাব্য ॥ ১

মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী ॥ রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইর-এর ভ্রমণসাহিত্য : একটি তুলনামূলক আলোচনা ॥ ৯

তাশরিক-ই-হাবিব ॥ *তিতাস একটি নদীর নাম* : লোকজীবনের পাঠ-প্রতিবেদন ॥ ২১

লোকমান কবীর ॥ মঞ্জু সরকারের ছোটোগল্প : নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতা ॥ ৬৩

ফাতেমা-তুজ-জোহরা ॥ বিদ্যাসাগরের কর্মপদ্ধতি ও কৌশল : প্রসঙ্গ শিক্ষা ও সমাজসংস্কার ॥ ৭৭

দীপ্তি রানী দত্ত ॥ লোক-ইমেজ সংস্কৃতি : রিকশাচিত্রে পদ্মমোটিফ ॥ ৮৭

নাহিদা বেগম ॥ সৈয়দ শামসুল হকের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনসংকট ॥ ১০৫

শুভেন্দু সাহা ও তিথি দেবনাথ ॥ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বরূপ : একটি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ॥ ১১৯

মো. আজিম উদ্দিন ॥ বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ : প্রসঙ্গ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ॥ ১৩৩

দেবশ্রী দোলন ॥ রবীন্দ্রগানের গায়কি ও প্রয়োগ ভাবনা ॥ ১৪৫

ইয়াতসিংহ শুভ ॥ *গীতবিতান*-এর পূজা পর্যায় : প্রসঙ্গ পথ ॥ ১৫৩

মো. সোহানুজ্জামান ॥ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* : একটি বিকল্প পাঠ ॥ ১৬৭

সুলতানা রাজিয়া ॥ রবীন্দ্রনাথের *কালান্তর* : বিষয়ভাবনার গুরুত্ব ॥ ১৮৭

ভূঁইয়া ইকবাল ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি অগ্রন্থিত চিঠি ॥ ২১১

Sharmin Sultana ॥ Revisiting Bilateral Trade Deficit between Bangladesh and India ॥ 221

Md. Rifat-Ur-Rahman ॥ Possibilities and Obstacles of Archaeological Tourism in Bangladesh : A Case Study of Nabaratna Temple Compound ॥ 237

Pinke Rani Dey ॥ Forecasting Inflation Rate of Bangladesh : ARIMA and VAR Model Comparison ॥ 251

Mizanur Rahman ॥ Understanding Semantic Taxonomy and Syntactic Realization of Conditional in French ॥ 267

Sohan Mia ॥ Describing Phoneme Inventory of Santali Language : A Linguistic Approach ॥ 283

দুটি পুরোনো কাব্য

মহীবুল আজিজ*

[সারসংক্ষেপ : ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে স্থানান্তরের পরিণামে ভারতবর্ষের অসংখ্য মননসম্পদের ঠাঁই হয়েছে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা, একাগ্রতা ও শ্রমনিষ্ঠার সুপরিণতিতে আবিষ্কৃত ও মূল্যায়িত হয়েছে বহুকাল ধরে অনাবিষ্কৃত থাকা অনেক লেখকের সৃজনশীল-মননশীল সাহিত্যিক নিদর্শন। বর্তমান প্রবন্ধে ব্রিটিশ ভারতের তথা পূর্ববঙ্গের, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের এমন দু'জন কবির দু'টি কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচিত হবে, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার দু'জন বাঙালি কবির সংবেদনশীল কবিমন– একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়নির্ভর কাব্যিকতা।]

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাসকার সুকুমার সেনের প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থ *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*-এ স্থান পেয়েছে বিচিত্র ও বহুমাত্রিক লেখকদের সাহিত্যকর্মের সমালোচনা ও পর্যালোচনা। বস্তুত এ-গ্রন্থ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণির রচনার এক সালতামামিও বটে। প্রাচীন থেকে শুরু করে মধ্য ও আধুনিক যুগের পরিব্যাপ্তিতে সুকুমার সেনের সমালোচনার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সমালোচিত হয়েছে সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম। তবে, এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ অসাধারণ গ্রন্থে অনেক লেখকের রচনাকর্মের স্থান হয়নি। আমাদের অনুমান, এর পশ্চাতে নিহিত ছিল দু'টো মৌলিক কারণ– প্রথমত, স্থান সংকুলানের বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত গৌণ লেখকদের বাদ দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, অনেক লেখকের সৃষ্টিকর্ম রচয়িতার দৃষ্টিসীমার আড়ালে থেকে যাওয়া। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে স্থানান্তরের পরিণামে ভারতবর্ষের অসংখ্য মননসম্পদের ঠাঁই হয়েছে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা, একাগ্রতা ও শ্রমনিষ্ঠার সুপরিণতিতে আবিষ্কৃত ও মূল্যায়িত হয়েছে বহুকাল ধরে অনাবিষ্কৃত থাকা অনেক লেখকের সৃজনশীল-মননশীল সাহিত্যিক নিদর্শন।

বর্তমান প্রবন্ধে ব্রিটিশ ভারতের তথা পূর্ববঙ্গের, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের এমন দু'জন কবির দু'টি কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচিত হবে যে-গ্রন্থদ্বয়ের কোনো আলোচনা সুকুমার সেন এবং পরবর্তীকালের অপরাপর সাহিত্যেতিহাস-রচয়িতা কিংবা সাহিত্য-সমালোচকদের রচনায় স্থান লাভ করেনি। দু'টো গ্রন্থই বর্তমানে ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এ-দু'টি কাব্যগ্রন্থ বর্তমান প্রবন্ধকারের নজরে আসে। তারই ভিত্তিতে আজকের যুগে দুর্লভ কাব্যগ্রন্থদু'টোর সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা। গ্রন্থগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার দু'জন বাঙালি কবির সংবেদনশীল কবিমন– একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়নির্ভর কাব্যিকতার চিত্রটিও লক্ষ করা যায়। এটিও

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অনিবার্যভাবে লক্ষযোগ্য, ইতিহাস, সমাজ, প্রকৃতি ও সমকালের নানা বিষয় উপাদানরূপে গৃহীত হয় তাঁদের কবিতার শিরোনামে ও কবিতাবলিতে। আলোচ্যমান দু'জন কবি যথাক্রমে শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক এবং শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাকের কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম *স্বর্ণ-কলিকা*। মুদ্রিত প্রচ্ছদে প্রথম বন্ধনীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি পরিচিতিমূলক শব্দ 'কবিতাগুচ্ছ'। শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত তথ্যাবলি ইংরেজিতে– "Printed by S. A. Guny, Purba-Bangla Press, Dacca) অর্থাৎ ঢাকা থেকে জনৈক এস. এ. গনি কর্তৃক পূর্ব-বাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় গ্রন্থটি। সাব-টাইটেল-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তথ্যাবলি লক্ষ করা যাক– "স্বর্ণ-কলিকা। (কবিতাগুচ্ছ) শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক প্রণীত। সন ১৩১৩ সাল। মূল্য ৷৷০ আনা। Printed By Surendra Nath Chanda, At the City Press, Dacca" গ্রন্থটির শেষ প্রচ্ছদ এবং 'সাব-টাইটেল' পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দ্বিবিধ তথ্য থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে, ঢাকাস্থ সিটি প্রেসের ব্যবস্থাপক বা মালিক সুরেন্দ্রনাথ চন্দ এবং পূর্ব-বাংলা প্রেসের ব্যবস্থাপক বা মালিক এস. এ. গনি দু'জনই বইটির প্রকাশনার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। হয়তো দু'টো প্রেসেই বইয়ের মুদ্রণকাজ চলে এবং ব্রিটিশ শাসনামলে তথ্য-আইনের বাধ্যবাধকতার ফলে কোনো কিছু গোপন করবার উপায় ছিল না। ফলে, গ্রন্থটির প্রকাশনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্যই ছেপে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থে। প্রাথমিক ছয় পৃষ্ঠাসহ গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৬। আনুমানিক ২৪০ গ্রাম পুরুত্বের সাদা কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থটির প্রচ্ছদ। এটির নকশা পুরোনো দিনে বিবাহ-উপলক্ষ্যে প্রীতি-উপহার জাতীয় প্রকাশনার অনুরূপ।

স্বর্ণ-কলিকা-য় মোট কবিতাসংখ্যা ৬৩। সম্পূর্ণ 'সূচী'– প্রভাত বর্ণন, কে গায়, স্বার্থ, হিতব্রত, কে তুমি, বাঙ্গালী, কালের প্রভাব, বৈষম্য কেন?, ভালবাসা, বিচিত্রতা, কেন ভালবাসি, কমল, বিরহীর আক্ষেপ, সম্মিলন, মহিমা, কীর্ত্তিনাশা, স্নেহ, নরক, সচন্দ্র রজনী, মায়া, কি চাই?, সান্ধ্য তারা, ফুলের সৌরভ, বিধির বিধান, নিদাঘে, মানব জন্ম, কালের গতি, প্রণয়ীর পত্র, শেষ, অহঙ্কার, খেলা, মৃত্যু, নাহি সেই দিন, এস সন্ধ্যা, বাঙ্গালী এমন কেন?, পথিক, দুঃখীর কথা, অমরতা, ডাকিওনা আর, সুখ-স্বপন, সতীত্ব সৌন্দর্য্যে-কামনা, এই কিরে সে ভারত?, শ্মশানে, শান্তি, কে চায়?, উন্মাদিনী, নশ্বরতা, দুর্ভিক্ষ, নির্ব্বাক ভাষা, দুটী বোন, প্রাকৃতিক শোভা, পূর্ণিমার শেষে, সভ্যতা, মহাপূজা, তুমি কি আমার?, হিমালয় : স্মৃতি, যেওনা আর, কোথা ভারতের সেই রতন নিচয়?, আশা সমাধি, পাপীর শান্তি, নিশান্তে বর্ষ, অস্তাচলগামী রবি, বসন্তে। সূচিপত্রে একটি তথ্য প্রদত্ত– "কে গায়'– বান্ধব-এ প্রকাশিত"। অনুমান সংগত, এ-কবির কবিতাবলি সমকালীন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতো।

কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকেই বোঝা যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক বিচিত্র বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি থেকে তাঁর কবিতার বিষয় ও প্রকাশের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। ছয়টি স্তবকবিশিষ্ট একটি কবিতার শিরোনাম 'বাঙ্গালী'। প্রতিটি স্তবকে এবং গোটা কবিতাটিতে বিধৃত হয়েছে কবির হতাশা ও দুঃখবোধ। আছে বাঙালির পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ এবং অন্তর্গত অনৈক্যের তীব্র সমালোচনা। দৃষ্টান্ত :

> হাধিক্ বাঙ্গালি! হায় নাহি লাজ ভয়,
> সামান্য অর্থের তরে বৃথা আত্ম-কলেবরে
> বিদেশীর কাছে সদা করিছ বিক্রয়;
> বিদেশীর পদাঘাত; শ্রাবণের বারিপাত

অম্লানবদনে সবে হৃদি পাতি লয়,
নাহি লাজ, নাহি ভয়, আত্মগ্লানি নাহি হয়,
বিদেশীর পদচ্ছায়া শান্তির নিলয়। (পৃ. ১৫)

প্রতিতুলনায় ব্রজেন্দ্রকুমারের 'বৈষম্য কেন?' কবিতাটির সাম্য-শান্তির কামনা পাঠককে করে আশান্বিত। কবিতাটিতে এক ধরনের দার্শনিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবিতাটির সামগ্রিক পাঠ থেকে তাঁর কবিমানসের যেটুকু পরিচয় ফুটে ওঠে তা থেকে তাঁকে একজন মানবিকতার অনুসারী সহৃদয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতি :

একদিন – সম্ভবতঃ বহু দিন পরে
এই বিশ্ব চরাচরে পরস্পর পরস্পরে
ধরিবে বক্ষেতে; পর ভুলিয়া অন্তরে;
হিংসা দ্বেষ ত্বরা করি ভূমণ্ডল পরিহরি,
পালাইবে বহু দূরে – আঁধার বিবরে,
চির সাম্য বিরাজিবে ভুবন উপরে। (পৃ. ২০)

কবি কাজী নজরুল ইসলামের *অগ্নিবীণা* কাব্যের প্রায় দেড় দশককাল আগে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রকুমারের কাব্যে সাম্য-দর্শনের প্রতিফলন আমাদের পুলকিত করে। তাছাড়া এ কবি ছিলেন প্রবলভাবে উপনিবেশবিরোধীও। তাঁর আরেকটি কবিতার শিরোনাম '*ভালবাসা*'। কবিতাটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি:

ভালবাসা, ভালবাসা, কোথা' ভালবাসা?
শুধু স্বার্থ পরতার ভীষণ শৃঙ্খলভার
বাঁধিয়াছে উভয়েরে পূরাইতে আশা,
ভালবাসা, ভালবাসা, কোথা' ভালবাসা? (পৃ. ২০)

পরবর্তী কবিতাটির ('বাঙ্গালী এমন কেন?') দৃষ্টান্তটিকে বলা যায় আত্মসমালোচনা-ধারার, অর্থাৎ বাঙালি মানুষের মধ্যকার অমিল-মতানৈক্য-বিবাদ এসবের সমালোচনাই কবিতাটির মূল লক্ষ্য। এতে কবির ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টির প্রতিফলনও লক্ষযোগ্য। উদ্ধৃতি অনুসরণ করা যাক–

ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলি – স্বভাব এমন,
পরিবার পরিজন অন্নদানে সংরক্ষণ
নাহি করে একভাবে যাবত জীবন;
অবশেষে সুকৌশলে সামান্য কলহচ্ছলে
ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভিন্ন রহে অনুক্ষণ। (পৃ. ৬২)

পরবর্তী কবিতাটি কবির স্বাধীনতাচিন্তা এবং উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের স্বাক্ষর। গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় হয় প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্যে কবির গ্লানিবোধ। বিষণ্নতার সুর কবিতাগুলোতে স্পষ্ট, কিন্তু হতাশাকে ছাড়িয়ে জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে যাত্রার আহ্বান ছাপিয়ে ওঠে কোনো-কোনো কবিতায়। কবিতাটির শিরোনামেই ('*এই কিরে সে ভারত*') কবির অন্তরের বেদনা মূর্ত–

এই কিরে সে ভারত? যে ভারত হায়
এ জগতে একদিন ছিল সমাসীন
অত্যুচ্চ আসনে নিজ জ্ঞান গরিমায়; ... ...
সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখ একবার,

সোনার ভারতদেশ ধরেছে কেমন বেশ,
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে মোদের সংসার,
নাহিক অর্থের বল; অবসন্ন অন্তস্তল,
গগন বিদীর্ণ করি উঠে হাহাকার,
ভারত শ্মশান এবে, শূন্য চারি ধার! ... ...
আমরা প্রকৃত শত্রু ভারতমাতার,
ভ্রাতৃকলহের ফলে ভারত মাতার গলে
পরায়ে দিয়েছি হায় দাসত্বের হার।
চির মাতৃদ্রোহী যারা হয়ত আরও তারা
লভিতে কঠোর পীড়া পারে অনিবার,
মায়ের কুপুত্র মোরা দীন, কুলাঙ্গার। (পৃ. ৭৪–৭৫)

'কোথা ভারতের সেই রতননিচয়' কবিতায় পূর্ববর্তী কবিতার হতাশার ভাব আরও প্রকট রূপে প্রকাশিত–

কোথা ভারতের সেই রতননিচয়
কোথা এ সময়,
যাহাদের বীর্য্যবলে হয়েছিল ভূমণ্ডলে
অসাধ্যসাধন, যারা খ্যাত জগন্ময়,
কোথা ভারতের সেই রতননিচয়? (পৃ. ১০৯)

১৩১৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯০৭ সালে প্রকাশিত শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাকের *স্বর্ণ-কলিকা* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে তাঁর বয়স *আনুমানিক* ত্রিশ বছর হলে তাঁর জন্মসাল দাঁড়ায় ১৮৭৭ সাল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বলে ধারণা করি তিনি হয়তো ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর আর কোনো কাব্যগ্রন্থের তথ্য আমরা পাই না। ভবিষ্যতে তাঁর প্রকাশিত আরও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে এ কবির কাব্যকীর্তি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। তবে একটি কাব্যগ্রন্থের সূত্রে আমরা তাঁর যে-তেষট্টিটি কবিতার সহযোগ লাভ করি তাতেও তাঁর কবিমানস সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পাওয়া যায়। ইতিহাস-সমাজ-সমকাল-প্রকৃতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়কে কাব্যের উপজীব্য করবার তাঁর এষণা প্রশংসনীয়।

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম *প্রবাহিকা*। ইংরেজিতে প্রদত্ত গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি– "A Little River. A collection of miscellaneous poems. Pages 2, 4, 195. Published by the author, Chittagong.1320 sal or 1913–14 A. D. [12th September, 1914] 1st edition. Price, Re. 1." 'সাব-টাইটেল'-পৃষ্ঠায় দেওয়া তথ্য– "*প্রবাহিকা*। শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ : ১৩২০ বাঙ্গালা। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।" দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তথ্যানুসারে গ্রন্থটির প্রকাশক কে. বি. বসু এবং এটি চট্টগ্রামের মিন্টো প্রেস থেকে মুদ্রিত। গ্রন্থের শুরুতে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, কবিতাগুলির অধিকাংশই ইতঃপূর্বে 'নব্য ভারত', 'উপাসনা', 'আলোচনা', 'বসুধা', 'মৃন্ময়ী', 'নৈবেদ্য', 'তারা' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছিল। ভূমিকা থেকে আরও জানা যায়, তিন বছর পূর্বে প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয় গ্রন্থ কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বাবধানের অভাবে তা আলোর মুখ দেখেনি। এছাড়া গ্রন্থকারের জনৈক বন্ধু পুস্তকটির তত্ত্বাবধানের ভার নিয়ে 'শতাধিক টাকা' আত্মসাৎ করায় এবং অতঃপর তাঁর 'শিশু পুত্র ও স্ত্রী'র মৃত্যুর কারণে তিনি ব্যক্তিগত শোকে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। সেসময় চট্টগ্রাম শাখা সাহিত্য পরিষৎ-এর সম্পাদক "সহৃদয় ভক্তিভাজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী ও

তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ চৌধুরী" নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। গ্রন্থকার কবির বক্তব্যের শেষাংশ– "পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই পুস্তকের নামকরণ লইয়া সম্প্রতি নানা কথা উঠিয়াছে বলিয়া জানিলাম। সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্য বহিরাবরণ হইতে পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট বস্তুর প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখেন বলিয়া বিশ্বাস করি, 'প্রবাহিকা' এখানে "ক্ষুদ্র নদী বিশেষ" এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।" ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৫ ফাল্গুন রচিত ভূমিকা থেকে জানা যায় শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী চট্টগ্রামের ধোরলা নামক গ্রামের অধিবাসী। ভূমিকাংশের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়, কবি ধীরেন্দ্রলাল সমকালীন চট্টগ্রামে একজন কর্মতৎপর কাব্যকর্মী ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ছিল ইতিবাচক যোগসূত্রিতা।

গ্রন্থ'সূচী' অনুযায়ী সন্নিবেশিত কবিতার সংখ্যা সর্বমোট ১০২টি– প্রবাহিকা, উদ্দেশে, আবরণ, অব্যক্ত, দুরাশা, নিবেদন, আয়োজন, আশাতীত, বাধা, পরিচিত, সহযাত্রী, আবাহন, পাষাণ, সূর্য্যোদয়, চৈতালিক, তীর্থ আশীর্ব্বাদ, ভক্তি ও শক্তি, প্রতীক্ষায়, সিংহাসন, অভিষেক, অগ্নিপরীক্ষা, আহুতি, প্রত্যাগত, পল্লী, কামনা, অজ্ঞাতবাস, অভিশাপ, প্রতিষ্ঠা, মাতৃমূর্ত্তি, বিকাশ, কর্ত্তব্য, ঋণী, নববর্ষ, হৃদয়বিতান, বিস্মৃত, মুগ্ধ, পরাজিত, বিদ্যুৎ, অভিসারে, হৃদয়হারা, লজ্জিতা, অবগুণ্ঠিতা, ভিখারী, যদি, চক্রবৃদ্ধি, ফুল, বিদায়, একা, খোকা, লুকোচুরি, অজ্ঞাতে, বিয়োগ, উপকূল, পরিমিত, প্রমাণ, মরীচিকা, আশা, অনায়ত্ত, দিশেহারা, উপেক্ষিত, প্রবোধ, বাদল, যৌবনবর্ষা, বাসনা, কল্পনা, কবিতা, সাথী, অতীতগাথা, স্মৃতিগত, বিধবা, বিশ্ব, প্রকৃতি, ব্যথিতা, দুঃখ, ভবিষ্যৎ, সমালোচনা, সাবধান, প্রতিদান, বর্ষা, দিবাশেষে, অবশিষ্ট, কিছু না, জোস্না, প্রার্থনা, ভুল, অন্তরালে, জীবিত, আঁচল, আকিঞ্চন, বিপদে, অভিন্ন, অচ্ছেদ্য, মোহ, দাতা, হৃত সর্বস্বের ধন, অমর, আষাঢ়, তদ্গাত, পরশপাথর, অদর্শনে, নৈবেদ্য যাঞ্ছা, সাগর সঙ্গম।

কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকে বোঝা যায় ব্রজেন্দ্রকুমারের ন্যায় ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীও বিচিত্র বিষয়ে কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। গ্রন্থভূত তাঁর কবিতার সংখ্যা শতাধিক। কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকে বলা যায় প্রকৃতি, নীতি-নৈতিকতা, প্রেম, জাগতিক উপলক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগ অধিক। ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কিছু কবিতার উদ্ধৃতি থেকে তাঁর কবিমানসটিকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়–

নিরুদ্যম সুপ্তি-মৌন স্তব্ধতা বিজন,
তারি মাঝে স্বপ্ন সম অসীম তরল
ব্যর্থ-বাসনার চির-জাগ্রত-স্পন্দন,
নিশীথের রুদ্ধ-গৃহে করে ছল্ ছল্;
ভেদিয়া পাষাণরাশি,
ফুটাতে চাহিছে হাসি,
ভাঙ্গিছে বিপুল-শান্তি অদম্য-নয়ন ধারে
ললিত ছন্দের মাল্যে বিকশিত আপনারে। ('প্রবাহিকা', পৃ. ১)

উদ্দেশে–

ভরিলে যৌবন শ্রীতে মানব-হৃদয়
উঠে যথা প্রাণে নিত্য ব্যথাময় গীত,
যদিও জানে না কা'র বিরহে নিশ্চয়,

বুঝে তবু আছে কেহ তাহারি বাঞ্ছিত। ('অব্যক্ত', পৃ. ৫)

ভগ্ন পরাণ আছে অবশেষ,
কি দিয়া তোমায় পূজিব ভবেশ?
কি দিব চরণে ঢালি?
পরের রচিত মালাখানি নিয়ে
পারিব কি পদে দিতে পরাইয়ে
সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী! ('আয়োজন', পৃ. ১৪)

রাঙা সাদা মেঘগুলি নীলাকাশ তলে
পাখা মেলি ধীরে ধীরে উড়ে উড়ে যায়,
আমার হৃদয় খানি ডেকে ডেকে বলে
"কোথা যাও সাথে করি লও না আমায়। ('সহযাত্রী', পৃ. ২০)

দীপ যথা একে একে/ তৈল বিন্দু গায়ে মেখে,
শেষ নিজ শিখা মুখে/ আপনি মিশিয়া যায়,
তেমতি এ সাধ আশ/ ভুল যদি ভস্মরাশ,/ অন্তিমের নিশোয়াস
মিশুক নিশ্বাস বায়। ('আহুতি', পৃ. ৪৩–৪৪)

কোথা যাব? কতদিন পরে আরবার
তোমারি পবিত্র অঙ্কে আসিনু ফিরিয়া
ভাটার তটিনী সম; তখন তোমার
শুষ্ক দেহে নাহি স্ফূর্ত্তি, আবর্ত্ত ঘেরিয়া
আবিল পঙ্কিল মুখে বিদ্রূপের হাসি
ছড়াইছে চারিদিকে। ('প্রত্যাগত', পৃ. ৪৬)

মাঝে মাঝে জীবনের হেন দিন আসে
মৃত্যুও যে দিন হয় প্রাণ প্রিয়তম,
দুঃখ বিপদেরে আর ভয় নাহি বাসে
আপনি ছিঁড়িতে যায় আপন মরম। ('অভিশাপ', পৃ. ৫৫)

কি ছিল আমার হৃদয়ের তলে
  আমারি অজানা ধন,
  দেশে দেশে তার নিছি সন্ধান
  করিয়াছি প্রাণপণ;
সারা জগতের গভীর-আঁধার
বহিয়া মরেছি ঘুরে,
  আর কেবা কবে জ্বেলে গেছে বাতি
  আমারি অন্তঃপুরে; ('বিকাশ', পৃ. ৬২)

মনে ছিল গাহিবার আগে,
  আবেগে আধেক গাই,
  গান যদি ভুলে যাই

সুর যদি নাহি মিলে রাগে,
  চেয়ে র'ব দূর শূন্য পানে,
বার বার ফিরে ফিরে
  সেই ভাঙ্গা পদটিরে
বহুকাল জাগাইয়া প্রাণে। ('বিস্মৃত', পৃ. ৭২)

নিঃস্ব জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে
দিয়েছিনু তারে বুঝি একটুকু স্নেহ
সাক্ষ্য নাহি ছিল, নাহি কাগজের পাতে
  গ্রহীতা ব্যতীত তাহা জানে ও না কেহ,
  ঋণ দাতা করে নাই প্রতিদান আশা
ভুলেছিল ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ক্ষতিটুকু,
  গ্রহীতা তখনো তার পায় নাই ভাষা
বলিতে কেমন করে কাঁপিতেছে বুক।
  জমে হৃদি ভাণ্ড তার সুদের ও সুদ
অবিরাম পরিশোধ করিছে সে ঋণ।
  অনন্ত ঋণের জালে আবদ্ধ প্রেয়সী,
কে জানে কাহার ঋণ বেশী হবে হায়
  দুজনার মাঝে! যদি হিসাবেতে বসি,
কে জানে কাহার কাছে কেবা বেচা যায়। ('চক্রবৃদ্ধি', পৃ. ৯৬–৯৭)

শ্রী ব্রজকুমার বসাক এবং শ্রী ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী উনিশ শতকের এই দু'জন বাঙালি কবির একজন ঢাকা এবং অন্যজন চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী। তাঁদের দু'জনের একটি করে কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো বর্তমানে ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। কালের প্রবলতার তোড়ে শতাধিক বছরেরও অধিক কাল আগেকার কবিদ্বয়ের কাব্যগ্রন্থ বাংলাদেশের কোনো গ্রন্থাগারে বা কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই তবে গ্রন্থ প্রকাশের কালে এঁরা দু'জনেই যে সেসময়কার বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায় সম্মানিত অবস্থানে আসীন ছিলেন সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উভয় কবির মানসিক বিকাশ ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব ও পরেকার তরঙ্গময় পরিপ্রেক্ষিতে। কাব্যগ্রন্থের বিচারে দুজনের মধ্যে কালগত ব্যবধান ছয় বছর হলেও এঁদের মধ্যে কে বয়সে বড় ছিলেন তা জানবার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া গ্রন্থগুলো তাঁদের দু'জনেরই প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ নাকি তাঁরা আরও কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন সে-বিষয়েও মন্তব্য করা দুরূহ। তবে কবিতাগুলোর সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, ব্রজকুমারের কবিতায় সমাজ-সমকাল-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক সচেতনতা অধিক। তুলনামূলকভাবে ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কবিতায় কল্পনাপ্রবণতার ছাপ বেশি। অর্থাৎ তিনি খানিকটা রোম্যান্টিক স্বভাবের কবি। তাঁরা দু'জনেই নজরুলপূর্ব যুগের কবি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালীন। বয়সে তাঁরা উভয়েই রবীন্দ্রনাথের চাইতে পনেরো থেকে কুড়ি বছরের ছোটো ছিলেন।

উনিশ শতক থেকে সূচিত হওয়া বাংলা গীতিকবিতার ধারা পরবর্তীকালে বহু কবির কাব্যিক অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেসব কবির অনেকের কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি কিন্তু প্রাচীন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁদের কবিতাবলি এখনও অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়ে গেছে। ব্রজকুমার বসাক

এবং ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাব্য-অবদান বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসের অঙ্গীভূত হিসেবে বিবেচ্য। তাঁদের অগ্রন্থিত কবিতা কিংবা প্রকাশিত কিন্তু অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত আরও কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁদের কাব্যমানস সম্পর্কে অধিকতর আলোকিত হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

আকরগ্রন্থ

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক (১৩১৩)। *স্বর্ণ-কলিকা* (কবিতাগুচ্ছ)। এস. এ গণি ও সুরেন্দ্রনাথ চন্দ কর্তৃক মুদ্রিত। পূর্ব-বাংলা প্রেস ও সিটি প্রেস, ঢাকা।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩২০)। *প্রবাহিকা*। প্রকাশক : কে. বি. বসু, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইর-এর ভ্রমণসাহিত্য : একটি তুলনামূলক আলোচনা

মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও আরবি ভ্রমণসাহিত্য ভাষাগত দিক থেকে দুটি দুই ভাষার হলেও ভ্রমণের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, শব্দচয়ন, ভ্রমণের এলাকা নির্বাচন প্রভৃতি দিক থেকে দুটি ভ্রমণ সাহিত্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ভ্রমণসাহিত্য রচনা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। অপরদিকে নবম শতাব্দী থেকেই আরবি 'ভ্রমণসাহিত্যে'র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১ খ্রি.–১৯৪১ খ্রি.)-এর স্বতন্ত্র ধারার রচনা খুবই সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। সৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতো এখানেও তিনি কেবল অনন্য নন, এক বিস্ময়। পক্ষান্তরে ভূগোলবিশারদ, পরিব্রাজক, লেখক ও স্পেনীয় আরবি কবি হিসেবে খ্যাত ইবন জুবাইর আল-আন্দালুসী (১১৪৫ খ্রি.–১২১৭ খ্রি.) তাঁর *রিহ্‌লা ইবন জুবাইর* বা 'ইবন জুবাইরের সফরনামা'র মধ্যে নিজের এবং সামসময়িক যুগের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা সে যুগের অক্ষয় থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ যুগ-মানসেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি গোটা জীবনে দশ বছরের অধিক কাল ভ্রমণ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণসাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করার পাশাপাশি তুলনামূলক সাহিত্যিক সমালোচনার প্রয়াস থাকবে।]

সাহিত্যের ইতিহাসে ভ্রমণসাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর (৯৮২–১০৫৪) জন্মভূমি বিক্রমপুর ছেড়ে তিব্বত হয়ে চীনে যান। তবে তাঁর এই চীন-তীব্বতসংক্রান্ত কোনো লিখিত বিবরণী পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শরচ্চন্দ্র দাশ (১৮৪৯–১৯১৭) জ্ঞানের অন্বেষণে একাধিকবার তিব্বতে গিয়েছেন। এবং তিনি সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখেন *My Journy to Central Tibet and Lasah* বা *তিব্বত ভ্রমণবৃত্তান্ত* শীর্ষক ভ্রমণকাহিনি। এই লেখাটি বাঙালির মানস ও সাহিত্যকৃতিতে আলোচিত। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষায় ভ্রমণসাহিত্য রচনা শুরু হয়। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের প্রথম সারির কয়েকটি গ্রন্থ হলো শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭–১৯১৯) *ইংল্যান্ডের ডায়েরী*, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪–১৮৮৯) *পালামৌ*, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৩–১৯৪৯) *চীনযাত্রী*, জলধর সেনের (১৮৬০–১৯৩৯) *হিমালয়*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ খ্রি.–১৯৪১ খ্রি.) *যাত্রী* প্রভৃতি। বাঙালি ভূ-পর্যটক হিসেবে খ্যাতি পাওয়া লেখক হলেন ভারতীয় তরুণ বিমল মুখোপাধ্যায় (মুখার্জি) (১৯০৩–১৯৮৭), যিনি ১৯২৬ সালে সাইকেলে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা ঘুরেছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে ভারত ফিরে আসেন। তাঁর *দু'চাকায় দুনিয়া* দুঃসাহসিক ভ্রমণের বর্ণনা ধারণ করেছে। ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্বতন্ত্র ধারার এবং খুবই সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। সৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতো এখানেও তিনি কেবল অনন্য নন, এক বিস্ময়। তাঁর পরেও অনেক লেখকের কল্যাণে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। যেমন অন্নদাশংকর রায়ের (১৯০৪–২০০২) *পথে প্রবাসে*, সৈয়দ মুজতবা আলীর (১৯০৬–১৯৭৪) *দেশেবিদেশে*,

* অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫–১৯৮৩) *মহাস্থানের পথে*, অবদূতের (১৯১০–১৯৭৮) *মরুতীর্থ হিংলাজ* এ ধারাবাহিকতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পরবর্তীকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮), হাসনাত আব্দুল হাই (১৯৩৯) প্রমুখ বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ১, ভূমিকা–১)। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় কতিপয় ভ্রমণ সাহিত্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ভ্রমণ অমনিবাস (১)', মৈত্রেয়ী দেবীর 'অচেনা চীন', বিশ্বনাথ জোয়ারদারের 'অন্য কলকাতা', সমরেশ মজুমদারের 'অন্যরকম ভ্রমণ', চিন্ময় চক্রবর্তীর 'অরণ্যের টানে', শংকরলাল ভট্টাচার্যের 'আথেন, হেলেন ও সেই ক্রন্দশী', মনোজ বসুর 'আফ্রিকান সাফারি', অর্ভিন ঘোষের 'আবার স্বদেশে', শংকরের 'আমাদের চিনচর্চা', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' এর নাম ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।[১]

অপরদিকে, প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো আরবগণও ভ্রমণসাহিত্য সম্পর্কে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন যুগে এ সাহিত্যের প্রতি তাঁদের কদর বেশ লক্ষণীয়। সম্ভবত আরবি ভ্রমণসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হলো 'রিহলা আস্-সিরাফী'। এরপর 'রিহলা সালাম আত-তারজুমান' বা সালাম আত-তারজুমানের সফরনামা। অতঃপর ঐতিহাসিক আল-মাস'উদী (৮৯৬–৯৫৭ খ্রি.), মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-মাকদিসী (৯৪৭ খ্রি.–৯৯০ খ্রি.), স্পেনীয় পরিব্রাজক আল-ইদ্রিসী (১১১০–১১৬৬ খ্রি.) এবং ঐতিহাসিক আব্দুল লতীফ আল-বাগদাদীর সফরনামা পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আল-ইদ্রিসী ভ্রমণ সাহিত্যে 'নুয্হাতুল মুশ্তাক ফি ইখতিরাক্বিল আফাক' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তারপর আসে আল-বিরুনীর (মৃত. ১০৪৮ খ্রি.) ভ্রমণ সাহিত্য। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ও তার পরের শতাব্দীগুলোতে ভ্রমণ সাহিত্যের ব্যাপকতা বিশেষ লক্ষণীয়। এর মাঝে স্পেনের ইবন জুবাইরের (১১৪৫ খ্রি.–১২১৪ খ্রি.) সফরনামা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অতঃপর চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতার (১৩০৪ খ্রি.–১৩৭৭ খ্রি.) আরবি ভাষায় রচিত সফরনামা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনির শিরোনাম হলো, "তুহফাত-উন্-নুয্যার ফী-গরায়েবিল আমছার ওয়া আজায়েবিল আস্ফার" অর্থাৎ অদ্ভূত দেশ-নগর ও আশ্চর্যজনক ভ্রমণকাহিনির বর্ণনা সম্পর্কিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের তোহ্ফা বা উপঢৌকন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব মূল্যবান তথ্যসংগ্রহ করেন তারই প্রতিফলন দেখা যায় 'ইবনে বতুতার সফরনামায়'। কাজী দীন মুহম্মদের মতে– চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাই ছিল গ্রন্থখানা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইবনে বতুতার এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে (ইবনে বতুতা, ১৯৬৮ : কাজী দীন মুহম্মদের প্রসংগ কথা)। এই একই শতাব্দীতে আরো একজন মুসলিম পরিব্রাজক গ্রানাডার সাহিত্যিক লিসান-উদ-দীন আল-খতীবের সফরনামার কথা জানা যায়। এঁদের সাথে যুক্ত করতে হয় বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খলদুনের সফরনামার কথা যা অত্যন্ত সরল ভাষায় প্রণীত। তিনি তাঁর সফরনামায় স্পেনের বিভিন্ন নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষ করে বানূ আল-আহমার সম্প্রদায়ের গ্রানাডার রাজার অতিথি হিসেবে তাঁর স্পেনে অবস্থানকালীন সময়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এভাবে ধীরে ধীরে এই ভ্রমণ সাহিত্য শৈল্পিক রূপ ধারণ করে সাহিত্য অঙ্গনে এক বিশেষ স্থান করে নেয়। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভ্রমণ সাহিত্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রিফা'আহ রাফি' আত্-তাহতাভী, আহমদ ফারিস আশ-শাদয়াক, মিসরীয় সাহিত্যিক হোসাইন ফৌজী, তাওফীক আল-হাকীম, আল-বাতাতুনী,

শাকীব আরসালান ও হামদ আল-জাসিরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্মর্তব্য যে, আরবি ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো পরিব্রাজিকার নাম এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইবন জুবাইরের পরিচয়

তাঁর নাম– মুহাম্মাদ, উপনাম– আবুল হাসান, পিতার নাম– আহমাদ এবং দাদার নাম– জুবাইর। যিনি ইবন জুবাইর আল-আন্দালুসী হিসেবে পরিচিত।[৪] তিনি প্রসিদ্ধ 'আদনানী মুদার বংশের 'কিনানা' গোত্রের 'বানু দামরাহ্' শাখাগোত্রে ১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে স্পেনের ভালেন্সিয়ায়[৫] জন্মগ্রহণ করেন (আল-মাক্বরীযী, ১৯৯১ : ১৫২)। এই রাজ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে কবি ইবন আয্-যক্কাক (Ibn al-Zaqqaq) আল-বালান্সী কবিতা লিখেছেন।[৬] ধারণা করা হয়, ইবন জুবাইর এমন এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, যারা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সেনাপতি বাল্জের[৭] সাথে প্রাচ্য হতে স্পেনে এসে বসতি গড়েছিল (আত্-তুজায়বী, ১৯৭৫ : ১২৩; লিসানুদ্দীন ইবন আল-খাতীব, ১৯৭৪ : ২৩০)। ভালেন্সিয়ার 'শায়তুভা'[৮] (Xàtiva) শহরের যেখানে তাঁর পিতা চাকরি করতেন সেখানেই তিনি তাঁর পিতা ও আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আল-আসীলীসহ সভমসময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষা করেন। পাশাপাশি গণিত, সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল বেশ অনুরাগ। ধীরে ধীরে তাঁর মাঝে গদ্য ও কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। এ প্রতিভাই তাঁকে পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে গড়ে তোলে। অতঃপর গ্রানাডার গভর্ণর আল-মুহাদ বংশের (Almohad Dynasty) রাজা আবূ সাঈদ 'উস্মান ইবন আব্দুল মুমিন তাঁকে সচীব পদে চাকরি দিলে গ্রানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে মিশরে গেলে হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আল-মুন্যিরী ও আবুল হোসাইন ইয়াহ্য়া ইবন 'আলী আল-ক্বারাশী তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন (আল-মাক্বরীযী, ১৯৯১ : ১৫২)।

ইবন জুবাইরের ভ্রমণ সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট

গভর্নর আবু সাঈদ একদিন মদ্যপ অবস্থায় তাঁর পক্ষ থেকে একটি পুস্তক প্রণয়ন করার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইবন জুবাইরকে এক পেয়ালা মদপান করতে দিলে ইবন জুবাইর পাপের ভয়ে তা পান করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন আবূ সাঈদ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে সাত পেয়ালা মদপান করানোর শপথ করেন এবং এক পর্যায়ে সাত পেয়ালা মদপানে তাঁকে বাধ্য করেন। অবশেষে একান্ত বাধ্য হয়ে ইবন জুবাইর সাত পেয়ালা মদপান করলেন। তারপর গভর্ণর আবূ সাঈদ ঐ সাতটি পেয়ালাকে স্বর্ণমুদ্রায় ভর্তি করে তাঁকে ফেরৎ দিলেন। মদপানের এই পাপ মুছার জন্যে তিনি ঐ সকল স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পবিত্র হজ পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

কেউ কেউ মনে করেন, ইবন জুবাইরের সফরনামা মূলত তিনটি ভ্রমণের সমন্বয়ে লিখিত। তাঁর প্রথম ভ্রমণ ছিল মক্কাভিমুখে। তিনি গ্রানাডা থেকে সিউটার উদ্দেশ্যে ১১৮২ সালে যাত্রা শুরু করে সাগর পথে আলেকজান্দ্রিয়ায়, তারপর মক্কার উদ্দেশ্যে 'আইযাব (Aydhab or Aidab) বন্দর হয়ে জিদ্দায় পৌঁছেন। শেষমেষ মক্কায় পৌঁছে হজ করে মদিনা, কুফা, বাগদাদ, মুসেল, আলেপ্পো, ও দামেশক ভ্রমণ করেন। তারপর ১১৮৫ সালে গ্রানাডায় ফিরে আসতে সাগর পথে সিসিলি (Sicily) ভ্রমণ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি গভর্ণর আবূ সাঈদকে ত্যাগ করে যে সফরে বের হন তাতে তিনি টানা দুই বছর বাইরে কাটিয়ে দেন এবং তাঁর অবলোকিত

দৃশ্যাবলির বিবরণ একটি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন যা পরবর্তীকালে "*রিহলা ইবন জুবাইর*" বা ইবন জুবাইরের সফরনামা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর দ্বিতীয় ভ্রমণ ছিল দুই বছরব্যাপী (১১৮৯–১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ)– প্রাচ্যের অভিমুখে।

আর তৃতীয় ভ্রমণটিও ছিল পূর্বাঞ্চলে। এই ভ্রমণের নেপথ্যে প্রধান কারণ ছিল তাঁর সহধর্মিণী হারানোর বেদনা। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলে ১১৮৫ সালে তাঁর সহধর্মিণী হারানোর বেদনা ভুলে যেতে প্রায় দশ বছরকাল স্পেনের বাইরে কাটান। এ সময় তিনি সিউটা থেকে বের হয়ে মক্কায় রওয়ানা দেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে বায়তুল মোকাদ্দাস ও কায়রো সফর করে সর্বশেষ আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই ১২১৪/১২২৭ সালে ২৯ ডিসেম্বর তারিখ বুধবার মৃত্যুবরণ করেন (আল-মাক্কারীযী, ১৯৯১ : ১৫২)। পরিতাপের বিষয় যে, তাঁর প্রথম সফরের বর্ণনা ছাড়া তিনি অন্য দুই সফরের কোনো বর্ণনা পরবর্তীদের জন্যে লিখে যাননি (ক্র্যাচকোভসকি, ১৯৬৩ : ২৯৯–৩০১)।

রীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণ পথ

রবীন্দ্রনাথ ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৪১ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বহু দেশ-এলাকা সফর করেছেন। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ১৯১২–১৩ খ্রিষ্টাব্দ জুড়ে এক বছর চার মাস ১২ দিন বিলেত-আমেরিকা-বিলেতে ঘোরেন। ফিরে এসে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরও পান। এরপর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মে তিনি আমেরিকা যাত্রার সুবাদে জাপানি জাহাজে যাত্রা শুরু করেন, এবারের যাত্রাসঙ্গী দুইজন ইংরেজ অ্যান্ড্রুজ ও পিয়ার্সন এবং কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে। এই সফরে তিনি ১১ মাস কাটান। *জাপানযাত্রী*তে স্বভাবতই জাপানি জাহাজে জাপান পর্যন্ত যাত্রা এবং জাপানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা উঠে এসেছে। এর সময়কাল ৩ মে ১৯১৬ থেকে চার মাস।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*-এর প্রথম পত্রে সমুদ্রপথে ভ্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন,

> বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিল। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চার দিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। ...সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জান কিন্তু কী রকম তা জান না (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ১, ৩৭)।

রবীন্দ্রনাথ পিনাঙ বন্দরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন–

> ২৯ বৈশাখ। বিকালের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকেছি, আমাদের সঙ্গে যে-বালকটি এসেছে, তার নাম মুকুল, সে বলে উঠল, "ইস্কুলে একদিন পিনাঙ সিঙাপুর মুখস্থ করে মরেছি, এ সেই পিনাঙ।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ২, ৩৩)।

পক্ষান্তরে, রুশ প্রাচ্যবিদ ইগ্‌ন্যাটি ক্র্যাচকোভসকি (Ignaty Yulianovich Krachkovsky) (১৮৮৩–১৯৫১) মনে করেন, ভূগোল সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করার পূর্বে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে খ্যাতি লাভ করা ইবন জুবাইরের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মূলত তাঁর এই ভ্রমণই তাঁকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করে দিয়েছে। তাঁর সফরনামায় উল্লেখকৃত সফরের

সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের বদৌলতে তাঁর ভ্রমণপথ সম্পর্কে পাঠকগণ ওয়াকিবহাল হতে পারে (ক্র্যাচকোভসকি, ১৯৬৩ : ২৯৯–৩০১)।

১১৮৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ইবন জুবাইর তাঁর বন্ধু আহ্মাদ ইবন হাস্সানসহ হজের উদ্দেশ্যে গ্রানাডা ত্যাগ করে আত্-ত্বারীফ (ট্রাফালগার) দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রথমে সাগর পাড়ি দিয়ে সিউটা (Ceuta) নগরীতে চলে যান। অতঃপর ২৪ ফেব্রুয়ারি আলেকজান্দ্রিয়াগামী একটি তরীতে আরোহণ করেন। সে তরীতে সাগরের উত্তাল ঢেউ আঁছড়ে পড়ছিল এবং তাঁদেরকে স্পেন উপকূলের অদূরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দানিয়া বন্দর, তারপর মেজর্কা (Majorca, or Mallorca), মেনর্কা (Minorca or Menorca), সার্দানিয়া (Sardinia) দীপপুঞ্জ, অতঃপর সিসিলি (Sicily) দ্বীপ হয়ে ক্রেট (Crete) দ্বীপ পৌঁছেন। অবশেষে ট্রাফালগার (Trafalgar) দ্বীপে পৌঁছে সেখান থেকে ৩০ দিন একটানা সফরের পর ২৬ মার্চ আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছেন। তারপর নীলনদ অতিক্রম করে কায়রো পৌঁছেন। সেখান থেকে লোহিত সাগরের উপর দিয়ে 'আইযাব বন্দর' (যা হাজিদের গমনাগমনের জন্য ব্যবহৃত হতো) পৌঁছেন। এরপর জিদ্দায় অবতরণ করে মক্কাগামী এক কাফেলায় শরিক হন। মক্কায় অর্ধবছর অবস্থান করে মদিনা হয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। এরপর বাগদাদ, সামরা (*Sāmarrā*), মুসেল, আলেপ্পো পরিদর্শন করে দামেশকে চলে যান। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করেন। উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ে সিরিয়ার উপকূলীয় এলাকা ক্রুসেডারদের দখলে ছিল। এরপর উক্কা বন্দর হতে এক খ্রিষ্টান মালিকানার তরীতে আরোহণ করে সিসিলি পৌঁছেন। প্রায় দুই বছরের সফর শেষ করে ১১৮৫ সালের এপ্রিলে গ্রানাডায় পৌঁছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণসাহিত্যকর্ম

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য—

ক. *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*
খ. *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি*
গ. *জাপানযাত্রী*
ঘ. *যাত্রী* : ১. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ২. জাভা-যাত্রীর পত্র
ঙ. *রাশিয়ার চিঠি*
চ. *পারস্যে*
ছ. *পথের সঞ্চয়*

এসব বইয়ের বাইরে *ছিন্নপত্রাবলী*সহ অসংখ্য চিঠিপত্রে তাঁর ভ্রমণের কথার উল্লেখ আছে। *জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা*তেও তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। ২০১০ সালে প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা থেকে আবুল মোমেনের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণসমগ্র দুই খণ্ডে বের হয়। এর নামকরণ করেন এভাবে, *রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য, প্রথম খণ্ড : পাশ্চাত্য এবং রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাচ্য*।

পক্ষান্তরে, ইবন জুবাইরের প্রথম সফরনামা "*তাযকিরাহ্ বিল আখবার আন্ ইত্তিফাক্বাত আল-আসফার*" নামক একটি গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এটি ১৪০৮ সালে বৈরূতের দার সাদির থেকে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি নুর-উদ-দীন ও সালাহ-উদ-দীনের নেতৃত্বে ক্রুসেডের বিরুদ্ধে

মুসলমানদের প্রতিরোধ সংগ্রামের বর্ণনা তুলে ধরেন। ধারণা করা হয়, এটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল আনুমানিক ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে যা প্রাচ্য-প্রতিচ্যের সর্বত্র প্রচার লাভ করে। ঐতিহাসিক ও ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম রাইট (William Wright) এটি প্রকাশ করেন তাঁর "Early travelers in Palestine" নামক একটি গ্রন্থে, যেখানে ভিন্‌দেশি মুসলিম-খ্রিষ্টান-ইহুদি পর্যটক ও আরবের অনেক হাজির ভ্রমণকাহিনি স্থান পেয়েছে।

পর্যটনের প্রতি ইবন জুবাইরের ছিল বেশ আগ্রহ। তাই তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তিনবার প্রাচ্য সফর করেন। প্রথমবার ছিল ৫৭৮–৫৮১ হি.। তিনি তাঁর তিনটি ভ্রমণকাহিনির বর্ণনা দিয়ে একক কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। শুধুমাত্র প্রথম সফরের বর্ণনাই তাঁর উপর্যুক্ত সফরনামায় স্থান পেয়েছে।

কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, তাঁর সফরনামার গ্রন্থটি স্বরচিত নয়। বরং তিনি সেটির মূলভাব লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। পরে তাঁর কাছ থেকে এর সংগ্রহকারীগণ সে ভাবধারাকে সুবিন্যস্ত করে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন।[৯] যাহোক তাঁর এই গ্রন্থটি ভ্রমণসাহিত্যে আরবদের অন্যতম রচনা হিসেবে পরিগণিত হয়।

ভ্রমণ সাহিত্যের শীর্ষে তাঁর নাম স্থান পেলেও আজ পর্যন্ত তাঁর সফরনামার একমাত্র পাণ্ডুলিপি (আনু. ৮৭৫ হি./১৪৭০ খ্রি.) যা লন্ডনে বিদ্যমান, তদ্ব্যতীত আর কোনো পাণ্ডুলিপি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো শাখায় পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে তাঁর ভ্রমণের কথা ব্যাপকভাবে জানা যায় ডোজি (Dozy) ও আমারি (Amari)-এর আংশিক মুদ্রণের মধ্য দিয়ে। আরো পরে যখন বৃটেনের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ রাইট (William Wright) মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর সফরনামার পূর্ণ মুদ্রণ করেন। তখন পাঠক সমাজে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। রবার্টসন স্মিথ (Robertson Smith)ও এর সম্পাদনা করেন। অতঃপর ক্লিস্টিনো শাপরিলি (Celestino Schiaparelli) ১৯০৬ সালে ইতালি ভাষায় এর অনুবাদ করেন। এরপর ডি-জুই (De Geoje) ১৯০৭ সালে এর পরিমার্জিত সংস্করণ বের করেন। এরপর মিশরে ইউরোপীয় সংস্করণ বের হয়। অতঃপর ১৯৫৫ সালে মিশরে সর্বাধিক পরিমার্জিত সংস্করণ বের হয়। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে মরক্কোর ফেজ নগরীতে যে সকল পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তা পরিমার্জিত ছিল না। সম্প্রতি ইলেক্ট্রনিক বিশাল আরবি লাইব্রেরি *"আল-মাকতাবাহ্ আশ্-শামিলাহ্"* ভার্সন ৩.১৪ তার "কুতুবুল বুল্‌দান" ক্যাটাগরিতে এ সফরনামার সফ্‌ট কপি ডাটাবেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে গ্রন্থাবদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের সফরনামার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনিতে দৈনন্দিন ভ্রমণ-দর্শনের তথ্যের উপস্থিতি কম। দর্শনীয় স্থান আর স্মরণীয় ব্যক্তির বর্ণনার গুরুত্ব নেই। মূলত ভ্রমণকালীন ছোট্ট অভিজ্ঞতা যখন তাঁর মনে বড়ো কোনো উপলব্ধি ও ভাবনা সঞ্চারিত করেছে, তখনই তিনি লিখতে বসেছেন। ফলে এসব লেখায় একদিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের রস ও প্রসাদ যেমন মেলে, অন্যদিকে দার্শনিক মনের সত্যান্বেষণের বিশ্লেষণ থেকে মননের খোরাক জোটে। তাঁর ভ্রমণের মধ্যে দর্শনীয় স্থান দেখার তাগাদা বেশি ছিল না। স্থানান্তরে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে মন ভালো ও তাজা করার উপাদান পেতেন যেন। তাতে কবির আসল রসদ মিলে যেত লেখার প্রেরণা।

অন্যদিকে, ইবন জুবাইর ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে (৫৮১ হি.) প্রথম সফর হতে গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর সফরের বর্ণনা ছিল ডায়েরি সদৃশ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে, যার কোনো সুনির্দিষ্ট সর্বজন পরিচিত শিরোনাম ছিল না। তবে ঐ গ্রন্থের দুই ধরনের শিরোনামের কথা জানা যায়। প্রথমটি *"ই'তিবার আল-নাসিক ফী যিক্র আল্-আছার্ আল-কারীমাহ্ ওয়া আল-মানাসিক।"* অপরটি *"তাযকীর বিল্-আখ্বার্ 'আন্ ইক্তিফাক্বাত আল আছার।"* একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিরোনাম দুটি ইবন জুবাইর প্রদত্ত ছিল না। বরং 'কাশ্ফুয্যুনূন'[১০] গ্রন্থ প্রণেতা হাজি খলিফা ও রুশ প্রাচ্যবিদ ইগ্ন্যাটি ক্র্যাচকোভসকি মনে করেন, তাঁর 'কিনান' বংশের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এর প্রচলিত শিরোনাম ছিল– *"রিহ্লা আল-কিনানী"*। একইভাবে উইলিয়াম রাইট ও হুসায়ন নাস্সার এর অধিকতর যুক্তিসংগত ও সুপরিচিত শিরোনাম ব্যবহার করেছেন– *"রিহ্লা ইবন জুবাইর"*। এ প্রসঙ্গে হুসায়ন নাসসার বলেন, "তবে আমি ঐ সকল নাম এই সফরনামার শিরোনাম হতে বাধ সাজে বলে মনে করছি না, কারণ এর খ্যাতি ও কদর বেড়ে এর নামগুলো যেন বাস্তবে এর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা এর লেখকের উপনামের মতো।" [রিহ্লা ইবন জুবাইর, (১৯৯২) : ৫]

তাঁর সুখ্যাতি প্রথম দিকে শুধুমাত্র পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে সর্বত্র বিশেষ করে ভ্রমণ সাহিত্য জগতে তাঁর খ্যাতির পেছনে মূল কাজ করে তাঁর এই সফরনামা। একারণেই পরবর্তীকালের অনেক ভূগোলবিশারদ ও ঐতিহাসিক কখনো তাঁর নামের প্রতি ইঙ্গিত করে, কখনো বা নিজেদের রচনায় তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছেন। পর্যটকদের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁরা তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তাঁরা হলেন– আল-'আব্দারী (মৃ. ১৩০০ খ্রি.), খালিদ ইবন 'ঈসা আল-বালাভী (আনু. ৭৩৪ হি./ ১৩৩৫ খ্রি.) এবং ইবন বতুতা। বিশুদ্ধ মতানুসারে ইবন বতুতাকে ইবন জুবাইরের বিশেষ বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অনুরূপভাবে ঐতিহাসিকদের মধ্য থেকে যাঁরা তাঁর জ্ঞানগরিমার দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা হলেন– ঐতিহাসিক লিসানুদ্দীন আল-খাতীব, আল-মাক্বরীযী, আল-ফাসী ও আল-মাক্কারী। প্রত্যেকেই নিজের রচনাকর্মে তাঁর জীবনালোচনাসহ বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আরবি সাহিত্যের বিশেষ শাখা 'মাকামা' সাহিত্যের অন্যতম রচনাকর্ম "হারীরীর মাকামাত"-এর ব্যাখ্যাকার শারীসী (মৃ. ৬১৯ হি./১২২২ খ্রি.) হলেন ইবন জুবাইরের অন্যতম শাগরেদ, যিনি ওস্তাদের ভ্রমণের অনেক বিক্ষিপ্ত অংশ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইবন জুবাইর তাঁর ঐতিহাসিক সফরে প্রাচীন বিভিন্ন নিদর্শন, মসজিদ ও লোকসভা পরিদর্শন করেছেন এবং সেগুলো যে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা তাঁর বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয়। সালাহ-উদ্-দীনের যুগে মিশরের অবস্থার বর্ণনার পাশাপাশি হাজিদের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মসজিদে আকসা, দামেশকের সর্ববৃহৎ মসজিদ 'আল-জামি আল-উমাবী' ও তথায় সংরক্ষিত আজব ঘড়ির চিত্রায়ণ করেছেন। ঘড়িটি নির্মাণ করেছিলেন রিদওয়ান ইবন আস্-সা'আতী। তাছাড়া তিনি সমকালীন নানা অবস্থার পর্যালোচনাও করেছেন।

সিসিলি ও সেখানকার নিদর্শনাবলি যেমন– মসজিদ, শিক্ষাকেন্দ্র, বালাখানা ইত্যাদি তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্ববহ দৃশ্য। অনুরূপভাবে দ্বীপপুঞ্জে আরবদের রেখে যাওয়া সভ্যতার নিদর্শন তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। মোদ্দাকথা– ইবন জুবাইর তাঁর এই সফরনামার মাধ্যমে

হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বাঙ্গীন জীবনচিত্র আমাদের সমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর ঘুরে আসা দেশ-নগর-বন্দর তাঁর মনে যে রেখাপাত করেছে তারই অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন এই সফরনামায়।

ইবন জুবাইরের সফরনামা সমকালীন যুগের জীবনচিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। মিশর ও সিরিয়ায় নুর-উদ্-দীন ও সালাহ-উদ্-দীনের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার চিত্র পাওয়া যায় ইবন জুবাইরের সফরনামায়।[১১] এক্ষেত্রে গভর্নর উসামা ইবন মুন্‌কিযের ডায়েরির সাথে এর মিল রয়েছে। যদিও-বা দুই লেখকের মাঝে উপস্থাপনা ও রচনার পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। ফাদার Lammens ইবন জুবাইরের সিরিয়ার বর্ণনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, ইবন জুবাইর সত্যিকার অর্থে বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাধর। সিসিলি দ্বীপের মুসলিম সমাজের জীবনালেখ্য রূপায়ণে তাঁর সফরনামার অনন্য ভূমিকা রয়েছে। কারণ, গ্রানাডায় তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে ১১৮৪ সালের ডিসেম্বরে সিসিলির উত্তর উপকূলবর্তী অঞ্চলে মেসিনা (Messina) হতে ট্র্যাপানি (Trapani) অতিক্রম করেছেন। সেখানে ১১৮৫ সাল পর্যন্ত অবস্থান করে সেখানকার মুসলিম জনপদের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তাঁর বর্ণনায় সিসিলির মধ্যযুগীয় নিদর্শনের বর্ণনা ছাড়াও নরমান্দগণের (Normands) প্রাসাদের কথাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও তাঁদের প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন আধুনিক অনেক ল্যাটিন গ্রন্থাকার।

ইবন জুবাইর 'আব্‌হুর' বন্দরের কাছে হেজাযের উপকূলে পৌঁছার ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> আমরা 'আব্‌হুর' নামক এক জেটিতে নোঙ্গর করলাম। জিদ্দা থেকে তার দূরত্ব একদিনেরও কম। সেটি ছিল অবস্থানগত দিক থেকে চমৎকার একটি জেটি। কারণ, সাগরের একটি উপ-অংশ স্থলপথের দিকে গেছে। স্থলপথটি সাগরের দু প্রান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং মাঝিমাল্লারা তার স্থিতিশীলতার সুবাদে শান্তভাবে জাহাজ নোঙ্গর করতে পারে। পরবর্তী সোমবার ভোরে মহান আল্লাহর ফজলে আমরা (সাগর পথে) সেখান থেকে শীতল বায়ু উপেক্ষা করে যাত্রারম্ভ করলাম। আল্লাহ (যাত্রাপথ) সুগমকারী, তিনি ছাড়া নেই কোনো পালনকর্তা। যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসল আমরা জিদ্দার নিকটবর্তী স্থানে নোঙ্গর করলাম। জিদ্দা (সেখান থেকে) আমাদের এক চোখের পথ। পরের দিন মঙ্গলবার ঊষালগ্নে প্রবল বাতাস আমাদেরকে জেটিতে ভিড়তে বাধা দিল। এই জেটিতে প্রবেশ করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল– ঘন গাছগাছালি ও ডালপালার কারণে।[১২]

শৈল্পিক দিক থেকে ইবন জুবাইরের সফরনামা আরবি ভ্রমণ সাহিত্যের উঁচু রচনাশৈলী সমৃদ্ধ। যদিও-বা আপাতদৃষ্টে তার দীর্ঘ বর্ণনাধারা সাধারণ পাঠকের কাছে বিরক্তিকর বটে, বাস্তবে তার রচনারীতি অনেকাংশে প্রাণবন্ত ও সহজভাবে উপস্থাপিত। উদাহরণস্বরূপ আলেকজান্দ্রিয়ার আমদানি-রপ্তানি শুল্ক কিংবা সিসিলির উপকূলে ভ্রমণতরীর দুর্যোগের বিবরণের কথা উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিকভাবে তাঁর উপস্থাপনার লক্ষ্যবস্তু হলো– শিল্পদক্ষতা ও চমৎকারিত্ব। অধিকন্তু তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে ছন্দোবদ্ধ ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে, তা অতিমাত্রায় নয় কিংবা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য নয়। অনুরূপভাবে তাঁর লেখা সাহিত্যিক উদ্ধৃতি ও অনুপম ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যে ভরপুর, যার সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা পাঠকের থাকলে তার পক্ষে তাঁর বক্তব্য

বুঝে ওঠা সম্ভব। মোদ্দাকথা, তাঁর সফরনামা অতি উঁচুমানের রচনা– যার মাধ্যমে সে যুগের একদল স্পেনীয় ভূগোলবিশারদের কৃতিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলা যায়।[১৩]

সমালোচকদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণসাহিত্য

রবীন্দ্র ভ্রমণসাহিত্য সমালোচক আবুল মোমেন লিখেছেন,

> ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোনো লেখকেরই ভ্রমণের এত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা নেই, ভ্রমণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের এত বইও নেই। সৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতো এখানেও রবীন্দ্রনাথ কেবল অনন্য নন, এক বিস্ময়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ১, ভূমিকা-১)

ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট সমালোচক আব্দুল কুদ্দুস আল-আন্সারী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তথ্যপঞ্জি ও প্রাচ্যবিদগণের দশ গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইবন জুবাইরের জীবনী লিখার সূচনালগ্নে মন্তব্য করেছেন এভাবে,

> এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই, কারণ ইবন জুবাইর নিঃসন্দেহে আরব পরিব্রাজকগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী, সমন্বিত পর্যবেক্ষক, রচনারীতিতে সিদ্ধহস্ত, স্বচ্ছ ভাব প্রকাশক, সাদামাটা বর্ণনাকুশল, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে সুচতুর, সমকালীন যুগের সার্বিক মুসলিম রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে সচেতন ও এর নিবিড় পর্যবেক্ষক এবং সিদ্ধান্তবাগীশ।[১৪]

ভ্রমণ সাহিত্যের আধুনিক সমালোচক আহ্মাদ রামাদান আহ্মাদ বলেছেন,

> নিঃসন্দেহে ইবন জুবাইর ছিলেন ভ্রমণ সাহিত্যের পথিকৃৎ, বিশেষ করে পশ্চিমা পরিব্রাজকগণের মাঝে। তাঁর উত্তরসূরি অনেক পর্যটক ও ঐতিহাসিক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করেছেন। যার বড়ো প্রমাণ হলো– পূর্বাপর অসংখ্য ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ তাঁর জীবনী লেখার কাজে ও তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রচার-প্রসারের ভূমিকায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।[১৫]

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, 'ট্রাভেল লিটারেচার' বা 'ভ্রমণসাহিত্য' মূল সাহিত্য অঙ্গনে এক নতুন সংযোজন। কালক্রমে এর কদর অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ও আরবি ভাষার পাঠক সমাজেও বাড়তে থাকে। এই ভ্রমণসাহিত্যের আরব কিংবদন্তী হলেন স্পেনের ইবন জুবাইর। তাঁর কিছুকাল পরে এহেন ভ্রমণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন মার্কো পোলো (১২৫৪ খ্রি.–১৩২৪ খ্রি.)। তাঁরও পরে ইবনে বতুতা (১৩০৪ খ্রি.–১৩৭৭ খ্রি.) যিনি মার্কো পোলোর চেয়েও বেশি পথ সফর করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ মুসলিম পর্যটক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়। তাঁর লেখায় একদিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের রস ও প্রসাদ যেমন মেলে, অন্যদিকে দার্শনিক মনের সত্যান্বেষণের বিশ্লেষণ থেকে মননের খোরাক জোটে। রবীন্দ্রনাথের কালে এবং পরেও পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের অবদানে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

টীকা

১. 'ভ্রমণ সাহিত্য ও প্রকৃতি' ,accessed on 05.09.2012, URL: http://clickforboi.in/book/ভ্রমণ সাহিত্য ও প্রকৃতি/

২. আরবি 'তুহফা' শব্দের অর্থ– gift, present, gen, work of art। বহুবচনে 'তুহফ' ব্যবহৃত হয়। (Hans Wehr, ১৯৬০ : ৯২)।

৩. 'আন্-নুয্যার' শব্দটি আন্-নাযির শব্দের বহুবচন। অর্থ-দায়িত্বশীল ব্যক্তি, মন্ত্রী অর্থেও শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় (ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, তা. বি. : ৯৩২)।

৪. তাঁর পুরো বংশতালিকা হলো– "মুহাম্মদ ইবন আহ্মাদ ইবন জুবাইর ইবন মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর ইবন সা'ঈদ ইবন জুবাইর ইবন সা'ঈদ ইবন জুবাইর ইবন সা'ঈদ ইবন জুবাইর ইবন মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান ইবন আব্দুস্সালাম ইবন মারওয়ান ইবন আব্দুস্সালাম ইবন জুবাইর।" (আল-মাক্কারীযী, ১৯৯১ : ১৫২।)

৫. ভালেন্সিয়া (Valencia) হলো- ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত স্পেনের পূর্বাঞ্চলের ভালেন্সিয়া প্রদেশের রাজধানী।

৬. ইবন আয্-যক্কাক আল-বালান্সী (৪৯০–৫২৮ হি.) হলেন 'আলী ইবন 'আতিয়্যাহ্ ইবন মুতার্‌রাফ আবুল হাসান আল-লাখ্মী আল-বালান্সী ইবন আয্-যক্কাক আল-বালান্সী, যিনি স্পেনের প্রসিদ্ধ কবি ইবন খাফাজার (Ibn Khafaja) (১০৮৫–১১৩৭ খ্রি.) ভাগ্নে ছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম প্রেমমূলক ও প্রশংসামূলক কাব্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৪০ বছরেরও কম সময় বেঁচেছিলেন। কবি ইবন আয্-যক্কাক এই ভালেন্সিয়া সম্পর্কে বলেছেন : "ভালেন্সিয়া শহর সম্পর্কে যখন তুমি ভাবতে থাকবে তখন তার নিদর্শন হিসেবে তুমি দেখতে পাবে যে, সেটি সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী শহর। আমার দৃষ্টিতে তার স্বপক্ষে তারই বড়ো দলিল হলো– তার সৌন্দর্য চোখের সামনেই স্পষ্টত দৃশ্যমান। পালনকর্তা যেন তাকে রেশমি কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন, তার রয়েছে দুটো নিদর্শন– সাগর আর উপত্যকা" (ইবন আয-যাক্কাক, ১৯৬৪ : ১৩৯; আল-মাক্কারী, ১৯৬৮ : ১৮০)। "Ibn_al-Zaqqaq" Wikipedia, the free encyclopedia, URL: http://en.wikipedia.org/ wiki/Ibn_al-Zaqqaq, accessed on 1 January 2014.

৭. বাল্জ ইবন বিশ্র ইবন 'আয়ায আল-কুশায়রী দামেশকের একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী বীর, যিনি গভর্নর যুগে [Wulat (Governors) Period– ৯৫ হি.–১৩৮ হি./১৭৪ খ্রি.–৭৫৬ খ্রি.] স্পেনের গভর্নর ছিলেন।

৮. স্পেনের ভালেন্সিয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত প্রাচীন শহর হলো শায়তুভা বা বায়তুভা (Xàtiva)।

৯. 'ঢ়ইবুজ নবই "URL: http://ar.lib.eshia.ir/40449/1/119, accessed on 1 January 2014.

১০. হাজী খালীফাহ্, (তা. বি.) : ৮৩৬।

১১. সালাহ-উদ্-দীন বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় করলে তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে ইবন জুবাইর তাঁর এক কবিতায় বলেন,

ক. তুমি সঠিক ধর্ম রক্ষার্থে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, কারণ প্রতিশোধগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ তোমাকেই বাছাই করেছেন।

খ. স্রষ্টার (ধর্মের) সহযোগিতায় তুমি উদ্যোগ নিয়েছ, তাইতো তিনি তোমাকে 'সাহায্যকারী রাজা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. বায়তুল মোকাদ্দাসকে জেরুজালেমের বুকে জয় করেছ, সুতরাং উহা তার স্বীয় পবিত্র গুণে স্বস্থানেই ফিরে এসেছে।

ঘ. তুমি সেখানে সৎপথের মিনারকে সমুন্নত করেছ, এবং তুমি তার বিলুপ্ত চিহ্ন থেকে পুনর্জীবন দান করেছ।

১২. (*"রিহ্লা ইবন জুবাইর"*, ১৯৯২ : ৫১)। হুসায়ন নাস্সার 'আব্হুর' নামটি সম্পর্কে মোটেও অবহিত নন। তাঁর মতে শব্দটি বিকৃত। আসলে জিদ্দার উত্তরেই 'আব্হুর'-এর অবস্থান। এটি বর্তমানে জিদ্দার উপকূলীয় গুরুত্বপূর্ণ শহরতলি। (ড. আহ্মাদ, তা. বি. : ৩২৪)

১৩. ক্র্যাচকোভসকি (Krachkovsky), ১৯৬৩ : ৩০০–৩০১।

১৪. আব্দুল কুদ্দুস আল-আন্সারী, (তা. বি.) : ১৬।

১৫. ড. আহ্মাদ, (তা. বি.) : ৩২৪।

সহায়কপঞ্জি

আত্-তুজায়বী (১৯৭৫)। *মুসতাফাদ আর্-রিহ্লাহ্ ওয়া আল্-ইগতিরাব*। সম্পাদক : আব্দুল হাফিয মান্সুর। আল-দার্ আল-আরাবিয়্যাহ্ লিল্-কুত্তাব, কায়রো।

আনওয়ার আব্দুল আলীম (১৯৭৮)। *আল-মাল্লাহাঃ ওয়া 'উলূমুল বিহার 'ইন্দাল্ 'আরাব*। 'আলাম আল-মা'রিফাহ্, কুয়েত।

আফিফা মাহ্মুদ দায়রানী (১৯৬৪)। *ইবনুয্যাক্কাক আল-বালেন্সি*। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, আরবি বিভাগ, আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়, বৈরূত।

আব্দুর রহ্মান হামীদাহ্ (১৯৯৫)। *আ'লাম আল-জুগ্রাফিইয়ীন আল-'আরাব ওয়া মুক্বতাতাফাত মিন্ আছারিহিম্*। দার আল-ফিক্র, দামেশক।

আব্দুল কুদ্দুস আল-আন্সারী (তা. বি.)। *মা'আ ইবন জুবাইর ফি রিহ্লাতিহি*। ———।

আয্-যিরিক্লী (২০০২)। *আল-আ'লাম*। দার আল-ইল্ম লিল্-মালায়ীন, বৈরূত।

আল-মাক্কারী (১৯৬৮)। *নাফ্হু আত্-ত্বীব মিন্ গুস্ন আল-আন্দালুস আর্-রাত্বীব*। সম্পাদক : ইহ্সান 'আব্বাস। দার সাদির, বৈরূত।

আল-মাক্বরীযী (১৯৯১)। *আল-মুক্বাফ্ফা আল-কাবীর*, ৫ম খণ্ড। সম্পাদক : মুহাম্মাদ আল-ইয়া'লাবী। দার আল-গার্ব আল-ইসলামী, বৈরূত।

আল-মুর্সী আদ্-দাব্বী (১৯৮৯), *বুগ্য়াহ্ আল-মুল্তামিস্ ফী তারীখ রিজাল আহ্ল আল্-আন্দালুস*। সম্পাদক : ইব্রাহীম আল-আবয়ারী। দার আল-কিতাব আল-মিসারী-দার আল-কিতাব আল-লুবনানী, বৈরূত।

আহ্মাদ বাদ্র (১৯৭২)। *দিরাসাত ফি তারিখ আল-আন্দালুস ওয়া হাদারাতুহা মিন্ আল-ফাত্হ হাত্তা আল-খিলাফাহ্*। দামেশক।

আহ্মাদ রামাদান আহ্মাদ (তা.বি.)। *আর্-রিহ্লাহ্ ওয়া আর-রাহ্হালাহ্ আল-মুসলিমূন*। দারুল বায়ান আল-'আরাবী, জিদ্দা।

ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভসকি (১৯৬৩)। *তারিখ আল-আদব আল-জুগ্রাফি আল-আরবি*। অনুবাদক : সালাহুদ্দীন হাশিম। মাতবা'আহ্ লাজ্নাহ্ আত্-তালীফ ওয়া আত্-তারজামাহ্ ওয়া আন্-নাশ্র, কায়রো।

ইবন আয-যাক্কাক আল-বালান্সি (১৯৬৪)। *দিওয়ান*। সম্পাদক : 'আফিফা মাহমুদ দায়ারানি। দার আস-সাক্বাফাহ্, বৈরূত।

ইবন জুবাইর (১৯০৭)। *রিহ্লা ইবন জুবাইর*। সম্পাদক : উইলিয়াম রাইট। ব্রেইল প্রেস (*Braille Press*), লাইডেন।

ইবন জুবাইর (তা.বি.)। *রিহ্লা ইবন জুবাইর*। দার সাদির, বৈরূত।

ইবনে বতুতা (১৯৬৮)। *ইবনে বতুতার সফরনামা*। অনুবাদক : মোহাম্মদ নাসির আলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য (তা. বি.)। *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*। কুতুবখানা হোসাইনিয়া, দেউবন্দ।

উমার রিদা কাহ্হালাহ্ (১৯৯৩)। *মু'জাম আল-মু'আল্লিফীন* ৩য় খণ্ড। মু'আস্সাসাহ্ আর্-রিসালাহ্, বৈরূত।

কার্ল ব্রকেলম্যান (তা.বি)। *তারিখ আল-আদাব আল-'আরাবী* ৩য় খণ্ড। দার আল-মা'আরিফ, কায়রো।

জুরজী যায়দান (১৯৯৬)। *তারিখ আদাব আল্-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ্* ৩য় খণ্ড। দার আল-ফিক্র, বৈরূত।

ফুয়াদ সায্কীন (১৯৯১)। *তারিখ আত্-তুরাছ আল-'আরাবি*। জামি'আহ্ আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সু'উদ আল-ইসলামিয়্যাহ্, রিয়াদ।

বাদ্রিয়্যাহ্ বিন্ত 'আলী ইবন জাম্'আহ্ আশ-শু'আইবী (২০০৬)। *'আসরুল-ওলাত্ ফি আল-আন্দালুস (৯৫ হি.-১৩৮ হি./ ৭১৪ খ্রি.-৭৫৬ খ্রি.) দিরাসাহ্ সিয়াসিয়্যাহ্ ওয়া হাদারিয়্যাহ্*। একটি মাস্টার্স অভিসন্দর্ভ, কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়, ওমান।

বিলাল সালিম আল-হারূত্ব (২০০৮)। *সূরাতুল আখির ফি আদাব আর্-রিহ্লাত আল-'আন্দালুসিয়্যাহ্*। পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মুতাঃ বিশ্ববিদ্যালয়, জর্ডান।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইনান (১৯৬৯)। *তারিখ আল-আন্দালুস মিন্ আল-ফাত্হ ইলা বিদায়াহ্ 'আহ্দ আন্-নাসির*। কায়রো।

মুহাম্মাদ ইবন ফাতূহ্ আল-হুমাইদী (১৩৭১ হি.)। *জায্ওয়াহ্ আল-মুক্তাবাস ফি যিক্র ওলাত আল-আন্দালুস*। কায়রো।

যকী মুহাম্মাদ হাসান (১৯৮১)। *আর্-রাহ্হালাহ্ আল-মুস্লিমূন ফী আল-'উসূর আল-উস্ত্বা*। দার আর্-রা'য়িদ আল-'আরাবি, বৈরূত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১০)। *রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য সমগ্র* (প্রথম খণ্ড : পাশ্চাত্য)। সম্পাদক : আবুল মোমেন। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১০)। *রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাচ্য)। সম্পাদক : আবুল মোমেন। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

লিসানুদ্দীন ইবন আল-খাতীব (১৯৭৪)। *আল-ইহাতাহ্ ফি আখবারি গার্নাতাহ্* ২য় খণ্ড। সম্পাদক : মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ 'ইনান। মাকতাবাহ আল-খান্জী, কায়রো।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (২০১৩)। *ভ্রমণ সমগ্র*। পত্র ভারতী, কলকাতা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (২০১৩)। *ভ্রমণ সমগ্র*। পত্র ভারতী, কলকাতা।

হাজী খালীফাহ্, (তা. বি.)। *কাশ্ফুয্যুনূন 'আন্ আসামিল্ ফুনূন* ১ম খণ্ড। দার্ ইহ্য়া' আত্-তুরাছ্ আল-'আরাবী, বৈরূত।

হাস্নী মাহ্মূদ হুসায়ন (১৯৮৩)। *আদব আর্-রিহ্লাহ্ 'ইন্দাল-'আরব*। দার্ আল-আন্দালুস, বৈরূত।

হুমায়ূন আহমেদ (২০১৩)। *ভ্রমণসমগ্র*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

হুসায়ন নাস্সার *সম্পা.* (১৯৯২)। *রিহ্লা ইবন জুবাইর*। মাকতাবাহ্ মিসর, জিদ্দাহ।

Hans Wehr (1960). *A Dictionary Modern Written Arabic Arabic-English*. (ed) J. Milton Cowan, New York.

তিতাস একটি নদীর নাম : লোকজীবনের পাঠ-প্রতিবেদন

তাশরিক-ই-হাবিব*

[সারসংক্ষেপ : অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যের সেসব বিরলপ্রজ লেখকদের একজন, যাঁরা স্বল্পায়ু জীবনে গুটিকয়েক লেখা দিয়েই নিজের নাম কালের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করতে সমর্থ হয়েছেন। নিজে মালো পরিবারের সন্তান বিধায় বর্ণহিন্দু সমাজের সম্যক অবস্থাকে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাযোগে তিনি গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। পাশাপাশি প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণসূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসে গ্রন্থিত করতে তিনি ছিলেন অনুধ্যানী। কবিতা দিয়ে লেখালেখি শুরু হলেও এরপর গল্প ও প্রবন্ধে অভিনিবেশ দান, বিদেশি লেখকের উপন্যাস অনুবাদ, সাংবাদিকতা প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত থাকলেও তিনি যে একজন জাত ঔপন্যাসিক, তা বোঝার জন্য বোদ্ধা পাঠকের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি পাঠের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের অকৃত্রিম জীবনভাষ্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় উন্নীত করে তিনি কালজয়ী কথাশিল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের রূপায়ণ ঘটেছে। এসব উপাদানের সমাবেশে তিতাসপাড়ের লোকসমাজের পূর্ণাঙ্গ চালচিত্র অসামান্য ভাষ্যরূপ পেয়েছে এ উপন্যাসে। তিতাসপাড়ের মালো ও চাষি সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির রূপরেখা এ প্রবন্ধে আলোচিত হবে।]

অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪–১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) নদীভিত্তিক বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ অবস্থানে উত্তীর্ণ।[১] তিতাসপাড়ের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি অদ্বৈতের অকুণ্ঠ অনুরাগ[২], মালো সম্প্রদায়ের একজন হয়েই তাদের জীবনসংগ্রাম ও অস্তিত্বসংকটকে অনুধাবনের আন্তরিকতা[৩], সর্বোপরি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের জীবনসংগ্রামের অনিঃশেষ চালচিত্রকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে শিল্পভাষ্যে রূপদানের সামর্থ্য উপর্যুক্ত দাবির সহায়ক সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, শিক্ষাহীনতা প্রভৃতির সমন্বিত অভিঘাতের পাশাপাশি প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা মালো সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে আদ্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রেণিবিভক্ত বাঙালি সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে অবনমিত এ লোকগোষ্ঠীর প্রবঞ্চিত, বিড়ম্বিত জীবনধারার রূপায়ণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর সামগ্রিক, পক্ষপাতহীন। সেকারণেই শত অভাব-অনটন আর উদরপূর্তির লড়াইয়ের প্রতিবেদনেও তিনি অন্বেষণ করেন তাদের সামাজিক পরিচয় ও সংকটের অভিন্ন উৎসমূলে। সেটি নিঃসন্দেহে তাদের বহুবর্ণিল, বহুস্তরিক সাংস্কৃতিক জীবন। বহুকাল ধরে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে নিত্যদিনের যাপিত জীবনে অনুসরণ ও প্রতিপালনে তারা অত্যন্ত সচেতন, একনিষ্ঠ। এর সাক্ষ্য রয়েছে উপন্যাসভুক্ত কুশীলবদের আচার-আচরণে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ও মেলামেশায় জীবিকানির্বাহ-প্রণালিতে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারিবারিক অনুশাসনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনে, ভাবনা ও অন্তর্বাস্তবতার সম্মিলনে গড়ে ওঠা লোকজসমষ্টিচেতনার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে। তিতাসপাড়ের লোকগোষ্ঠী হিসেবে শুধু মালো সম্প্রদায়ের চালচিত্র উপস্থাপনেই তিনি লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এর

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশী এবং নিত্যদিনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের সঙ্গী ভূমিনির্ভর মুসলমান কৃষকসমাজের বৃত্তান্তও সমান্তরালভাবে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত ক্যানভাসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ, অখণ্ডিত বয়ানের এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাসে নিঃসন্দেহে বিরল, অভূতপূর্ব।

১. লোকবিশ্বাস

তিতাসপাড়ের মালো ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস প্রচলিত। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এসব বিশ্বাস বহুলাংশেই যুক্তিহীন, কাল্পনিক ধারণাপ্রসূত ও বাস্তবতাবিবর্জিত। কিন্তু অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিয়তিবাদী এবং প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকানির্বাহে বাধ্য লোকসমাজের বাসিন্দাদের নিকট এসব বিশ্বাস মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। কেননা, ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যার অপেক্ষাকৃত সরল এবং নিজস্ব প্রয়াস সংহত সমাজের সাধারণ প্রবণতা। এতে তাদের নিজস্ব চিন্তা এবং কল্পনার সামর্থ্যও প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া এসব বিশ্বাস প্রায়শই পূর্বসূরিদের নিকট থেকে অর্জিত বলে তা মান্য করার ঝোঁকও তাদের মধ্যে প্রবল। এ উপন্যাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। যেমন 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ নৌকায় চড়ে মেঘনার বড়ো গাঙ সংলগ্ন শুকদেবপুর গ্রামের উজানিনগর খলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। একপর্যায়ে নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে বৈঠা বাইতে গিয়ে অল্পবয়সি সুবল কিছুটা ভীত হলে কিশোর তাকে সাহস জোগায়, 'না সুবলা, ডরাইস না। গাঙের ডর মাইঝ গাঙে না, গাঙের বিপদ পারের কাছে। বা'র গাঙে মা গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৮)। বলাবাহুল্য, এ লোকবিশ্বাস কিশোরের ব্যক্তিগত ধারণাপ্রসূত নয়। পরিবার ও সমাজের বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনা বিশ্বাসকে সেও প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর সংকটকালীন মুহূর্তে অবলম্বন করতে চায় প্রতিকূলতা অতিক্রমের তাগিদে। কেননা, সেও ভীত হয়েছিল অকূলবিস্তারী মেঘনার প্রবল স্রোতে নৌকা চালাতে গিয়ে। সে জানে, নদীতে যাত্রাকালে অনেকেই ডুবে মারা যায়। অর্থাৎ মা গঙ্গার কৃপায় সকলে বিপদের মুহূর্তে রক্ষা পায় না। তবু, ব্যক্তিগত সংকট মোকাবেলার জন্য এ ধরনের বিশ্বাসের ওপর ভরসা করা লোকসমাজের বাসিন্দাদের স্বভাবেরই অংশ। আবার বাঁশিরাম মোড়ল তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের একপর্যায়ে সে কিশোরদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচয় জানতে চায়। কিশোর জানায়, তারা কৃষ্ণের অনুসারী। একথা শুনে বাঁশিরাম জানায়, স্বয়ং কৃষ্ণই তাদের মিলিয়ে দিয়েছে। কেননা, বাঁশিরামও একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এভাবেই লোকবিশ্বাসের ভিত্তি জনমনে বিস্তৃত হয়। কাকতালীয়ভাবে মিলে যাওয়া ঘটনাকেও লোকবিশ্বাস হিসেবে বিবেচনা লোকমানুষের বিশেষ প্রবণতা। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মেয়েদের মধ্যে এমন ধারণা প্রচলিত যে, 'রামের হাতের ধেনু, লক্ষ্মণের হাতের ছিলা, যেইখানের ধেনু সেইখানে গিয়া মিলা'— ছড়াটি আবৃত্তি করলে রংধনু আকাশে মিলিয়ে যায়। সেকারণেই ছোটবেলায় বনমালী উদয়তারাকে নতুন কাচের চুরি কিনে দিলে সে তা পরিধান করে এ ছড়াটি আবৃত্তি করতো। বাসন্তীর কাছ থেকে অনন্ত মালো লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। মৃত মানুষের বিদেহী আত্মা যে প্রিয়জনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, এমনকি ছলে-বলে ক্ষতি করতে চায়, অনন্ত এ বিষয়ে তার কাছ থেকে ধারণা পায়।

> মা যদি মরিয়া যায়, তবে সে মা আর মা থাকে না, শত্তুর হইয়া যায়। মরিয়া যেখানে চলিয়া গিয়াছে, ছেলেকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য সবসময়েই তার লক্ষ্য থাকে। অন্তত শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত একমাস তো খুব ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়। তার আত্মা তখন ছেলের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কি না। একা পাইলে, কিংবা আঁধারে, কি বট বা হিজল গাছের তলায় পাইলে, কিংবা নদীর পারে পাইলে, কাছে কেউ না থাকিলে লইয়া যায়। নিয়া মারিয়া ফেলে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯২)

অনন্তের ধারণা, তার মৃত মা কাক হয়ে তাকে দেখতে আসে। অন্য কাকের সঙ্গে সেও আসে খাবার খেতে। কিন্তু যারা মারা যায়, তারা জীবিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। অনন্ত তার মাকে দেখলে কথা বলতে চাইবে বলেই তার মা উড়ে চলে যায়, এ ধরনের শিশুতোষ রূপকথাও তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে বাসন্তীর নিকট থেকে শোনা গালগল্পের কারণে। পাশাপাশি 'লোকে তেপথা পথে রোগীকে স্নান করায়, ফুল দিয়া রাখে। যে পা দিবে সেই মরিবে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৪)। লোকসমাজে এ ধরনের বিশ্বাসও যে প্রচলিত, তা লক্ষণীয় বাসন্তীর মার ক্ষুব্ধ মনোভঙ্গিতে। পরের ছেলে অনন্তকে লালনপালন করতে বাসন্তীর যে আগ্রহ, তা তার পছন্দ নয়। নিজের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে একজন বাড়তি মানুষ থাকলে তার খরচ ও ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করতে বাসন্তীর বাপের পরিশ্রম বহুলাংশে বেড়ে যায়। সেকারণেই বাসন্তীর বৃদ্ধ বাবা-মা অনন্তকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে চায়। অনন্তের অমঙ্গল প্রত্যাশায় বাসন্তীর মা চায়, সে যেন একদিন ভুলবশত তেপথা পথে যায় এবং তার বাড়িতে আশ্রয় নিতে না পারে। লোকবিশ্বাসের অন্যতম মাধ্যম হলো স্বপ্ন। অবচেতনলোকে সঞ্চিত বিচিত্র বিশ্বাস ও ঘটনা স্বপ্নে রূপক-প্রতীকী তাৎপর্যে আভাসিত হয়। 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে তিতাস নদী শুকিয়ে যাবার পরিণতিতে এর তীরে বসবাসরত মালোদের অস্তিত্বসংকটের ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে রাধাচরণ মালোর জবানিতে– 'দেখলাম স্বপ্ন, তিতাস শুখাইয়া গেছে। এই স্বপ্ন কি মিছা হইতে পারে। দেখলাম গাঙে বিশ-হাতি বাঁশ ডুবাইয়া তলা ছোঁয়া যায় না, সেই গাঙের মাঝখান দিয়া ছোটো একটা মানুষ হাঁইট্যা চলছে। যে যে জায়গা দিয়া সে গেছে, একটু পরেই দেখলাম সেই সগল জায়গায় আর জল নাই; শুকনা। ঠনঠন করতাছে। বুকটা ছাৎ কইরা উঠল। হাত পাও কাঁপতে লাগল। নাওয়ে আমি একলা। এমুন ডর করতে লাগল যে একবার চিৎকার দিয়া উঠলাম' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫২)। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চর সম্পর্কে ধারণা লাভের পরিণতিতে জীবিকা বিঘ্নিত হবার বিপন্নতাবোধই তাকে তাড়িত করেছে, যা এ স্বপ্নদৃশ্যে রূপায়িত।

২. লোকসংস্কার

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের হিন্দু মালো ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। কিছু সংস্কারের সঙ্গে লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। যেমন– 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে ডাকাত আক্রমণের পর অনন্তের মা নদীতে লাফিয়ে আত্মরক্ষা করলেও আকস্মিকভাবে আরেক অচেনা নারীর মৃতদেহ নৌকার কাছে দেখে তিলক 'রাম' নাম সম্বোধন করে। তেমনিভাবে 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে রাধাচরণ মালো তিতাস নদী শুকিয়ে যাবার দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত অবস্থায় তিনবার 'রাম' নাম উচ্চারণ করে ভয় কাটায়। গোকর্ণঘাট গ্রামে যাত্রাকালে অনন্তর মা গৌরাঙ্গের ভিটাসংলগ্ন তুলসী গাছকে প্রণাম করে। আবার নৌকায় উঠে সে নৌকাকেও প্রণাম করলে তার ছেলে অনন্তও মায়ের

অনুসরণে একই আচরণ করে। গৌরাঙ্গ 'গঙ্গা'র নাম স্মরণ করে লগি ঠেলে নৌযাত্রা করে। কিশোর ও সুবলকে নিয়ে প্রবাসে যাত্রাকালে তিলকচাঁদ পাঁচপির বদরের ধ্বনি দিয়ে নৌকার লগি চালায়। হিন্দু মালোদেরও মুসলমান পিরের নাম স্মরণের প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করায় একের বিশ্বাস-সংস্কার-অভ্যাস ও রীতিনীতি অন্যকেও প্রভাবিত করেছে, যার অন্তরালবর্তী উদ্দেশ্য হলো যে কোনোভাবেই হোক, কাজে সফল হওয়া এবং সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া। কোনো কাজ শুরু করার আগে নিজ ধর্মের বিশেষ ভাবমূর্তিসম্পন্ন কারো নাম স্মরণও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ জোবেদ আলীর তিন ছেলে নদীর ওপারের চরে আলু রোপণ করে। তারা নদীপথে গন্তব্যে পৌঁছতে 'আলী'র নাম স্মরণ করে নদীতে নৌকা ভাসায়। আবার তাদের বাড়ির দুই বাঁধা কামলা করমালী ও বন্দেআলী 'আল্লা আল্লা মোমিন মোমিন' উচ্চারণপূর্বক গৃহপালিত গরুগুলোকে সাঁতার কাটিয়ে নদী পার করিয়ে চরে আবাদের কাজে লাগায়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে বিবৃত গৌরাঙ্গসুন্দরের আচরণে। সে নদীতে নৌকা ভাসানোর সময় 'গঙ্গা মা'-র নাম স্মরণ করে। নদীপথে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষার তাড়নাবশত স্বীয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এ ধরনের লোকসংস্কারের প্রচলন ঘটে। হিন্দু বিবাহিত নারীর ধর্মীয় লোকসংস্কার মান্য করার বিধান হিসেবে হাতে শাখা, কপালে সিঁদুর পরিধানের অনুশাসন রয়েছে। বিধবা হলে এ বেশ ও রঙিন শাড়ি ছেড়ে তাকে আজীবন সাদা শাড়ি পরতে হয়। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অনন্তের মা শ্বশুরবাড়ি আসার পথে ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হলে নদীতে লাফিয়ে আত্মরক্ষা করে। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ তাকে উদ্ধার করে নিজেদের পরিবারে আশ্রয় দেয়। কিন্তু সেই নারীর বৃত্তান্ত শুনে গৌরাঙ্গ তার পরনের বেশ ছাড়িয়ে বিধবা নারীর আভরণ পরায়। কারণ, ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন শাস্ত্রে মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত। তাই গৌরাঙ্গ এ অভিযোগে অভিযুক্ত হতে অসম্মত। ধর্মীয় অনুশাসন লোকসমাজে কতটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, এ ঘটনা এরই সাক্ষ্যবহ। আবার, 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সংসারের কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতাবশত হাতে পরিহিত কয়েকটি চুড়ি ভেঙে যাওয়ায় রমুর মা খুশি উদ্বিগ্ন হয়। কারণ তার শ্বশুর কাদির মিয়া ব্যাপারটি জানলে নির্ঘাত তিরস্কার করবে । আর বাঙালি গ্রামীণ মুসলমান সমাজেও গৃহবধূর হাত খালি রাখা নিষিদ্ধ। সম্ভবত প্রতিবেশী হিন্দু নারীদের হাতে শাখা পরার বাধ্যতামূলক নির্দেশ এভাবেই মুসলমান সমাজে সম্প্রসারিত হয়েছে। গৃহবধূর হাত, নাক গলা ও কানে সাধ্যমত অলংকার পরিধানের সংস্কারও এভাবেই বোধহয় প্রচলিত হয়েছে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পিঠা বানানোর আয়োজনে বাসন্তী খোলায় বানানো প্রথম পিঠাটি রাধামাধবকে পরিবেশনের জন্য রেখে দেয়। নজর লাগা বা অপদৃষ্টি, কুদৃষ্টি সংক্রান্ত লোকসংস্কারও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। কারো প্রলুব্ধকর দৃষ্টির জন্য ক্ষতি বা অমঙ্গলের আশঙ্কা থেকে এ ধরনের সংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে নববিবাহিত কিশোর তার স্ত্রীর প্রেমে বিমুগ্ধ বলেই বাড়ি ফেরার পথে নৌকায় তাকে বারবার দেখতে চায়। কিন্তু নদীপথে ডাকাতের আক্রমণের আশঙ্কাবশত তিলকচাঁদ কিশোরের স্ত্রীকে নৌকারা পাটাতনে লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করে। সে কিশোরকে সতর্ক করে, 'নাওয়ের ডরার ভিতরে নজর লাগাইও না কিন্তুক' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৬)। লোকসমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পরিবারের বয়স্ক ও মান্য ব্যক্তিদের নাম ধরে সম্বোধন না করা, কারো মৃত্যু ঘটলে সরাসরি না বলে ভিন্নভাবে বিষয়টির উপস্থাপন এসবই লোকসংস্কারের অন্তর্গত। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে

অনন্তের মায়ের বাড়িতে আগত প্রতিবেশী বর্ষীয়সী নারীরা আলাপকালে একজন পান খেতে খেতে জানায়, সে খুব বেশি বটপাতা খায়। অনন্তের মা একথা শুনে অবাক হলে আরেকজন তখন জানায় 'তাইনের শ্বশুরের নাম পাণ্ডব। পান কইতে পারে না, পানেরে কয় বটপাতা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৬)। শ্বশুরকে পরিবারের গৃহকর্তা তথা বটবৃক্ষ বিবেচনায় 'বটঠাকুর' নামও বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত। তাই তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত পানের পরিবর্তে 'বট' নামকরণ থেকে এ ধরনের লোকসংস্কারের অন্তরালে সক্রিয় বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, যার অন্তরালে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যসূচক মনোভাব জোরালোভাবে বিদ্যমান। 'রামধনু' পরিচ্ছেদেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'উদয়তারার এক ননাসের নাম ছিল মনসা। তাই মনসাপূজা বলিতে পারে না। স্বামী যেমন মান্য, স্বামীর বড় বোনও তেমনি মান্য' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১২)। একারণে সে মনসা পূজাকে 'শাওনাই পূজা' হিসেবে সম্বোধন করে। কেননা, শ্রাবণ মাসে এ পূজা করা হয়। বিধবার বেশে অনন্তর মাকে দেখে বাসন্তী অনন্তের বাবার মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে সরাসরি 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার না করে বলে, 'ছাওয়ালের বাপ কবে স্বগগে গেল দিদি' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)। এভাবে অপেক্ষাকৃত সহনীয় পর্যায়ে ব্যাপারটিকে উপস্থাপনের শিক্ষাও লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কারবিশেষ। আবার স্বামীর নাম উচ্চারণও নারীদের জন্য নিষিদ্ধ বলে সন্তানের পিতার পরিচয়ে তাকে সম্বোধনের ব্যাপারটিও এ সংলাপে প্রকাশিত। পারিবারিক সংস্কার হিসেবে পর্দাপ্রথা মান্য করাও লোকসমাজের রীতি। যেমন বহুদিন পর বনমালীর বাড়িতে তার বিবাহিত তিন বোন এবং তাদের স্বামীরা উপস্থিত হয়। ছোটো বোন আসমানতারার সঙ্গে তার স্বামী থাকায় বড়ো বোন নয়নতারা ও মেজো বোন উদয়তারা দ্রুত ঘোমটা টেনে কপাল ঢাকে। 'কেবল আসমানতারার ঘোমটা কপালের নিচে নামিল। বড়ো বোনদের দুর্দশা দেখিয়া সে মৃদু হাস্য করিতে লাগিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৭)। সন্ধ্যালগ্নে ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে হয়। এসময় ঘর অন্ধকার রাখা অমঙ্গলজনক, এমন সংস্কার অত্যন্ত প্রাচীন। সেকারণে অনন্তের মা ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর প্রয়োজন না থাকলেও সংস্কারবশত তা জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দেয়। এরপর বাসন্তীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিঠা বানাতে কিশোর অর্থাৎ তার পাগল স্বামীর বাড়ি যায়। অভিশাপ দেওয়া লোকসমাজের প্রাচীন সংস্কারের অন্তর্গত। এ উপন্যাসে এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। দয়ালচাঁদের সঙ্গে কালোবরণের ভাইয়ের বিবাদের মূলে ছিল পুরুষতন্ত্রের ধারক তথা ছেলে সন্তান সম্পর্কিত বিরোধ। দয়ালচাঁদের মতে, অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রী মুখে জল দেয়। আর 'পুত ত কুত্তার মুত' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)। কিছুদিন আগেই পুত্রের জনক হওয়া কালোচাঁদের ভাই এ মন্তব্য শুনে অবিবাহিত দয়ালচাঁদকে 'আটকুঁড়ার রাজা' সম্বোধন করে। পিতৃত্বহীনকার অপবাদে অপমানিত দয়ালচাঁদ কালোবরণের ভাইকে অভিশাপ দেয়, 'অহন থাইক্যা তোরেও যেন ঐশ্বরে আটকুড়া বানাইয়া রাখে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)। অনন্তের মার মৃত্যুর পর বাসন্তী অনন্তকে নিজের পরিবারে রাখলেও তার বৃদ্ধ বাবা-মার এতে সম্মতি ছিল না। একপর্যায়ে সে এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কলহে, এমনকি হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। অসহায় এতিম বালক অনন্তের এক্ষেত্রে কিছুই করার ছিল না। তবু রাগের বশে মায়ের সঙ্গে অশোভন আচরণের পরিণতিতে গ্লানিবশত অনন্তের প্রতি বাসন্তীর ক্রোধ তীব্র হয়ে ওঠে। তাই সে তাকে অভিশাপ দেয় 'শত্তুর, তুই বাইর হ। এই ঘরে তুই ভাত খাস ত তোর সাত গুষ্ঠির মাথা খাস। তোর লাগি আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি, ঠ্যাঙ্গের তলা, পায়ের ধূলা। যা যা অখনই যা, যমের মুখে যা। ডাকিনী যোগিনীর মুখে যা, কালীর মুখে যা। ধর্মে যেন আর তোরে ফিরাইয়া না আনে। চোখের মাথা নাকের মাথা খাইয়া যেখানে যমে টানে, সেইখানে যা। আমার সামনে আর মুখ দেখাইস না। তোর মা গেছে যে-

পথে, তুইও সেই পথে যা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৭)। বাসন্তীর মা অনন্তকে পরের ছেলে ভেবে নিজ সংসারে ঠাঁই দিতে চায়নি। তার প্রতি বাসন্তীর মমত্বকে আদিখ্যেতা মনে হয় বলেই সেই বৃদ্ধা অকপটে উচ্চারণ করে 'শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক। সুবচনীর পূজা করুম' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯২)। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লেনদেন সংক্রান্ত লোকসংস্কারের পরিচয় লক্ষণীয়। কাদির খেতের আলু বিক্রির জন্য ছেলে ছাদিরকে নিয়ে হাটে আসে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ধরনের সংস্কার প্রচলিত, নিজের পণ্য বিক্রি শুরু হওয়ার আগে কাউকে ধার দিতে বা দান করতে নেই। এতে নাকি ব্যবসা মার খায়। সেদিন হাটে আগত দরিদ্র বালকদের দেখে আলু বিক্রি হওয়ার আগেই কাদির মমতাবশত কিছু কাটা আলু তাদের দিলে ছাদির ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানায়, 'না করলাম বোয়ানি, না করলাম সাইত; তুমি বাপ অখনই এইভাবে দিতে লাগছ' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৭)। পূর্বপুরুষের ভিটায় আমৃত্যু বসবাসের ইচ্ছা লোকসংস্কারভুক্ত হলেও এর অন্তরালে নিজ পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ প্রবল। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ অনন্তের মায়ের সঙ্গে গোকর্ণঘাট গ্রামে নতুন করে বসবাসের ব্যাপারে যে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, এটিই এর মূল কারণ। আজন্মলালিত নাড়ির টানকে তারা অস্বীকার করতে পারে না। 'তারাও যদি এ-নদীর পারে ঘর বাঁধিত! কিন্তু জন্মভিটার এমনি তাদের মায়া, বুড়া হইয়াছে, সব ছাড়িবে, তবু জন্মভিটা ছাড়িবে না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৩)। নিজের শেকড়কে কখনো ছিন্ন করতে নেই, এ ধরনের লোকসংস্কারও সম্ভবত এ ঐতিহ্যকে অনুসরণসূত্রেই উদ্ভূত। দিব্যি দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে সুবলের বাবা-মায়ের কলহের বৃত্তান্তে। সুবলের বাপ গগন মালোর আর্থিক অসংগতি আর পরিশ্রমবিমুখতার কারণে আজীবন পরের ওপর নির্ভরশীল হবার বাধ্যবাধকতা তার স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্ত করত। কারণ, 'যৌবনে সুবলের মা ভর্ৎসনা করিত, এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা। এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন?' গগনচন্দ্র নিজে এ কাজে সফল না হলেও ছেলে সুবলের ওপর ভরসা থাকায় প্রত্যুত্তরে সে স্ত্রীকে জানাত, 'আমার সুবল আছে। আমি ত করতাম পারলাম না, নাও-জাল আমার সুবলে করব। অত ভেন্ ভেন্ করিস না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৫)। বশীকরণ আদিম লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত, যা বিশেষভাবে বেদে, ফকির, কবিরাজ, সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত। অর্থের বিনিময়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তির দুর্দশা মোচনের লক্ষে জাদু, তন্ত্র-মন্ত্র-চালান, জড়িবুটি, শিকড় প্রভৃতিকে অবলম্বন গুপ্তবিদ্যার চর্চায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত কাজ। তাদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গালগল্প-কিংবদন্তি লোকসমাজে প্রচলিত। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে অনন্তের মার বাড়িতে আগত প্রতিবেশী নারীদের আলাপে এ প্রসঙ্গ বিবৃত হয়—

> একজন গল্পের ঝাঁপি খুলিল, 'আমার শ্বশুরের অনেক কিচ্ছা আছে। তুমরি খেলা জানত। উঠানের দুই দিকে দুই উস্তাদ খাড়াইত। একজন মন্ত্র পইড়া সাপ চালান দিত, আরেকজন ময়ূর চালাইয়া সেই সপ্প সংহার করত। সেই মন্ত্র জানা না থাকলে মরণ। সেইজন আবার ফিরতি আগুন চালান দিত, অন্য একজন বরুণ মন্ত্রে মেঘ নামাইয়া আগুন নিভাইত। একবার কামরূপ কামিখ্যা হইতে এক উস্তাদ বাদ্যানী আইল আমার শ্বশুরের লগে তুমরি খেলতে। পরথম খেলা হইল গাওয়ের আর এক উস্তাদের লগে। বাদ্যানী সরষার মধ্যে মন্ত্র পইড়া উস্তাদের পরাণ টিপ্যা ধরল— বাদ্যানী সরষাবান্ধা গিরোর মধ্যে টিপ দেয়, আর উস্তাদের নাক দিয়া গল গল কইরা রক্ত পড়ে। উস্তাদ এর পাল্টা মন্ত্র জানত না। আমার শ্বশুর আছিল কাছেই। বাদ্যানীরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফালাইয়া সরষা-বন্ধন খুইল্যা উস্তাদরে বাঁচাইল। বাদ্যানী রাইগ্যা আগুন। কইল, 'বাপের বেটা হওত, এই মারলাম ভীমরুল বাণ, বাঁচাও নিজেরে।' আমার শ্বশুর ধুলাবৃষ্টি বাণে সব ভীমরুলকে কানা কইরা দিল, আর পাল্টা এমন এক বাণ মারল— বাদ্যানীর পিন্ধনের শাড়ি কেবল উপরের দিকে উঠে,

> কেবল উপরের দিকে উঠে। দুই হাতে যতই নীচের দিকে টাইন্যা রাখতে চায়, শাড়ি ততই ফরাত কইরা গিয়া উপরে উঠে। শেষে বাদ্যানী এক দৌড়ে তার নাওয়ের ভিতরে গিয়া লাজ বাঁচাইল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৭)

৩. লোকাচার

এ উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের লোকাচারের উল্লেখ রয়েছে। নবজাতক শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে তাকে মুখে খাবার তুলে দেওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে, বিয়ের অনুষ্ঠানের তথা উৎসবময়তার সঙ্গে লোকাচারের সম্পৃক্ততা এতটাই অচ্ছেদ্য যে, এদেরকে পৃথক করা চলে না। তবে সামাজিক আচারের মধ্যে কুটুম্বিতা, অচেনা মানুষকে আপন করে নিতে বিভিন্ন আচার পালন এসবও এর অন্তর্গত। বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদের নিমন্ত্রণ, উত্তরায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মালোপাড়ার বাসিন্দাদের একের বাড়িতে অন্যের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি কুটুম সংক্রান্ত লোকাচারের দৃষ্টান্ত। গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের জন্য এলে অনন্তের মাকে গ্রামের নারীমহলের আপন করে নেওয়ার চেষ্টা, পান সুপারি খেতে চাওয়া ও ছল করে তাকে বিব্রত করার মাধ্যমে নিজেদেরই সেসব বায়না মিটিয়ে তাকে কাছে টানা প্রভৃতি ঘটনায় লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারী বয়সে বাসন্তীর পালিত মাঘমণ্ডলের অনুষ্ঠানেও লোকাচারের পরিচয় রয়েছে বালকদের খাদ্য বিতরণের বিবরণে। মায়ের মৃত্যুর পর অনন্ত যে পোশাকে সজ্জিত হয় এবং যে কৃত্য পালন করে, এতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমান্তরালে লোকাচারও উপস্থিত। হবিষ্য খাওয়া ও শ্রাদ্ধ করা এর দৃষ্টান্ত। বাসন্তী আলো চাল দিয়ে মালসায় জাউ রান্না করে। সে কলার খোল কেটে সাতটি ডিঙ্গা বানায়। এতে জাউ ও কলা সাজিয়ে তুলসীতলায় নিবেদন করা হয়। স্নান শেষে অনন্ত এগুলোতে জল দেয়। এরপর সে সেখান থেকে সরে গেলে কাকেরা এসে তা খায়। এসবই প্রচলিত লোকসংস্কারের অন্তর্গত। এর মূল ভিত্তি হলো মৃত ব্যক্তি কাকের রূপ ধরে এসে এসব খেয়ে যায়, এ ধরনের বিশ্বাস। তাই যেদিন কাক আসে না, সেদিন অনন্তকেই ডোঙা হাতে নিয়ে কাকদের ডাকতে হয়। এক মাস ধরে এ লোকাচার পালন করা হয়। এর আগে মৃত অনন্তের মার পারলৌকিক কল্যাণার্থেও শ্রাদ্ধ করা হয়। এতেও লৌকিক ধর্মাচারের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট হয়েছে–

> শ্রাদ্ধের দিন অনেক নারী দেখিতে আসিল। সেও আসিল। নাপিত আসিয়া অনন্তকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেল। অনন্ত কতকগুলি খড়ের উপর শুইত, সেই খড়গুলি, হাতের আধছেঁড়া নিত্যসঙ্গী কুশাসনখানা, কাঁধের ও কটিদেশের মাঠা-কাপড়ের চিলতা দুইখানা সেইনারীর কথামত নদীতীরে ঘাটের একটু দূরে কাদায় পুঁতিয়া স্নান করিয়া আসিল। পুরোহিত চাউলভরা পাঁচটি মালসাতে মন্ত্র পড়িয়া অনন্তর মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধান করিত। ... লম্বা একটা খোলে ভাতব্যঞ্জন সাজাইয়া সুবলার বউ বলিল, 'রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোন দিন খাইতে আইব না। ... খোলের এককোণে একটু পান সুপারি, একটু তামাক টিকাও দেওয়া হইল। ... অনন্ত ভাত ব্যঞ্জন ভর্তি খোলটা হাতে করিয়া নদীর পারের দিকে চলিল, সঙ্গে চলিল সেই স্ত্রীলোকটি। সে নির্দেশ দিল, 'না-জল না-শুক্‌না, এমুন জায়াগত রাইখ্যা পাছ ফিরা আইয়া পড়, আর পিছনের দিকে চাইস না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৪)

কিশোর ও তার হবু স্ত্রীর প্রণয় বাস্তবায়িত হয় পরিবার কর্তৃক বিয়ে প্রদানের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার মাধ্যমে। বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রীর মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্পন্ন হয়। মোড়লের আদেশে কিশোর তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রণাম জানালে তাকে একটি ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। 'সেখানে নতুন একটা শাড়ি পরিয়া, পানের রসে ঠোঁট রাঙা করিয়া, এবং গালে-

মুখে তেলের ছোপ লইয়া সেই মেয়েটা বারবার লাজে রাঙা হইয়া উঠিতেছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৪)। এরপর মোড়লের স্ত্রী কিশোরের হাতে ফুলের মালা দিয়ে সেটি তার স্ত্রীর গলায় পরানোর আহ্বান জানায়। মালা বদল শেষ হলে সে তাদের ঐ ঘরে রেখে বাইরে থেকে শিকল বদ্ধ করে। এসব লোকাচারের পরিণতিতে কিশোরকে জানানো হয়, 'শাস্ত্রমতে বিয়া কইর দেশে গিয়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৪)। পরদিন কিশোরের শাশুড়ি তাকে দেখতে আসে। এক্ষেত্রে প্রচলিত লোকসংস্কার হলো, দম্পতির মালা বদল হবার পর বিয়ের অনুষ্ঠান পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবার আগ পর্যন্ত তারা দেখা করলে অমঙ্গল হয়। একারণে কিশোরের সঙ্গে তার স্ত্রীর মালা বদল হবার পরদিন তার শাশুড়ি বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রীকে নিষেধ করেছিল তাদের দেখা করাতে।

৪. লোকসাহিত্য

তিতাসপাড়ের মালোদের লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভান্ডার এ উপন্যাসের আদ্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনেই শুধু নয়, পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের অংশ হিসেবেও লোকসাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা, মালোদের সংগ্রামশীল জীবনবাস্তবতা আর তাদের অনুসৃত লোকসংস্কৃতি– এ দুইয়ের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লোকপুরাণ, প্রবাদ, ধাঁধা, রূপকথা, ছড়া এবং লোকসংগীতের অজস্র উল্লেখ তাদের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও উপকরণ। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসমূহ নিম্নরূপ–

৪.১ লোকপুরাণ

এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে লোকপুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত। তিতাসপাড়ের গোকর্ণ গ্রামের সনাতন ধর্মাবলম্বী মালোদের প্রাত্যহিক জীবনে লোকপুরাণের প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য উপস্থিতি লক্ষণীয়। নিছক ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষালাভের উৎস হিসেবেই এর ভূমিকা মালোদের নিকট সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবিকা নির্বাহ, প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে ওঠাবসা-আলাপচারিতা, সংগীত-পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা, পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস ও সম্ভাষণ, প্রকৃতিনির্ভর দিনযাপনে অর্জিত অভিজ্ঞতা, নর-নারীর আন্তঃসম্পর্ক অর্থাৎ তাদের সামষ্টিক জীবনপ্রবাহে এর অবারিত ও নিরঙ্কুশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথাগত শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তে লোকসমাজের একান্ত নিজস্ব ধর্মবোধ ও উপলব্ধি লোকপুরাণে অকৃত্রিমভাবে ফুটে ওঠে। কেননা, লোকমানুষেরা নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যে দোলাচলে বিচরণ করে, এর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীদের একাত্ম করতে বরাবর সচেষ্ট। এ উপন্যাসের 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শুকদেবপুর গ্রামে বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ। বলিষ্ঠ, বয়স্ক ও সুদৃঢ় চেহারার মোড়লের পাশে তার তরুণী স্ত্রীকে দেখে কিশোর ভেবেছিল, সে যেন ছেলেবেলায় *রামায়ণ*, *মহাভারত*-এর গল্পে শোনা হনুমান, ভীম প্রমুখ বীরদের এতদিনে দেখছে। একপর্যায়ে তার ঘোমটাটানা স্ত্রীকে চকিতে দেখে কিশোরের মনে পড়ে ভৈরবকায় মহাদেবের পাশে উপবিষ্ট বালিকা-বধূ গৌরীর কথা। এভাবেই তার কল্পনায় শ্রুত লোকপুরাণ বাস্তবের পটভূমিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে অন্তর্লোকে সৃষ্টি করে বিশ্বাস ও সমীহবোধ। দরিদ্রের সংসারে এলোমেলো, দীনভাব লক্ষ করে এক পর্যায়ে সে অকপটে মোড়লকে জানায়–'তোমার দিকে

চাইয়া আমার শিবঠাকুরের কথা মনে পড়ে। তোমার অত নামডাক, কিন্তু বাড়িঘরের ছিরি নাই। ... আমার মনে পড়ে যে শিবের কথা সে-শিব বুড়া। সকলের দরবারে তার নামডাক। কিন্তু ঘরে তার দৈন্য দশা।' ... শিশুর মত বাধিত হইয়া মোড়ল বলিল, 'তুমি আমারে শিব ঠাকুর বানাইলা। না জাল্লা, তুমি আমারে বুড়া শিব বানাইলা, আমার গৌরী বড় ভাল, তারে আবার নাচাইও না। আর আমরা ত শিবমন্ত্রী না, আমরা কিষ্ণমন্ত্রী' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৩)। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে ভারতের বাড়িতে গ্রামের মোড়ল ও গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে গ্রামবাসী সমবেত হলে সেখানে জমিদারের খাজনা পরিশোধ নিয়ে দয়ালচাঁদের সঙ্গে বাদানুবাদ ঘটে কৃষ্ণচন্দ্র ও রামপ্রসাদের। দয়ালচাঁদকে কলহ থেকে বিরত রাখতে সেখানে উপস্থিত মাতবরদের একজন যে উদাহরণ দেয়, তাতে নিহিত রয়েছে *রামায়ণ*-এর অনুষঙ্গ—'দশের বৈঠকে লক্ষ্মণ-বর্জনের পালাখান তুমি কইর না বেপারী। ব্রজলীলার দিনে কুরুক্ষেত্তর ঘটাইয়া লাভ না।' ... 'কোন ত্রেতাযুগে কি কইরা রাখ্ছ অখন তারে ধুইয়া জল খাও' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫২)। এ পরিচ্ছেদেই শ্যামসুন্দর বেপারীর বিয়ের বর্ণনা অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। তার বালক মনস্তত্ত্বে এ অনুষ্ঠান পৌরাণিক ভাবাবহে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্যামসুন্দরের মতো বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে নিতান্তই এক বালিকার বিয়ে তার অন্তর্লোকে রূপকথায় বর্ণিত দৈত্য কর্তৃক রাজকন্যার বন্দি হবার কাহিনিকে মনে করিয়ে দেয়। পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিতে নাপিত কর্তৃক পঠিত হয়। 'গুরুবচন' তার কাছে শিব-গৌরীর বিয়ের বৃত্তান্তকেই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে বর্ষামুখর দিনের মেঘলা আকাশে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত রামধনু দেখে বনমালীর স্মৃতিচারণায় ভেসে ওঠে বোন উদয়তারার শৈশবস্মৃতি। বনমালীর চেতনালোকে রাম-সীতার পৌরাণিক প্রসঙ্গ জেগে ওঠে তার কথা ভেবে। কেননা, বহুদিন হয়ে গেছে, নাইয়রে সে বনমালীর কাছে আসেনি। বনমালী শ্রুত 'সীতার বনবাস' পালায় এর যে লৌকিক ভাষ্যরূপ বিবৃত, সেখানে দশমাথা কুড়ি হাতের রাক্ষস রাবণকেও রামের ধনু হাতে তুলে নিতে মুখে রক্ত ওঠাবার মতো কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত রাম সেটি হাতে তুলে নেয়। 'হরধনু না কি বলিয়াছিল— তাই রামের হাতের ধনু। কিন্তু সীতা সে ধনু রোজই বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডানহাতে তলাকার জায়গাটুকু লেপিয়া পুছিয়া শুদ্ধ করিয়া দিত। তারপর সীতার বিবাহ হইয়া গেল। রাম তাকে নিয়া অযোধ্যাতে আসিল। তারপর সীতা আর বাপের বাড়ি আসে না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৮)। লোকপুরাণাশ্রিত পালায় সীতার সঙ্গে উদয়তারার ভাবসাদৃশ্যে এভাবে বনমালীর চেতনালোকে বাস্তবের সমান্তরালে পৌরাণিক জগতের ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই সে উদয়তারাকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই তার ভাবনায় লোকপুরাণ বাস্তব আর কল্পনার যোগসাজসে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। এ পরিচ্ছেদেই উদয়তারার আচরণে অনন্ত যেন প্রত্যক্ষ করে লোকপুরাণের কোনো শক্তিময়ী দেবীকে, যার কথা সে মায়ের কাছে গল্পে শুনেছিল। উদয়তারা যখন প্রবল ঝড়কে প্রতিহত করতে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ে, অনন্ত তার উচ্চারিত সংলাপ শুনে সমীহ প্রকাশে বাধ্য হয়— 'দোহাই রামের দোহাই লক্ষ্মণের, দোহাই বাণ রাজার; দোহাই ত্রিশ কোটি দেবতার' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৫)। আবার, অনন্তকে আশ্রয় দিতে গিয়ে বাবা-মার কাছে অপমানিত বাসন্তী ক্ষিপ্ত হয়ে যে ভাষায় তাকে অভিশাপ দেয়, এতেও লোকপুরাণের অশুভ-অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে যম, ডাকিনী, যোগিনী ও কালীর প্রতি আহ্বান ঘোষিত। বাসন্তীর আশ্রয় হারিয়ে উদয়তারার কাছ থেকে অনন্ত মায়ের স্নেহ পেয়েছিল। সেই নারীর অন্তর্লোকে সঞ্চিত লৌকিক ধর্মভাবনা ও দেবদেবী-অবতারের প্রসঙ্গ অনন্তের সরল-অপরিণত মনে অব্যাখ্যেয়

নানা ভাবনার জন্ম দেয়। বিশ্বলোক, গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে লোকসমাজের বাসিন্দাদের বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকলেও তারা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ধারণা, লোককাহিনি, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তিতে উপজীব্য বৃত্তান্তের আলোকে এর নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। এর পেছনেও একধরনের যুক্তি কার্যকর। হয়তো তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য নয়, কিন্তু লোকসমাজের বাসিন্দাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য কল্পনা আর বাস্তব মিলিয়েই তারা নিজেদের মতো করে বিশেষ ধারণা তৈরি ও যুগযুগ ধরে তা লালন করে চলে। অনন্ত উদয়তারার কাছ থেকে শোনে, আকাশে যে তারাগুলো বিদ্যমান, সেগুলো তোলা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। স্বর্গে দেবতারা থাকে, তারাই আকাশে তারা ছিটিয়ে দিয়েছে– প্রচলিত এ লোকবিশ্বাস সম্পর্কে অনন্তের মনে সন্দেহ জাগলে সে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চায় উদয়তারার কাছে– 'স্বর্গে যে দেবতারা থাকে। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, শিবঠাকুর, তারাও কি তুলিতে পারে না! ... তারা ইচ্ছা করিলে তুলিতে পারে, কিন্তু তোলে না। তারাই ছিটাইয়া দিয়াছে, তারাই তুলিবে? রোজ রাতে ছিটাইয়া দিয়া তারা মানুষেরে ডাকিয়া বলিয়া দেয়, দিলাম ছিটাইয়া যদি কেউ পার তুলিয়া নাও। কিন্তু তুলিবার লোক নাই। এখন দেবতার পূজা হইবে কি দিয়া! শেষে তারা মাটিতে নকল ফুল ফুটাইয়া দিল। সে-ফুল রোজ ফুটে, লোকে রোজ তুলিয়া নিয়া পূজা করে। যে-সব ফুল তোলা হয় না, তারা ঝরিয়া পড়িয়া যায়। বাসি হইয়া থাকে না। বাসি ফুলে পূজা হইতে পারে না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৪)। উদয়তারা জানায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে দেবতাদের আহ্বান বোঝা সম্ভব নয়। শুধু সাধু-মহাজনরাই তা বুঝতে পারে। তারা পূজা-অর্চনা, তপস্যা-ধ্যানের মধ্য দিয়ে দেবতাদের সঙ্গে আলাপ করে। ধর্ম সম্পর্কে এ ধরনের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলেও রয়েছে বহুকাল ধরে প্রচলিত লোকপুরাণের প্রভাব। সেকারণে উদয়তারার আলাপে *মনসাপুরাণ*-এর বেহুলা লখিন্দরের বৃত্তান্ত গুরুত্ব পায়। তবে স্মর্তব্য, শাস্ত্রীয় পুরাণের ক্রমবিবর্তিত রূপটিই কালিক প্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে লোকসমাজে গৃহীত হয়। এতে লোকমানুষের চিন্তা-চেতনা, ভাবনা, বিশ্বাস ও কল্পনা সংযোজিত হয়, আবার বাহুল্য বিবেচনায় নানা প্রসঙ্গ ও ঘটনা কখনো পরিবর্জিত, কখনো পরিবর্তিত রূপে মূল পুরাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেকারণেই উদয়তারার বয়ানে এ কাহিনিতে বেহুলার নাম 'ভেলইয়া', লখিন্দর সম্বোধিত হয় 'লখাই পণ্ডিত'। অনুধাবন করা চলে, বহুযুগ ধরে লোকসমাজে এসব পুরাণ প্রচলিত হতে হতে সময়ের বিবর্তনে বিশেষ লৌকিক আবহ, মেজাজ ও ভঙ্গিকে আয়ত্ত করেছে। উদয়তারার কাছ থেকে অনন্ত শোনে মৃত লখাইকে প্রাণ বাজি নিয়ে স্বর্গে গিয়ে ভেলইয়ার দেবতাদের তুষ্ট করে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার দুঃসাহসী অভিযানের কথা। শুধু তাই নয়, স্বর্গে বেহুলার যাত্রার পাশাপাশি উদয়তারা অনন্তকে, হিমালয় পর্বত বা 'হিমাইল রাজা'র লোকপুরাণ শোনায়, যেখান থেকে হেঁটে যুধিষ্ঠির স্বর্গে তথা দেবতাদের আবাসস্থলে যায়। অনন্তের বালক মনেও কল্পনা জেগে ওঠে। সে বড়ো হয়ে হেঁটে হেঁটে তিতাসের তীর ধরে হিমাইল রাজার দেশ থেকে স্বর্গে যাবার ইচ্ছা পোষণ করে। সময়ের আবর্তনে পরিণত বয়সে বিদ্যার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে তার শহরে যাত্রার প্রচেষ্টায় যে পরিবর্তিত জীবনের প্রতি আসক্তি ও সচেতন আগ্রহ, তা বিবেচনায় রাখলে বলা চলে, সে-ও গ্রামীণ জীবন ছেড়ে শহুরে বাবু সংস্কৃতির ধারক-বাহক তথা মালোদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় দেবতাসুলভ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। ফলে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তার সামাজিক পরিচয় ও মানসিকতাগত দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ-যশোদার পৌরাণিক বৃত্তান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। উদয়তারার বাপের বাড়িতে এসে সে পরিচিত হয় জনৈক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে। সাধুর বয়ানে ফুটে ওঠে

বালগোপাল কৃষ্ণের নির্মল, স্নিগ্ধ অভিব্যক্তির সঙ্গে অনন্তের সাদৃশ্য কল্পনাযোগে পৌরাণিককালের যশোদাজননীর সঙ্গে অম্ল-মধুর সম্পর্কের মানবিক আখ্যান। আবার অনন্তের মায়ের সঙ্গে কিশোরের এবং অনন্তের সঙ্গে অনন্তবালার আন্তঃসম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়েও অবলম্বিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি। এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে *মনসামঙ্গল*-এর পুরাণ মালোদের প্রাত্যহিক জীবনে বিশিষ্ট পরিচয়ে উদ্ভাসিত। বলাবাহুল্য, শাস্ত্রীয় ধর্মাচার ও পূজার রীতি, পুরাণ পাঠের আদর্শের সঙ্গে মালোদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি-সংস্কার মিলেমিশে এতে সৃষ্টি হয়েছে স্বতন্ত্র লৌকিক পরিমণ্ডল। শ্রাবণ মাসে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষে বেহুলার প্রসঙ্গকে স্মরণে রেখে জালাবিয়ার আয়োজন করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সেই লোকপুরাণের আখ্যানকে গল্পের আকারে জনসমাজে পরিবেশনের বৃত্তান্ত। 'শ্রাবণের শেষদিন পর্যন্ত পদ্মাপুরাণ পড়া হয়, কিন্তু পুথি সমাপ্ত হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা বলিয়া শেষ দুটি পরিচ্ছেদ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা পড়া হয় মনসা পূজার পরের দিন সকালে, সেদিন মালোরা জাল বাহিতে যায় না। খুব করিয়া পদ্মাপুরাণ গায় আর বোল করতাল বাজায়। 'দুরঙা প্রজাপতি' পরিচ্ছেদে অনন্তের বিদ্যার্জনের যে বৃত্তান্ত রূপায়িত, এর সঙ্গে লোকপুরাণের সংযোগ রয়েছে। সে অল্প স্বল্প পড়তে জানলেও নিয়মিত বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ালেখার সুযোগ তার ছিল না। তার মুখে *রামায়ণ* পাঠ শুনে গ্রামের নাপিতানী তাকে উদ্বুদ্ধ করে কুমিল্লা শহরে গিয়ে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে শিক্ষিত হতে। মালোদের লোকসংগীতেও লোকপুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। তারা বংশপরম্পরায় এসব গানের চর্চা অব্যাহত রাখে। মোহন ও বাসন্তী মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে লোকসংগীতের দ্বারস্থ হয়েছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কথায় নর-নারীর সম্পর্কে বিদ্যমান আবেগানুভব, প্রেম-বিরহকাতরতা এসব গানের মধ্য দিয়ে লোকপুরাণের ভাবপরিমণ্ডলকেই মালোদের সমষ্টিচেতনায় ফিরিয়ে আনে। এর সঙ্গে যুক্ত লৌকিক দর্শনের সংযোগও মালোদের ভাবনায় বিশেষ আবেদন সঞ্চার করে—

> কানাইরে বেলা হইল দুই রে প'র। প্রাণটি কাঁপে রাধার থর থর রে, মথুরায় বিকি যায় রে বইয়া রে সুন্দর কানাইরে।' এই রাধা বৃন্দাবনের প্রেমাভিসারিকা রাধা নহে। এ রাধা জন্ম-মৃত্যু দুই তীরের পারাপারশীল মানব আত্মা। কংসনদী অর্থাৎ যমুনা নদী এখানে জন্মমৃত্যুর সীমারেখা। আত্মা তার খেলাঘর ছাড়িয়া উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে। ... কানাইবেশী ভূমাই তাহাকে পার করিয়া চালাইয়া নিবার মালিক, আত্মা নিষ্কলুষ হইলে কি হইবে, তার পার্থিব দধিভাণ্ডের প্রতি মায়া জাগে। কিন্তু নারায়ণ তাকে ঐহিক সবকিছুর কলঙ্ক-স্পর্শ থেকে নির্মুক্ত করিয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া লইকে চান, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে এই জন্যে তিনি দধিরভাণ্ড স্পর্শ করিয়া সব দধি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সকল মালো এই সব অর্থ না বুঝিলেও, গানের সুরে সুদূরের কি কথা যেন ভাসিয়া আসিয়া তাদের জীবনে এক জীবনাতীতের বাণী শুনাইয়া গেল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪৮)

৪.২ লোককথা ও রূপকথার অনুষঙ্গ

> মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া যা নাচে। নাচে ত না, যেন পরীর মত নিত্য করে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৮)

> ছেলেটা ঘরের এক কোণে মলাটের বাক্সে তার রূপকথার রাজা সাজাইতেছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪১)

> একটি নেংটি ইঁদুর বুঝি ধানক্ষেতের প্যাঁচ হইতে বাহির হইয়া রূপকথার দেশে দেশে এক নদীর পারে গিয়া দেখিল সামনে রূপার নদী। গলানো উপছানো রূপার নদী। সে তো নদী

নয়, হাজার বছরের না-শোনা গল্প দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪২)

অনন্ত উহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এরা বুঝি রূপকথার দেশের। এদের মনে মনে অনেক গল্প জমা আছে, বলিলে কোনোদিন ফুরাইবে না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৭)

রামপ্রসাদ ... নদীর দিকে চলিল। তার চোখে আজ রোদের সোনা মিশিয়া চারদিক সোনাময় হইয়া গিয়াছে। আজ এরা যেন সব সোনার শিশু। সোনার খেলনা হাঁড়িকুড়ি লইয়া রূপার বালিতে ভাত চাপাইয়া চাঁদ সুরুজের দেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫৯)

সেই ঈশ্বর মালো আর ইচ্ছারাম মালো নামে রূপকথার মানুষ দুইটা। পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিয়া, খালবিল ডিঙ্গাইয়া, কত দেশদেশান্তরের বুক চিরিয়া তারা যেন এক বোঝাই গল্প লইয়া আসিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৭)

সামনে যে টোপর মাথায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে, সে বিরাট এক দৈত্য। ছোট মেয়েটাকে তার দলের লোকেরা ধরিয়া আনিয়া তার গুহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েটা চাহিয়া দেখে চারিদিকে লোকজন, পালাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না। তার চেয়ে এই ভাল। আপাতত দৈত্যকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তার মাথায় ফুল ছড়াইয়া তাকে তুষ্ট রাখা চলুক। তার লোকজন অন্যমনস্ক হইলে যেই একটু ফাঁক পাওয়া যাইবে অমনি মেয়েটি এখান হইতে পলাইয়া যাইবে। কোথায় যাইবে? যেখানে তার জন্য খেলার সাথীরা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। পালাইয়া অনন্তদের বাড়িতে গিয়া উঠিলে মন্দ হয় না। মা তাকে কিছুদিন লুকাইয়া রাখিবে। দৈত্যটা তাকে পাড়াময় বৃথাই খুঁজিয়া মারিবে। পাইবে না। অবশেষে একদিন তিতাসের জলে ডুবিয়া মরিবে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৪)

এ উপন্যাসে মালোসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথা ও লোককথার অনুষঙ্গের উল্লেখ লক্ষণীয়। কখনো কখনো লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের বর্ণনায় এসব প্রসঙ্গ এলেও প্রধানত বালক অনন্তের শিশুসুলভ কল্পনা ও বিস্ময় পারিপার্শ্বিক জীবন-জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার আদলে রূপকথার সঙ্গে সাদৃশ্যধর্মী বিবেচিত হয়েছে এসব দৃষ্টান্তে। শ্যামসুন্দর ব্যাপারীর বিয়ের দৃশ্য বর্ণনায় রূপকথায় শ্রুত দৈত্য ও বন্দি রাজকন্যার কাহিনির ভাবসাদৃশ্য কল্পনা এর প্রমাণ। সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে বালক রমুর মনোলোকে গল্পকথার বিচিত্র ভুবনের প্রতি অনন্তের বিস্ময়সূচক ভাবনা নৌকা গড়ানোর কাজে আগত দুজন মালোর উপস্থিতিসূত্রে ভাষ্যরূপ পেয়েছে।

৪.৩ প্রবাদ

আ-ঘাটাতে ঘাট হয়, আ-পথে পথ হয়, আ-কুটুমে কুটুম হয়। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪২)

জোয়ারে বাড়ে ভাটায় কমে, জলের আবার একটা বিশ্বাস। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫৭)

গরিবের হাতে টাকা পড়িলে উড়িবার জন্য ছটফট করে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯)

মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ায় আর গরুর কুটুম লেহনে-পুছনে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭০)

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৩)

তেলে জলে ... মিশে না (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৫)

লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৭)

কাজের ভাসসি নাই, খাওনের গোঁসাই। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৪)

মানুষে কয়, মা নাই যার, ছার কপাল তার। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৬)

তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী, ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৬)

৪.৪ ধাঁধা

পান খাও রসিক জমাই কথা কও ঠারে, পানের জন্ম অইল কোন অবতারে। যদি না কইতে পারে পানের জন্ম কথা, ছাগল হইয়া খাও শ্যাওড়াগাছের পাতা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৬)

সু-ফুল ছিট্যা রইছে তুলবার লোক নাই: সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৪)

হিজল গাছে বিজল ধরে, সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৮)

পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৮)

আদা চাচচাক দুধের বর্ণ, এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৯)

৪.৫ ছড়া

বুড়ি ছড়া কাটে– 'কাউয়ার দাদা মরল, কুলা দিয়া ঢাকল, দূর হ কাউয়া দূর!' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৭)

জিভে কামড় শিরে হাত কেমনে আইল জগন্নাথ? (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)

আমার দিদি কাটুনি সুতা কাটতে পারে। একনাল সূতায় হস্তী বান্ধা পড়ে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

কি গ বিন্দাবনের নারী, কোন কালোচোরা লড়দা গেছে মাইরা বাঁশের বাড়ি। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭০)

রামের হাতের ধেনু, লক্ষ্মণের হাতের ছিলা, যেইখানের ধনু সেইখানে গিয়া মিলা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৮)

আয়, লাভে রে লাভে রে লাভে রে লাভে, আরে লাভে! আয়, দুয়ে রে দুয়ে রে দুয়ে, আরে দুয়ে! আয়, তিনে রে তিনে রে তিনে, আরে তিনে– (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯০)

অনন্তবালা, সোনার মালা, যখনই পরি তখনি ভালা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৮)

দম্ব দম্ব তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পূবে যাই। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২০)

অনন্তবালা ঘরের পালা, তারে নিয়া বিষম জ্বালা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৪)

জিলাপির পেঁচে পেঁচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠাণ্ডা লাগে জল ছাড়া। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৬)

যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৬)

৪.৬ লোকসংগীত

এ উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের[৩] উল্লেখ থেকে মালোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বকীয়তা অনুধাবন করা যায়। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের আলাপে, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, এমনকি উৎসবেও লোকসংগীতের জোরালো উপস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু

মালোদের সাংস্কৃতিক বলয়ভুক্ত সংগীতই নয়, পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশী মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত জারি-সারি গানের উল্লেখও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের মধ্যে রয়েছে দেশাত্মবোধক গান, কবিগান, জারি ও সারি গান, ব্রতের গান, ভাটিয়ালি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সংগীত, মুর্শিদি-বাউল গান, বারোমাসি গান, পুথির গান, নৌকাবাইচের গান প্রভৃতি। এসব গানে মালোদের গোষ্ঠীচেতনা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'দুরঙা প্রজাপতি' পরিচ্ছেদে, যেখানে শহুরে জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রা তথা বহিরাগত সংস্কৃতির আধিপত্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিলীন হবার নির্মম বাস্তবতা দিনদিন প্রকটিত হয়। বিশেষত বাসন্তী এবং মোহন এসব ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনের মাধ্যমে নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মরিয়া ছিল। তাই তারা এসব সংগীতকে আঁকড়ে ধরে যাত্রাকে প্রতিহত করতে উদ্যোগী হয়েছিল, যদিও তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কেননা, সস্তা-লঘু বিনোদনের পাশাপাশি চোখ ঝলসানো আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ও বাদ্যযন্ত্রের প্রলুব্ধকর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মালোপাড়ার অধিকাংশ নরনারী নিজেদের সংস্কৃতি তথা লোকসংগীতের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। মূলত এ ঘটনার পরিণতিতে তাদের সাংস্কৃতিক পরাভব প্রবল হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে বিধৃত কিছু উল্লেখযোগ্য লোকসংগীতের দৃষ্টান্ত–

৪.৬.১ ব্রতের গান

'নারীরা গীত গাহিতেছে; 'সখী ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো, কই কাঁলাচাঁদ আইলো।' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)

৪.৬.২ ভাটিয়ালি গান

উত্তরের জমিনেরে সোনা-বন্ধু হাল চষে,
লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে ধুয়া।
দক্ষিণা মলয়ার বায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়
কার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া। ...
নদীর কিনার দিয়া গেল বাঁশি বাজাইয়া,
পরার পিরীতি মধু লাগে।
কু-খেনে বাড়াইলাম পা' খেয়াঘাটে নাইরে না,
খেয়ানীরে খাইল লঙ্কার বাঘে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৮)

৪.৬.৩ নৌকাবাইচের গান

অকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুনুর করে নাও, জিত্যা আইলাম রে নাওয়ের গলুই পাইলাম না। ...

তারে ডাক দে, দলানের বাইর হইয়া গেল, অ দিদি, প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে।।

আমার বন্ধু খাইবে ভাত, কিন্যা আনলাম ঝাগুর মাছ গো, অ দিদি, দুধের লাগি পাঠাইয়াছি, পয়সা কি সুকি কি টেকা গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে।।

আমার বন্ধু ঢাকা যায়, গাঙ্ পারে রান্ধিয়া খায় গো, অ দিদি, জোয়ারে ভাসাইয়া নিল হাঁড়ি, কি ঘটি, কি বাটি গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে।। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩৪)

৪.৬.৪ বারমাসি গান

হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্তে বুনে বীজ। আন গো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ। বিষ খাইয়া মইরা যামু কানবে বাম মায়। আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই। ...

আসিল আষাঢ় মাস হায় হায়রে, এহিত আষাঢ় মাসে গাঙে নয়া পানি। যেহ সাধু পাছে গেছে সেহ আইল আগে। হাম নারীর সাধু খাইছে লঙ্কার বাঘে। ...

হায় হায়রে, এহিত পৌষ না মাসে পুষ্প অন্ধকারী। এমন সাধের যৈবন রাখিতে না পারি। কে চায় রে আড়ে আড়ে কেহ চায় রে রইয়া। কতকাল রাখিব যৈবন লোকের বৈরী হইয়া। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২১)

৪.৬.৫ বাউল গান

এলাহি দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নায় ডুবল ভেলা।
জলের আসন বসন দেইখ্যা সারাসারি,
বালুচরে নাও ঠেকাইয়া পলাইল বেপারী। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)

৪.৬.৬ পুথি পাঠ

হাম্মক রাজার দেশেরে–
উত্তরিল শেষে রে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)

৪.৬.৭ কেচ্ছার গান

আর দিন উঠেরে চন্দ্র পূবে আর পশ্চিমে।
আজোকা উঠ্‌ছেরে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)

৪.৬.৮ যাত্রাগান

চুপ চুপ চুপ লাজে সরে যারে, ধীরে ধীরে চল, সজনী লো। ধূলা দিয়ে সখী আমাদের চোখে গোপনে প্রণয় রেখেছে ঢেকে, এবার ভোমর যাবে লো ছুটে, চল, না যেতে যামিনী লো (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪৯)

৫. লোকপ্রথা

সামাজিক বিভিন্ন রীতিনীতি-প্রথা ও মূল্যবোধ মান্য করার শর্ত লোকমানুষের আন্তঃসম্পর্কে ক্রিয়াশীল। এ উপন্যাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। নাইয়র প্রথা, অপরিচিত কারো সঙ্গে সখিত্ব ও বন্ধুত্ব পাতানো, এমনকি গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের পালিত অনুশাসন ও সামাজিক বিধান এর অন্তর্গত। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নাইয়র প্রথার উল্লেখ লক্ষণীয়। এটি 'বিয়ে'-কেন্দ্রিক লোকপ্রথার দৃষ্টান্ত, যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ই পালন করে। বিয়ের পর বিবাহিত নারীরা যখন নৌকায় চড়ে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায়, তখন নৌকার ছইয়ে

থাকে কাপড়ের বেড়া। যেন পরপুরুষেরা তাকে দেখতে না পারে, সেকারণেই এ রীতি প্রচলিত। তাকে মাথায় ঘোমটা টেনে অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়ালে নিজেকে রাখতে হয়। সঙ্গে স্বামী থাকায় তার নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতাবশত স্বাধীনভাবে বেড়ানোর আনন্দ থেকে সে অনেকটাই বঞ্চিত হয়। 'তারা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আর বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায় অনেক হাসি-কান্নার ঢেউ বুকে লইয়া। যে বউ স্বামীর বাড়ি যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০৩)। তাছাড়া নিজের বাপ মা ভাই বোনকে ছেড়ে আসার বেদনায় তার মন বেদনায় ভারাতুর থাকে। কেননা, শ্বশুরবাড়িতে স্বামী, দেবর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি ও অন্য স্বজনদের মন বুঝে তাকে চলতে হয়, বিয়ের পর ধীরে ধীরে সেই অপরিচিত সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। আবার শ্বশুরবাড়ি থেকে গৃহবধূ যখন বাপের বাড়িতে যায়, তখন তার নৌকায় বেড়া থাকে না। এমনকি মাথায় ঘোমটা টানার প্রয়োজনও ফুরায়। স্বামীর বাড়ির ঘাট দৃষ্টির আড়ালে গেলে তবেই সে স্বাধীনভাবে নৌকায় চড়ে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করে। সে মনের আনন্দে যাত্রাপথের দৃশ্যরাজি উপভোগ করতে করতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। বিয়ের পরিণতিতে নিজের বাড়ি ছেড়ে আসার যে বেদনা, এর অনেকটাই ঘুচে যায় নাইওরে বাপের বাড়ি এলে। আবার পথে যেতে যেতে অচেনা কোনো নারীকে দেখে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বা সখী সম্পর্ক পাতানোর রীতিও লোকসমাজে প্রচলিত। বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ও পেশায় কৃষক কাদির মিয়ার একমাত্র মেয়ে জমিলা নাইওরে স্বামীর বাড়ি আসার সময় হঠাৎ করেই আমিনপুর গ্রামের বনমালীর বোন উদয়তারাকে দেখে তার সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্ক পাতানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। 'বড় ভাল লাগিয়াছে তার মানুষটাকে। প্রথম দৃষ্টিতে সে তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সেও কি তেমনি ভালবাসে নাই? কেমন অনুরাগের ভরে চাহিয়াছিল। ... আবার যখন বাপের বাড়ি যাইব, বাপকে বলিয়া রাখিব, এই রকম ওই মেয়েটি দেখিতে ঠিক আমার মত; তার বাপকে বলিয়া দেখিও, আমার মেয়ে তোমার মেয়ের সঙ্গে সই পাতিতে চায়, তুমি রাজি আছ কিনা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০৪)। 'দুরঙা প্রজাপতি' পরিচ্ছেদে উদয়তারা বনমালী ও অনন্ত জমিলাদের বাড়িতে আসে। তখন জমিলা উদয়তারাকে এ বৃত্তান্ত জানায়। একথা শুনে 'উদয়তারা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার জমিলা নামটা খুব ভাল লাগিল। কিন্তু সে সংসারের সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ দেখিয়া বেদনা বোধ করিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪১)। প্রকৃতপক্ষে, কিছুটা অপরিণতমনস্ক হলেও জমিলার এ আকুতি অসাম্প্রদায়িক ও উদারভাবাপন্ন মানবধর্মের অন্তরঙ্গ আহ্বানকেই ধ্বনিত করে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে। শুকদেবপুর গ্রামে আসার পর জনৈক ব্যক্তি কিশোরের সঙ্গে কুটুম্বিতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে ইতোমধ্যেই তার সম্ভাব্য স্ত্রী এবং পরবর্তীকালে সন্তানের জননী তথা অনন্তের মার প্রেমে বিমুগ্ধ ছিল। তাই জনৈক ব্যক্তির প্রস্তাবকে সে সেই নারীর প্রেমাকুতি সম্পৃক্ত ভেবে এ প্রস্তাবে প্রথমে সাড়া দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন তার ভুল ভাঙে, সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি তার বন্ধু সুবলের সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে নতুন সাজপোশাক পরিয়ে কাপড় গামছা বদল করে 'বন্ধুস্তি'-র আহ্বান জানায়। পরিবারে প্রচলিত প্রথা, রীতির দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। কালোবরণের পরিবার গোকর্ণঘাট গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার। আর্থিক সঙ্গতিগুণে কালোবরণ ও তার ভাইয়েরা সকলের কাছে সমীহের পাত্র হিসেবে বিবেচিত। কালোবরণের বিধবা মা সংসারের কর্ত্রী। সংসারের যে কোনো ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য তার তিন ছেলে ও তাদের স্ত্রীদের নেই। দাপুটে, ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে তার মুখের কথাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিবারে প্রচলিত। ছেলেরা ভোরে মাছ

ধরতে বেরিয়ে গেলে তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে সঙ্গে দেওয়ার জন্য তাদের স্ত্রীদেরও ঘুম থেকে উঠতে হয়। এরপর গ্রামের অন্য সব নারীর আগে নদীতে গিয়ে তাদের স্নান করে আসতে হয়। তাদের পক্ষে কালোবরণের মায়ের এ নির্দেশ অমান্য করার সুযোগ নেই। সামাজিক প্রথার অংশ হিসেবে মালোদের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান বিয়ে সম্পর্কে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মালোদের বিয়েতে যৌতুক প্রথা শুধু প্রচলিতই নয়, এর অনুসরণ রীতিমতো বাধ্যতামূলক ব্যাপার। এক্ষেত্রে কনেপক্ষকে বরপক্ষের যৌতুক দিতে হয়। বনমালী তার তিন বোন নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমানতারার বিয়েতে তিনশত টাকা করে যৌতুক নিয়েছিল বরপক্ষের কাছ থেকে। কিন্তু নিজের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তার মাথায় শোলার মুকুট ওঠেনি। এজন্য উদয়তারার অনুতাপের অন্ত ছিল না। আবার, বিয়ের পর নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এলে গ্রামের প্রতিবেশী সম্পর্কিত নারীদের জন্য পান-বাতাসা, পানের মসলা প্রভৃতি নিয়ে আসার প্রথা মালোসমাজে প্রচলিত। নতুবা তাকে নানাভাবে নিন্দা করা হয়। এ প্রথার নাম 'জামাইঠকানো'। জনৈক জামাই কোনো উপহার না নিয়েই শ্বশুরবাড়ি আসায় গ্রামের নারীরা তাকে নিন্দাপূর্বক গান পরিবেশন করে, 'জামাই খাইতে জানে, নিতে জানে, দিতে জানে না, তারে তোমরা ভদ্র বইলো না। জামাই যদি ভদ্র হইত, বাতাসার হাঁড়ি আগে দিত' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১১–৫১২)। মালো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং সামাজিক রীতি-নীতি, বিধিনিষেধ-অনুশাসনের দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসের 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে। বিশেষত অনন্তের মা ছেলেকে নিয়ে তার স্বামীর গ্রাম গোকর্ণঘাটে বসবাসের জন্য মনস্থির করলে কার পরিবারভুক্ত হয়ে সে থাকবে, এ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্রামের মাতবররা সভায় বসে। পাশাপাশি নিজেদের বৈষয়িক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গও এ বৈঠকে উত্থাপিত হয়, যা থেকে বোঝা যায় তাদের সামাজিক কাঠামো ও বিধিব্যবস্থার স্বরূপ। 'দশের বিচার' নামে অভিহিত বৈঠকের ঘোষণা নগরে-বাজারে আগেই প্রচারিত হয়, গ্রামবাসীর উপস্থিতির জন্য। এতদিন গ্রামের মাতবরেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায়, এমনকি কারো কারো গ্রামে অনুপস্থিতিহেতু এ বৈঠক মুলতবি ছিল। অবশেষে সকলে গ্রামে আসায় এটি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার আগে দুটি ছেলে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নিমন্ত্রণের বার্তা জানিয়ে দেয়, 'ঠাকুর সকল, ঘরে নি আছ, আসার একখান কথা। ভারতের বাড়িতে আজ দশজনের সভা। তোমরার নিমন্ত্রণ। পান তামুক খাইবা, দশজনের দশ কথা শুনবা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫০)। ভারতের বাড়ির উঠানে পাল খাটানো হয়। সেখানে ভালো আসনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং চারপাশে গ্রামবাসীর বসার ব্যবস্থা করা হয়। রান্না ও ধান সিদ্ধ করার জন্য উঠানের বেড়া দেওয়া অংশে নারীরা বসে। গোকর্ণঘাট গ্রামের বড়ো মাতবর রামপ্রসাদ যে কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। তার পরেই রয়েছে রামদয়াল, নিতাইকিশোর ও কৃষ্ণচন্দ্র। এদের 'কেউ টাকার জোরে, কেউ গায়ের জোরে, ভাইয়ের জোরে, কেউ বুদ্ধির জোরে' মাতবর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সভায় উপস্থিত সকলের জন্য পান, তামাক ও হুকার বন্দোবস্ত ছিল। বৈঠকে জমিদারের বকেয়া খাজনা শোধ করা, ভারতের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া, তামসীর বাপের বাজারের কায়েতদের সঙ্গে অতিমাত্রায় যোগাযোগ ও সমাদর করা এবং অনন্তের মার গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সমষ্টিমানুষের কল্যাণ ও বৈষয়িক প্রয়োজনে, নিত্যদিনের নানা সমস্যা মেটাতে দশের বিচারে সলাপরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এভাবেই মালো সমাজের সংঘবদ্ধতা অটুট থাকে। কিন্তু একপর্যায়ে যখন সামাজিক রীতিকে তুচ্ছ করে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের প্রতি তারা আগ্রহী হয়, তখন গোষ্ঠীগত যূথবদ্ধতায় ভাঙন ধরে এবং তা বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয় তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার

অবসানে। লোন কোম্পানির নিকট থেকে গৃহীত অর্থ পরিশোধের অসামর্থ্য এবং তিতাস নদীর শুকিয়ে যাবার পাশাপাশি বহিরাগত স্থূলরুচির সংস্কৃতির প্রভাবে তারা যখন স্বীয় লোকঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারকে সম্প্রসারণে ব্যর্থ হয়। বিশেষত নাগরিক সমাজের স্থূলরুচির চিত্তবিনোদন তথা যাত্রার চটুল, অশ্লীল, রঙ্গ-ব্যঙ্গসর্বস্ব তামাসার প্রাবল্যে মালোদের নিজস্বতার পরিচয়বহ সংস্কৃতি ও স্বকীয় জীবনধারায় ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে–

> মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। ... মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। ... আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ... যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪৫)

৬. লোকপ্রযুক্তি

এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে নিত্যদিনের কাজে প্রচলিত লোকপ্রযুক্তিগত বিভিন্ন কৌশলের পরিচয় রয়েছে, যা প্রয়োগ করে কাজে সফল হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই রয়েছে বাঁশ দিয়ে তৈরি সাঁকোর প্রসঙ্গ। বর্ষার প্লাবনে নদীসংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হলে সেখানকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ফলে নদীতীরবর্তী লোকসমাজে সাঁকোই তখন হয়ে ওঠে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের অবলম্বন। লক্ষণীয়, এটি বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকপ্রযুক্তি, যার উল্লেখ *চর্যাপদে*-ও রয়েছে। তেমনিভাবে মালো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে মাছচাষ সংক্রান্ত কৌশলাদি। নয়ানপুরের বোধাই মালো বড়ো দিঘি ইজারা নিয়ে মাছের পোনা চাষ করে। মাছের খাবার দেওয়া, যত্ন নেওয়া, সেগুলো বড়ো হলে বিক্রির বন্দোবস্ত তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অংশ। তবে এক্ষেত্রে অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় শুকদেবপুরের মোড়লের কর্মকাণ্ডে। তার মালিকানাধীন চারটি বড়ো বিল বর্ষাকালে পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। নদীর সঙ্গে সংযুক্ত বিধায় তখন অজস্র মাছ বিলে ভেসে আসে। পানি কমে গেলে বিলগুলিতে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা হয়। বিপুল পরিমাণ মাছ ধরতে শুধু শুকদেবপুরের মালোরাই নয়, বরং বহুদূরের গোকর্ণঘাট এবং অন্যান্য গ্রামের মানুষেরাও দীর্ঘ ছয় মাসের জন্য প্রবাসে যায়। লক্ষণীয়, এ কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি অংশগ্রহণ করে। কেননা, মাছ কাটা ও সংরক্ষণের কাজে তারাই বেশি পটু। সেকারণে তাদের সাময়িক বাসস্থানের জন্য মোড়ল চালাঘর স্থাপন করে। প্রবাসীরা সেখানে সমবেত হয়ে এ কাজে অংশ নেয়–

> কারোর সঙ্গে কারোর কোনকালে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। এখানে আসিয়া সকলে এক সংসারের লোক হইয়া গিয়াছে। এক সঙ্গে খায়, থাকে, কাজ করে। ... মেয়েরা বঁটি মেলিয়া কাতারে কাতারে বসিয়া যায়। পুরুষেরা মাছের ঝুড়ি ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাহাদের পাশে স্তূপ করিতে থাকে। ... এতবড় মাছটাকে পলকে ঘুরাইয়া পেটে পিঠে গলায় তিন পোচ দিয়া ঘাড়ের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া মারে, সে মাছ যথাস্থানে জড়ো হয়। আরেক দল পুরুষ সেখান হইতে নিয়া ডাঙ্গিতে তোলে শুকাইবার জন্য। দিনের পর দিন এইভাবে তিন মাস কাজ চলে। ছয় মাসের প্রবাস সারিয়া তারা যার যার দেশে পাড়ি জমায়। ইহাকে বলে 'খলা-বাওয়া।' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৯)

কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ দুর্দিনে আর্থিক সাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে শুকদেবপুরে প্রবাসে গিয়েছিল। ধৃত মাছ শুকিয়ে শুটকি বানানোর প্রক্রিয়া লোকসমাজে প্রচলিত। মাছ রোদে

শুকাতে দেওয়া হলে কাক চেষ্টা করে সেটি আত্মসাৎ করতে। সেকারণে কালোর মা মাছ পাহারা দিতে চৌকি পেতে কঞ্চি নিয়ে বসে। সে কাকের কয়েকটা ছেঁড়াপালক দড়িতে বেঁধে কঞ্চির আগাতে ঝোলায়। এর ফলে কাক ভয় পেয়ে মাছ চুরি থেকে দূরে থাকে। মাছ ধরার জন্য সুতায় তৈরি জাল বানানোর প্রক্রিয়াতেও রয়েছে লোকপ্রযুক্তি। লক্ষণীয়, কিশোর ও সুবল স্কুলে পাঠগ্রহণে অমনোযোগী বলে পরিবার থেকে তাদের ওপর সুতা পাকানো ও জাল বোনার নির্দেশ আসে। তারা তিতাসের প্রশস্ত তীরে এক দৌড়ের লম্বা পথে সুতা মেলে। এরপর বাঁশের চরকিতে কাঠি লাগিয়ে দুজনে প্রবল শক্তিতে সেসব সুতা পাকাত। আবার জাল বোনার জন্য পায়ের বুড়া আঙুলে ঠেকিয়ে দুজনেই দ্রুতগতিতে তকলি চালায়। এর ফলে জালে অনেক গিঁট পড়লেও কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে যায়। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে গোকর্ণঘাট গ্রামে আগত অনন্তের মার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হয়ে ওঠে সুতা দিয়ে মাছের জাল বোনার কাজ। তার বাবা জেলে হলেও অনন্তের মা এর আগে এ কাজ করেনি। ফলে কালোর মায়ের জাল বোনার জন্য ধারে প্রাপ্ত দশ সের সুতা নিয়ে সে দুশ্চিন্তায় পড়লে বাসন্তী তাকে প্রয়োজনীয় কৌশল শিখিয়ে দেয়। "দুপুরের পর সুবলার বউ কতকগুলি সুতা কাটার হাতিয়ার লইয়া হাজির হইল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া বলিল, 'এই নেও বড় টাকু, মোটা সুতার লাগি; এই নেও ছোট টাকু, চিকন সুতার। আর এই একখান পিঁড়ি দিলাম, ঘাটে গিয়া শণের লাছি এর উপরে আছড়াইয়া ধুইয়া আনবা। তারিপর রইদে শুখাইবা' " (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)। অনন্তের মা তার নির্দেশ মেনে সাত দিনে চৌদ্দ গোছা সুতা তৈরি করে। এর সাতটি মোটা, অন্যগুলো চিকন সুতার। মোটা সুতা এক টাকা এবং সরু সুতা দুই টাকা সের দরে সে এসব বিক্রি করে কারবারীর কাছে। এর আরও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে 'রামধনু' পরিচ্ছেদে। মালো নারীরা বাড়ির উঠানে সুতা পাকায়। চোঙ্গার মতো মুখাকৃতির একটি খুঁটি স্থায়ীভাবে মাটিতে পোঁতা থাকে। এর ওপর সুতা ভর্তি চাকতি বসানো হয়। টেকোয় সুতা বেঁধে উঠানের এক কিনারা থেকে অন্য কিনারা পর্যন্ত পোঁতকে তারা বেড় দিয়ে আনে। 'তারপর ডান হাঁটুর কাপড় একটু গুটাইয়া লইয়া, নগ্ন ঊরু তুলিয়া তুলিয়া হাতের তেলোয় ঘষা মারিয়া ঊরুতে টেকো ঘুরায়। একবারের ঘুরানিতে টেকো হাজার বার ঘুরে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০১)। দশবার টেকো ঘুরলে এক বেড়ের সুতা তৈরি হয়ে যায়। এর পর ডান হাতের তালুতে টেকোর ডাঁট বা হাতল ঘুরানো হয়। বাঁহাত রাখা হয় টেকোর ঘাড়ে। সেই নারী সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললে পাকানো সুতা টেকোতে গুটানোর কাজও শেষ হয়ে যায়। যদিও এসব নিতান্তই পুরুষালি কাজ, কিন্তু মালো পরিবারে নারীপুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ এ কাজ করে। কারণ জেলেরা নদীতে মাছ ধরা, ভাড়ায় নৌকা বাওয়া ও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। লোকপ্রযুক্তির এ ধরনের দৃষ্টান্ত মালোদের প্রাত্যহিক জীবিকা নির্বাহের বিশেষ সহায়ক অবলম্বন। এ উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'রাঙা নাও'-এ নৌকাবাইচের নৌকা বানানোর বিভিন্ন পর্যায়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রতীয়মান, লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীণ লোকসমাজে বহুলব্যবহৃত লোকযান নৌকা সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ কাদিরের ছেলে ছাদির নৌকাবাইচের জন্য দেড়শ হাত লম্বা লিকলিকে পাতাম নৌকা বানানোর আয়োজন করে। অনেকটা ভেলার মতো দেখতে, ওপরে ছইটানা কাঠের বিশাল টুকরা বা 'চালি'তে চড়ে দুপাশ থেকে মোটা লগি তিতাসের স্রোতে ঠেলে গাছের গুঁড়ি ভাসিয়ে আনে দুজন মালো। সেটি কেটেই নৌকা তৈরি হয়। পরদিন চারজন করাতি এসে তিতাসের পাড়ে একস্থানে 'আড়া' বেঁধে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িটিকে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে করাত দিয়ে সেটিকে চিরে টুকরো টুকরো করে দুইদিনে।

এরপর তিতাসের পারে স্থায়ী চালাঘর তুলে চারজন ছুতারমিস্ত্রি বাক্সভতি সরঞ্জাম নিয়ে কয়েক দিনে নৌকার কাঠামো গড়ে তোলে। এসব কর্মকাণ্ড ছাদিরের বালকপুত্র রমুকে যেন ব্যাখ্যাতীত এক জগতে আহ্বান জানায়। তাই সে অধিকাংশ সময় নৌকা গড়ার কাজ দেখায় মনোনিবেশ করে–

> আগাপাছার 'ছেউ' ঠিক করিয়া যেদিন তাহারা নাও 'টাঙ্গিল', সেদিন রমুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নৌকার মেরুদণ্ড মাত্র পত্তন করা হইয়াছে। সেই মেরুদণ্ডের ডগা আড় হইয়া আকাশ ঠেলিয়া কতখানি যে উপরে উঠিয়াছে, রমুর ক্ষুদ্র দৃষ্টি তার কি পরিমাপ করিবে। কিন্তু মিস্ত্রী দুইজন অত উঁচুতে গিয়া বসিয়াও কেমন হাতুড়ি পিটাইতেছে, আর পেরেক ঠুকিতেছে।
>
> মাপজোখ লইয়া এই মেরুদণ্ড ঠিক করিতে কয়েকদিন লাগিল। তারপর পুরাদমে শুরু হইল কাজ। এক একটা তক্তায় কাদা মাখাইয়া আগুনে পোড়াইয়া টান দিয়া মোড়ন দিয়া বাঁকাইয়া, খাঁক কাটিয়া, জোড়া দেয়, একদিকে সামান্য একটু বসিলে, আরেকদিক ঘুরাইয়া খাঁজের উপর বসাইয়া হাতুড়ি দিয়া পিটিতে থাকে ... দেখিতে দেখিতে নৌকার অস্থিমাংস জোড়া লাগিতে লাগিল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৮)

নৌকা তৈরি হবার পর সেটি কাত করে তলার অংশ পালিশ করে ছুতারমিস্ত্রিরা কাজের যবনিকা টানে। এরপর বহুদিনের পরিশ্রমের ফসল তথা নৌকাটিকে ঘিরে তাদের মন আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরে ওঠে–

> এমন একখান চিজ তারা গড়িয়া দিল যে চিজ অনেক–অনেকদিন পর্যন্ত জলের উপর ভাসিবে– কত লোক তাতে চড়িবে, বসিবে, নদী পার হইবে–এক দেশ হইতে আরেক দেশে যাইবে–কত জায়গায় দৌড়াইবে, বখশিস পাইবে–আর একজনার হাতের স্বাক্ষর সগর্বে বহন করিতে থাকিবে। কেউ জানিবে না, কারা গড়িয়াছিল, কাদের বিন্দু বিন্দু শ্রম ও বুদ্ধির সঞ্চয় সম্বল করিয়া ধীরে ধীরে সে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নাও? সে কি ভুলিয়া যাইবে এই চারজনকে? কিছুতেই না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩২)

সেকারণেই তারা আত্মগর্বে বলীয়ান হয়ে লোকজন জড়ো করে নাচসহ গান গায় হাততালি বাজিয়ে 'শুনরে নগইরা লোক, নাও গড়াইতে কত সুখ' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩২)। এরপর তিনজন কারিগর নৌকাটিতে বিভিন্ন রঙে লতা, পাতা, সাপ, ময়ূর ও একজোড়া পালোয়ান আঁকে। এভাবেই নৌকাবাইচের নৌকা তৈরি হলে ছাদির সেটি জলে ভাসায়। এ উপলক্ষ্যে সে পাড়ার লোকজনকে ডেকে এনে এক হাঁড়ি বাতাসাও বিতরণ করে। এরপর তারা নৌকা জলে নামায় এ বুলি আউড়ে, "জোর আছে? সকলে বলিল, আছে। আবার সকলে বলিল, যে জোর থুইয়া জোর না করে তার জোড় খায় মরা কাষ্ঠে রে-এ-এ" (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩২)। তারপর তারা একত্রে সেই নৌকাকে তিতাসের বুকে ভাসায়।

৭. লোকউৎসব

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। এসব উৎসবের বেশির ভাগই ধর্মীয়, তবে সামাজিক উৎসব এবং চিত্ত বিনোদনের আয়োজনও এর অন্তর্গত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এসব উৎসব পালন করে। মালোপাড়ায় পালিত হয় বাসন্তী উৎসব। এর সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, বরং কৃষিভিত্তিক সমাজে ঋতু পরিক্রমায় বসন্তের আবির্ভাবকে বরণ করে নিতে এটি পালিত হয়। আরও রয়েছে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। তবে ধর্মনির্ভর উৎসবের সংখ্যাই বেশি। এর মধ্যে রয়েছে মাঘ মণ্ডলের

ব্রত, দোল পূর্ণিমার উৎসব, হোলি উৎসব, কালীপূজা, মনসা পূজা, যাত্রার আয়োজন, মনসার ভাসানগত পুথি পাঠ প্রভৃতি, যা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। বিয়ে ও অন্নপ্রাশনও ধর্মীয় উৎসবের অন্তর্গত। মুসলমান সমাজে প্রচলিত উৎসবের মধ্যে রয়েছে ইদ ও মহররম। প্রকৃতিতে নানা রঙের সমাহার নিত্যকাজে ব্যস্ত মালোদের মনকেও রঙিন করে তোলে। তারা বসন্তকালে নতুন রঙে রাঙায় মাছ ধরার নৌকাগুলিকে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মঙ্গলাচার। গৃহবধূরা ছোটো থালায় আবির ও ধানদূর্বা নেয়। নৌকার মালিক সেই থালা থেকে আবির নিয়ে গলুইতে মেখে দেয়। সে ধানদূর্বাগুলি আঙুলে তুলে ভক্তিসহকারে আবির মাখানো স্থানের ওপর রাখে। এ সময়ে তার স্ত্রী জোকার দেয়। এভাবেই বসন্ত বন্দনার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যকে স্থায়ী করার আকাঙ্ক্ষাবশত তারা এ উৎসব পালন করে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি মালোদের পালিত সাংস্কৃতিক উৎসব। পৌষ মাসের শেষদিন এটি যাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রাধান্য পায় বিবিধ খাবারের বর্ণাঢ্য আয়োজন। নতুন ধান উঠলে তা ভাঙিয়ে চালের গুড়ি তৈরি করা হয় পিঠা এবং অন্যান্য খাদ্য তৈরির জন্য। একারণে উৎসবের অন্তত পাঁচ-ছয়দিন আগেই চাল গুড়ো করে রোদে শুকিয়ে রাখা হয়। নতুন চালের মুড়ি ভেজে ছাতুও বানানো হয়। উৎসবের আগের রাতে মেয়েরা পিঠা বানিয়ে রাখে। এসব পিঠা বিভিন্ন ধরনের এবং বৈচিত্র্যময় স্বাদে ভরপুর। উৎসবের দিন সকালে মালোরা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকে। তবে কেউ কেউ গেলেও মাছ না ধরেই ফিরে আসে উৎসবে অংশ নিতে। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণ সফল করে। সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গ্রামে কীর্তন শুরু হয়। সারা গ্রাম ঘুরে নাচ-গানে তারা মুখরিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় হরির লুট। এতে কদমা ও বাতাসা বিতরণ ও তা ধরার অলিখিত প্রতিযোগিতা চলে । সাহাপাড়া, যোগীপাড়া ও মালোপাড়া থেকে কীর্তনের পৃথক দল বের হলেও মালোরাই এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ করে। নাচগান, হৈহুল্লোড়, ঠাট্টা, তামাসার মধ্য দিয়ে জমজমাটভাবে কীর্তন পালিত হয়। নারীরা পরিজনের জন্য বিভিন্ন মুখরোচক, সুস্বাদু খাবার রান্না করে। এ উপন্যাসে ধর্মীয় লোকউৎসবের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে মাঘমণ্ডলের ব্রত। মাঘমাসের শেষদিন মালোপাড়ার কুমারী নারীরা মাঘমণ্ডলের পূজা ও ব্রত পালন করে। এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এ উৎসবের আচার হিসেবে তারা মাঘ মাসে প্রতিদিন তিতাস নদীতে প্রাতঃস্নান করে, এরপর বাড়ি ফিরে ভাঁটফুল ও দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়ে সিঁড়িতে পূজা নিবেদন করে, সেইসঙ্গে এ মন্ত্র পাঠ করে– 'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)। ব্রতের আচার হিসেবে তরুণ কলাগাছের এক হাত পরিমাণ লম্বা করে কাটা ফালি ও বাঁশের সরু শলাকা বিদ্ধ করে ভিত তৈরি করা হয়। এর ওপর গড়ে তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি ঘর। মাঘ মাসের শেষদিন ব্রত পরিসমাপ্ত হলে ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারি মাথায় নিয়ে তিতাসের জলে ভাসায়, এর সঙ্গে ঢোল-কাসি বাজে, নারীরা গীত পরিবেশন করে। উঠানে আঁকা আলপনার মাঝে একটি চৌকিতে বসে বাসন্তী ছাতা মাথায় দিয়ে সেটি ধীরে ধীরে ঘুরাতে থাকে। তার মা এর ওপর খই ও নাড়ু ঢেলে দেয়, যা ধরতে পাড়ার ছেলেরা রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে। নারীদের কণ্ঠে গীত হয় 'সখি ঐ তো ফুলের পালঙ রইলো, কই কাঁলাচাঁদ আইলো' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)। এর সঙ্গে দুখাই বাদ্যকর ঢোল ও তার ছেলে কাসি বাজায়। এ উৎসব বহুদিন ধরে চলে আসছে। এরপর কুমারী মালো নারীরা গীত পরিবেশন করতে করতেই তাদের চৌয়ারিগুলো মাথায় নিয়ে তিতাসের জলে ভাসায়। মালো ছেলেরা সেগুলো ধরার জন্য হট্টগোল করে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে দোল

পূর্ণিমার উৎসবের বিবরণ রয়েছে। কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ প্রবাসে গিয়ে শুকদেবপুর গ্রামে আয়োজিত এ উৎসবে অংশ নেয়। চৈত্রের মাঝামাঝি এটি পালিত হয়। এর অংশ হিসেবে গ্রামের মোড়ল সকাল থেকে রাত অবধি হোলি, গানবাজনা, রং খেলা ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার স্মৃতিময়তা এ উৎসবের প্রচলন ঘটিয়েছে– 'কে কাকে নিয়া কখন দুলিয়াছে। সেই যে দোলা দিয়াছিল তারা তাদের দোলনায়, স্মৃতির অতলে তারই ঢেউ। অমর হইয়া লাগিয়া গিয়াছে গগনে পবনে বনে বনে, মানুষের মনে মনে। মানুষ নিজেকে নিজে রাঙায়। তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রিয়জনকে রাঙায়, তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না– তখন তারা আত্মপর বিচার না করিয়া সকলকেই রাঙাইয়া আপন করিয়া তুলিতে চায়' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৭–৪২৮)। হোলি খেলার বিশেষ আকর্ষণ হলো রং ছিটানোর উল্লাস। এজন্য ঝুড়িভর্তি আবির এনে গামলায় গোলা হয়। এছাড়া চারকোনা চার-তাকের একটি মাটির সিঁড়ির ওপর দুই পাশে পোঁতা দুটি বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটি সালু কাপড়ে কৃষ্ণের পুতুল তৈরি করে ঝোলানো হয়। দর্শনার্থীরা এসে এটিতে আবির মাখিয়ে দোল দিয়ে যায়। এরপর গ্রামের বাসিন্দারা একে অন্যকে আবির মাখিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে ভিত্তি করেই কিশোরের সঙ্গে উপন্যাসে নামহীন তার স্ত্রীর পরিচয় এবং পরিণয় ঘটে। হোলি খেলা শেষ হলে গানের আসর বসে। সেখানে একজনকে হোলির রাজা সাজানো হয়। 'তার গলায় কলাগাছের খোলের মালা, কলাপাতার টোপর, পরনে ছেঁড়া ধুতি, গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া। মাঝে মাঝে উঠিয়া কোমর বাঁকাইয়া নাচে, আবার বসিয়া বিরাম নেয়। বুড়া মানুষ' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩০)। যেহেতু রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কে কেন্দ্র করে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন, তাই গানের আসরে নারীরা রাধার এবং পুরুষেরা কৃষ্ণের দলে বিভক্ত হয়ে গান করে। দোল-মণ্ডলের চারদিকে সমবেত গ্রামবাসী করতাল নিয়ে বাজনা বাজিয়ে নাচগানসহযোগে এ অনুষ্ঠানকে জমজমাট করে তোলে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদেও এ উৎসবের বৃত্তান্ত রয়েছে। গোকর্ণঘাট গ্রামে আড়ম্বরের সঙ্গে এ উৎসব পালিত হয়। স্নান সেরে বাসন্তী, অনন্ত ও অনন্তর মা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আবির দেওয়ার পরিকল্পনা করে। একারণে বাসন্তী অনন্তকে দিয়ে বাজার থেকে আবির কিনে আনায়। অপ্রকৃতিস্থ কিশোর আকস্মিকভাবে সামনে এসে আবির মাখার বায়না করায় অনন্তের মা তাকে আবির মেখে দেয়। অনন্ত দেখে, 'রূপকথার রাজ্যের লোকের মত পাগলটার চেহারা। আর তার মা ওটাকে আবির মাখাইতেছে। পাগলটা আবিরের থালা ফেলিয়া দিয়াছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭৫)। এটিই এ দুই নরনারীর জীবনের ট্র্যাজেডি যে, চার বছর আগের দোলপূর্ণিমায় যারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, সময়ের ব্যবধানে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মানবজীবন এতটাই নাটকীয়তায় ভরা যে, দীর্ঘদিন পর সেই দম্পতিই আবার একে অন্যকে আবিরে রঞ্জিত করে। তবে উন্মাদ কিশোর জানে না, সেই নারী নিতান্তই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা তাদের পুনর্মিলনের সুযোগ করে দেয়। বাসন্তী শেষ পর্যন্ত রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আবির দিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে এবং অনন্তকেই পরম আদরে আবিরে রঞ্জিত করে। সন্তানহীন-অকালেই বিধবা এ নারীর মাতৃত্বের আকুলতা সমগ্র উপন্যাসেই অনন্তকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

মালোদের ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার সংযোগ। নতুন শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে বিবিধ লোকাচার সম্পর্কিত উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে কালোবরণের পরিবারে আগত নবজাতকদের ভূমিষ্ঠ হওয়া সংক্রান্ত অন্নপ্রাশন এরই দৃষ্টান্ত। কালোবরণের বাবা মৃত। তার মা সংসারের কর্ত্রী। কালোবরণ ও তার

দুই ভাই বিবাহিত। আর্থিকভাবে যথেষ্ট সংগতিপন্ন বিধায় এ পরিবারে অন্নপ্রাশন জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে মেজোবৌ সন্তান প্রসব করে। তখন কালোর মা অনন্তের মাকে আহ্বান জানায়, 'জোকার' দিয়ে যেতে। শুধু সেই নয়, প্রতিবেশী অন্য নারীরাও কালোবরণের বাড়িতে এসেছিল নতুন শিশুকে এভাবে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে। লোকসমাজে এ নিয়ম মান্য, 'ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬১)। সকলেই পরম মমতা ও ভালোবাসায় তাকে কাছে টেনে নেয়। নবজাতক জন্মের ষষ্ঠ দিনে পালিত হয় দোয়াত কলম দেওয়ার অনুষ্ঠান। 'এই রাতে চিত্রগুপ্ত আসিয়া সে দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া দিয়া যায় তার ভাগ্যলিপি' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬১)। ধর্মীয় লোকসংস্কার ও লোকাচার মিলে মিশে মালোদের চেতনালোককে কীভাবে প্রভাবিত করে, তা এসব বৃত্তান্ত থেকে অনুধাবন করা চলে। অষ্টম দিনে পালিত হয় আট-কলাই। এদিন পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা-কলাই, বাতাসা প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। তেরো দিন পর অশৌচ অন্ত পালিত হয়। এদিন নাপিত বাড়ি এসে কালাবরণ ও তার ভাইদের দাড়ি কামিয়ে যায়। মন্ত্রপাঠ শেষে পুরোহিত উঠে গেলে উঠানে চাটাই পেতে এতে ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর নতুন শাড়ি পরে, নতুন রঙিন রুমালে জড়িয়ে মেজোবৌ ছেলেকে কোলে নিয়ে চাটাইয়ের ওপর রাখা ধানগুলো সারা চাটাইয়ে ছড়িয়ে দেয়। তখন সেখানে সমবেত নারীরা কৃষ্ণের পৌরাণিক আখ্যানসম্পৃক্ত সংগীত পরিবেশন করে। এরপর পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়ে নবজাতকের মুখে প্রসাদ দেওয়ার শুভ দিন জেনে নেয়। এ অনুষ্ঠানের নামই অন্নপ্রাশন। সেদিন বাড়িতে নিমন্ত্রিত নারীরা শিশুকে নিয়ে গীত গায়। এদিন অনুষ্ঠান শুরু হয় স্নানযাত্রার মধ্য দিয়ে। ছেলে কোলে নেওয়া ছোটো বৌকে মাঝে রেখে নারীরা গান গাইতে গাইতে তিতাসের তীরে যায়। 'ছোট বউ তিতাসকে নিজে তিনবার প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার প্রণাম করাইল। এক অঞ্জলি জল লইয়া তার মাথা ধোয়াইল। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)। যে নদীকে ঘিরে মালোদের জীবিকা নির্বাহ হয়, এর সঙ্গে মানবপ্রজন্মের গ্রন্থনা এভাবেই বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার, আচার ও উৎসবের আবরণে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে খানিকটা সময় বিশ্রামশেষে তারা বাড়ি থেকে রান্নাকরা একথালা পরমান্ন নিয়ে রাধামাধবের মন্দিরে যায়। সেটিকে ঠাকুরের নিকট নিবেদন করে প্রসাদ বিতরণ করা হয় শুভার্থীদের মাঝে। ছোটো বৌ তার ছেলের মুখে সেই প্রসাদ দেওয়ার পর বাকিটা অন্য ছেলেদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এভাবেই শিশুর জন্মদান এবং তাকে মালোসমাজে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপারটি এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অন্নপ্রাশনের পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হয়।

মালোপাড়ায় সবচেয়ে বেশি আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয় কালীপূজা। প্রতিমা নির্মাণের জন্য ভিন্ন গ্রাম থেকে কারিগর আসে এবং পূজার একমাস আগেই প্রতিমা বানানো হয়। বাঁশের দীর্ঘ কাঠামোটি পাঁচ দিন ধরে তৈরি হয়। সেটিকে খড় ও পাটের সরু দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে প্রতিমার অবয়ব দেওয়া হয়। মাথাহীন হাত, পা ও শরীরের আকৃতির কারণে সেটিকে অবশ্য মানুষের মতোই দেখায়। এসব কাজ শেষ হলে মাটির সঙ্গে কাটা পাটের কুচি মিশিয়ে পানি ঢেলে সেটিকে যথাসম্ভব নরম করা হয়। এ কাজের ভার মালোপাড়ার ছেলেদের। 'তারা নাচিয়া কুদিয়া পাড়াইয়া মাড়াইয়া সে মাটি নরম করিল। এই মাটিতে আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি তৈয়ার হইবে। সে মাটির কাজ করা বড় গৌরবের, বিশেষত ছেলেদের পক্ষে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৪)। কারিগররা সেই মাটি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করে। এরপর এর ওপর সাদা খড়িগোলা

লাগিয়ে পালিশ করে এরপর বিভিন্ন রঙে একে সাজানো হয়। প্রতিমার চোখ আঁকা হলে সেদিন রাতে কালীপূজা করা হয়। প্রতিমার দেহে রং দিয়ে সাজসজ্জার কাজটি করা হয় সকলের আড়ালে। পাল খাটিয়ে পূজামণ্ডপ ঢেকে কারিগররা এ কাজ করে। পূজার ধর্মাচার পালনের জন্য কালোর মা নির্ধারণ করে, কে সংযমীর কাজ করবে। যেহেতু তার বাড়িতে এ আয়োজন চলে, কাজেই এ ব্যাপারে সে-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। অনন্তের মা ও বৃন্দার মাকে নিয়ে সে নিজেই সংযমীর দায়িত্ব পালন করে। 'সংযমী যারা থাকে তারা আগের দিন নিরামিষ খায়, পূজার দিন প্রাতঃস্নান করে। পূজার জল তোলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় নামাবলি গায়ে যে পুরোহিত পূজায় বসে তার নির্দেশমতো নানা দ্রব্য আগাইয়া দেয় এবং প্রতিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নানা কাজ করে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৫)। প্রতিমার সাজসজ্জার কাজ শেষ হলে অনন্তের মা ধবধবে শাড়ি পরে নৈবেদ্য নিয়ে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করে। কালীপূজা গভীর রাতে শুরু হয়। সেকারণে দর্শনার্থীদের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজনে বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চালা বেঁধে একটি অস্থায়ী ঘর তৈরি করা হয়। বালক, যুবক, বৃদ্ধরা বাড়ি থেকে কাঁথা এনে ঘরের চটের ঢালাও বিছানার ওপর শুয়ে অপেক্ষা করে। আবার পূজামণ্ডপ ও চালাঘরের মাঝের স্থানে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে অনেকে গল্পগুজব করে সময় কাটায়। তাদের সঙ্গে ধূমপানের সরঞ্জাম হিসেবে থাকে হুকা ও তামাক। নির্দিষ্ট লগ্নে কাঁসি-ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা সম্পন্ন হয়। দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণে পূজা শেষ হলে প্রসাদ বিতরণ করে তাদের বিদায় জানানো হয়। অনন্তের মা সবার হাতে প্রসাদ তুলে দেয়। কালীপূজায় আনন্দ উপভোগের জন্য চারদিন ধরে আট পালা যাত্রা ও কবিগানের আয়োজনও এ উৎসবের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে দিনের বেলা যাত্রা ও রাতে কবিগানের আয়োজন করা হয়। এসময় তারা মাছ ধরা ও পেশাগত অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকে। পূজার সব আয়োজনের ব্যয়বাবদ মালোপাড়ার সকল ঘর থেকে গ্রামের মাতবররা চাঁদা তোলে।

মনসা পূজা মালোদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় লোক-উৎসব। পুরো শ্রাবণ মাসে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষ হলে তবেই এ পূজার আয়োজন করা হয়। বনমালী এ সময়ে দিনের বেলা মাছ ধরে এবং রাতের বেলা বিভিন্ন বাড়িতে পুথির আসরে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ করে। বিশেষ ভঙ্গিযোগে পুথি পাঠ এবং তা শ্রবণে আগ্রহী শ্রোতার উপস্থিতিতে মনসাপূজার আয়োজন তাদের নিকট বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। শ্রাবণ মাস অতিক্রান্ত হলে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষে ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। এর অন্যতম অংশ হলো জালাবিয়া। কালনাগের দংশনে মৃত স্বামী লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য বেহুলার অশেষ ধৈর্য ও সংগ্রামের পরিণতিতে বিজয়ী হওয়ার লোকপুরাণকে ভিত্তি করে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়।" 'বেহুলাসতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ি ও জাদিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, 'আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে।' চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণরচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োস্তালির স্মারকচিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া" (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১২)। এ বিয়েতে দুজন নারী বর ও কনের ভূমিকায় অভিনয় করে। প্রথমে বর সোজা হয়ে চৌকিতে দাঁড়ায়। এরপর কনে তাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে, পঞ্চপ্রদীপ নিজের কপালে ঠেকিয়ে তারপর বরের কপালেও স্পর্শ করায়। এরপর খই ও অতসী ফুলের রাশি মাথার ওপর ছিটিয়ে দেয়। দীপদানি আকৃতির একটি পাত্রে ধানের

চারাগুলো রেখে বরের মুখের সামনে ধরে সেগুলো দিয়ে মুখ মুছে নেয়। এভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিয়ে হতে থাকে আর একদল নারী বেহুলা-লখিন্দরের প্রণয়মূলক গান গাইতে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র ভূমিকা না থাকলেও মনসাপূজার অংশ হিসেবে অবশ্যপালনীয়। শ্রাবণ মাসের শেষে মালোরা মনসাপূজা করে। অন্য পূজার চেয়ে এ পূজার আয়োজনে খরচ কম, অথচ জাঁকজমক বেশি হয়। মালোপাড়ার ছেলেরা বিল থেকে শাপলা তুলে মনসার প্রতিমাকে সাজায়। মনসার পুষ্পসজ্জার অনুষ্ঠান শেষ হলে পুরোহিত এসে পূজার আয়োজন সম্পন্ন করে। শ্রাবণের শেষ দিন পর্যন্ত *পদ্মাপুরাণ* পড়া হয়, কিন্তু পুথি সমাপ্ত হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা অংশটুকু বাকি রাখা হয় এবং তা পাঠ করা হয় মনসাপূজার পরদিন সকালে। সেদিন মালোরা মাছ ধরা বন্ধ রেখে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ করে এবং খোল-করতাল বাজায়। আগামী বছরের জন্য সেটি পাঠশেষে তুলে রাখা হয়। একজন শ্রোতাদের বাতাসা ও খই বিতরণ করে।

৮. লোকখাদ্য

তিতাসপাড়ের গ্রামীণ সমাজের অন্তর্গত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে। এসব খাদ্যদ্রব্য তাদের ক্ষুধা মেটালেও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে জোবেদ আলীর বাড়ির দুই মুনীষ করমালী ও বন্দেআলীর আলাপে জানা যায়, তারা মনিবের বাড়িতে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলেও তাদের স্ত্রীরা শাক দিয়ে একমুঠো ভাত খেতে পায় কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের অংশ হিসেবে ঘরের আলপনা সজ্জিত আঙিনায় ব্রতিনী বাসন্তী চৌকি নিয়ে মাথায় ধরা ছাতাটি ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকলে তার মা এর ওপর খই ও নাড়ু ঢেলে দেয়। সেখানে উপস্থিত বালকেরা সেসব কাড়াকাড়ি করে খায়। শুকদেবপুরে গানের আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের বাতাসা পরিবেশন করা হয়। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে কালোর মায়ের নাতির আট-কলাই অনুষ্ঠানে পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা-কলাই ও বাতাসা পরিবেশন করা হয়। কালীপূজার প্রসাদ হিসেবে চিনি, বাতাসা, সন্দেশ, কলা ও আলোচাল একত্রে মেখে দলা বানিয়ে মণ্ডপে আগতদের পরিবেশন করা হয়। তাছাড়া হরির লুটে কদমা ও বাতাসা বিতরণ করা হয়। তবে এ উপন্যাসে উৎসব উপলক্ষ্যে পিঠা বানানোর মতো ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের বিবরণ রয়েছে 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদের অন্তর্গত উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। পৌষ মাসের শেষদিন এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে পাঁচ-ছয়দিন আগে থেকেই মালোপাড়ার ঘরে ঘরে চাল ভাঙিয়ে গুড়ো তৈরি করা হয়। এছাড়া মুড়ি ভেজে ছাতু তৈরি করা হয়। চালের গুড়ি রোদে শুকিয়ে খোলাতে ঢেলে পিঠা বানানোর জন্য তৈরি করা হয়। উৎসবের আগের দিন সারারাত ধরে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের ও ভিন্ন স্বাদের পিঠা বানায়। উৎসবের দিন সকালে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। এদিন তাদের নদীতে মাছ ধরায় আগ্রহ থাকে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা পিঠার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ উৎসব উপলক্ষ্যে যে কীর্তনের আয়োজন করা হয়, তাতে কদমা ও বাতাসা হরির লুট দেওয়া হয়। পুরুষেরা এতে অংশ নিলেও 'মেয়েরা ঘরে বসিয়া নানা উপকরণের পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯–৪৭০)। শুধু লৌকিকতার অংশ হিসেবেই নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিশ্বাস ও সংস্কার। রামকেশবের একমাত্র ছেলে কিশোর মাছ ধরতে প্রবাসে গিয়ে উন্মাদ হয়ে গ্রামে ফিরলে 'সে পরিবারকে জানাইল, পাগলের

মঙ্গলের জন্য 'আলন্তি'র দিনে কয়েকজন লোককে খাওয়াইবে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯)। এজন্য সে যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, প্রতিবেশী মঙ্গলা ও তার ছেলে মোহন, সুবলার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের এবং অনন্ত ও তার মাকে নিমন্ত্রণ জানায়। 'নিমন্ত্রণ পাইয়া সুবলার শাশুড়ি মায়ে-ঝিয়ে অনেক চাউলের গুঁড়ি কুটিয়া রামকেশবের বাড়ি দিয়া আসিল। নিজেদের জন্য আগে যত গুড়ি কুটিয়া রাখিয়াছিল তাহাও পাঠাইয়া দিল। এবারের পরব তাদের বাড়িতে না হইয়া ঐ বাড়িতেই হোক' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯)। বাসন্তী অনন্তের মাকে নিয়ে কিশোরদের বাড়িতে হাজির হয়। পিঠা বানানোর আয়োজন সম্পন্ন করে সে প্রথমে বানানো পিঠাটি রাধামাধবের জন্য তুলে রেখে এরপর অনন্তকে পিঠা খেতে দেয়। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পর আগত মঙ্গলার মাও পিঠা বানাতে বসে। অনন্তের মা তার পাগল স্বামী কিশোরকেও প্রবল ভালোবাসার তাড়নাবশত পিঠা খেতে দেয়। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে অনন্ত তার মৃত মায়ের পারলৌকিক কল্যাণার্থে শ্রাদ্ধের পর পিণ্ডদান করে। বাসন্তীর উদ্যোগে পিণ্ডের বন্দোবস্ত করা হয়। বাসন্তী ভাত ও বিভিন্ন তরকারির পাশাপাশি পান, সুপারি, টিকা, তামাক প্রভৃতিও কলার খোলে দেয়। ধর্মাচারের সঙ্গে প্রাত্যহিক খাদ্যাভ্যাসের যোগাযোগ এ ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বহুদিন পর সাক্ষাৎ হলে পিঠা বানানোর আয়োজনের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। তিন বোন নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমানতারার বিয়ে হওয়ার দীর্ঘদিন পর একমাত্র ভাই বনমালীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। বোনেরা তাদের স্বামীদের নিয়ে তার বাড়িতে বেড়াতে এলে সে তাদের সমাদরের জন্য রান্নার বিবিধ সরঞ্জামের পাশাপাশি আতপ চাল, গুড়, তেল প্রভৃতিও আনে, পিঠা বানানোর জন্য। তিন বোন সারারাত জেগে গল্প করতে করতে পিঠা বানায়। *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষ হলে শ্রোতাদের বাতাসা ও খই বিতরণের উল্লেখও রয়েছে এ উপন্যাসে। ছাদিরের নৌকাবাইচের নৌকা বানানোর জন্য কাঠমিস্ত্রিদের খাবারের বন্দোবস্ত হিসেবে রমুর মা খুশি চিড়া ও দুধ পাঠায়। উদয়তারা ও বনমালী অনন্তকে নিয়ে বিরামপুরের কাদির মিয়ার বাড়িতে বেড়াতে এলে তাদেরকে জলচিড়া, দুধ ও বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অনন্তর বাবা নেই বলে তার মনোলোকে নৈঃসঙ্গ্য ও কাতরতা বিদ্যমান। সে গ্রামের সমবয়সী অন্যদের লক্ষ করে সিদ্ধান্তে আসে, বাবা সম্বোধিত লোকটি তার ছেলেকে ছোলাভাজা, মটরভাজা, বিস্কুট কমলা প্রভৃতি কিনে দেয়। ছড়া বানাতে পটু উদয়তারার সংলাপে উল্লেখিত হয় লোকখাদ্যের নাম– জিলাপির পেচে-পেচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠাণ্ডা লাগে জল ছাড়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৬)।

পান খাওয়ার পাশাপাশি হুকা ও কল্কিতে তামাক পানের রীতি যে বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এর বিবিধ দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসের আদ্যন্ত রয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ দরিদ্র মালো গৌরাঙ্গ ও তার ভাই নিত্যানন্দের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লক্ষণীয়। নিত্যানন্দ অর্থাভাবে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণে দিশেহারা হয়ে তামাক টানলে তার প্রতি গৌরাঙ্গ ক্ষিপ্ত হয়– 'খালি তামুক খাইলে পেট ভরব?' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০১)। 'প্রবাস খণ্ড'-তে লক্ষণীয়, বাসন্তী তার বাবা দীননাথ মালোকে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের জন্য রঙিন কাগজের চৌয়ারি বানিয়ে দিতে বললে সে এ কথায় কর্ণপাত না করে 'গম্ভীর মুখে আগুন-ভরা মালসা, টিকা-তামাক-ভরা বাঁশের চোঙা, আর দড়িবাঁধা-কলকেওয়ালা হুকা লইয়া নৌকায় চলিয়া গিয়াছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৩)। কিশোর ও সুবলের পাঠশালার শিক্ষকের কাকা বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী চটিপায়ে উঠানে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে তামাক টানত। কিশোর প্রবাসযাত্রাকালে তার বাবা রামকেশব ছেলেকে বিদায়

জানাতে নদীতীরে না এসে 'ঘরে বসিয়া ঘন ঘন কেবল তামাক টানিতেছিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)। নৌযাত্রায় কিশোর বৃদ্ধ তিলকচাঁদকে বলেছিল, 'যাও তিলক, তামুক খাও গিয়া। দাঁড়টা দেও আমার হাতে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৭)। তিলক দাঁড় টেনে ক্লান্ত হলে অবকাশের প্রয়োজনে তামাক টানতে থাকে। তারা প্রবাসে গমনকালে নয়াকান্দা গ্রামে যাত্রাবিরতি টানে। শুধু বয়স্ক পুরুষই নয়, উঠতি বয়সের তরুণেরাও এতে অভ্যস্ত। সেকারণেই এ গ্রামের জনৈক বাসিন্দার সঙ্গে কিশোর আলাপকালে পরিচিত হয় এবং হুক্কাযোগে ধূমপান করে। লোকটির বালিকা মেয়ে বাড়ি থেকে হুক্কা এনেছিল। এ প্রসঙ্গে সে দিব্যি ছড়া কাটে– 'আমি খাই তোমার হুক্কা, তুমি খাও আমার ঝিয়ের হুক্কা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৯)। বাঁশিরামের মোড়লের বাড়িতে আগত অতিথি হিসেবে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণের পর তার স্ত্রী কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদকে পান খেতে দেয়। আর বাঁশিরাম মোড়ল হুক্কায় ধূমপান করে। কিশোর ও সুবল কখনো কখনো ধূমপান করে হুক্কায়। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে অনন্তের মাকে তার স্বামীর গ্রাম গোকর্ণঘাটে পৌঁছে দিতে নৌকাযাত্রার একপর্যায়ে সেই নারী 'মালসা হইতে এইবার জ্বলন্ত টিকাটি তুলিয়া গৌরাঙ্গের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪১)। পান-তামাক খাওয়া যে লোকসমাজের ব্যক্তিগত অভ্যাস নয়, বরং সমষ্টিমানুষের মধ্যে এটি বহুকাল ধরেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রচলিত, এর উদাহরণ রয়েছে এ পরিচ্ছেদেই। অনন্তের মা গোকর্ণঘাট গ্রামে এলে তার সঙ্গে পরিচিত হতে পাড়ার নারীরা আসে। তারা সমাদরের অংশ হিসেবে তার কাছে পান-তামাক খেতে চায়। কিন্তু অনন্তের মায়ের কাছে সেসব না থাকায় তারা নিজেরাই সঙ্গে আনা কাপড়ের থলে থেকে পান, চুন, সুপারি বের করে সকলে মিলে খেতে খেতে গালগল্পে ব্যস্ত হয়। পান সম্পর্কিত লোকসংস্কার ও ছড়ার উল্লেখও রয়েছে তাদের কথোপকথনে। আবার ভারতের বাড়িতে গ্রামের মাতবরদের সভা বসলে সেখানে আগতদের জন্য পান, তামাক ও হুক্কার বন্দোবস্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পান পরিবেশন এবং ব্যক্তিভেদে হুকা-তামাকের স্বতন্ত্র আয়োজন থেকে তাদের সামাজিক অবস্থান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়টি অনুধাবন করা চলে–

> কয়েকটি ছেলে হুকা কলকে মালসা ডিবা লইয়া বসিয়া গিয়াছে। অনবরত ছিলিম ধরাইয়া হাতে হাতে চালাইয়া দিতেছে ... একটা পরিষ্কার ঝকঝকে বড় কাঁসার থালাতে কয়েক বিড়া ধোয়ামোছা পান, সুচিক্কণ সুপারি, মাজাঘষা কয়েকখানি বাটিতে চুন ও অন্যান্য মশলা, থালাখানি হাতে করিয়া মধ্য বিছানায় নমস্কার করিল ভারত, 'দশজন পরমেশ্বর, আমার একখান কথা। পান নি দেওয়ার সময় অইছে?' সকলেই সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকাইল। পরে রামপ্রসাদের দৃষ্টির ইঙ্গিত পাইয়া ভারত নিজে মাতব্বরদিগকে পান বাটিয়া দিল। পরে পাড়ার একটি ছেলের হাতে থালাখানা তুলিয়া দিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে এই জনারণ্যে পান বাটা শুরু করিল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫১)

ভারতের বাড়িতে বৈঠক শেষে নিজ বাড়ি ফেরার পথে রামপ্রসাদ পথ ভুলে মুসলমান সম্পন্ন গৃহস্থ এবং তার পরিচিতজন বাহারুল্লার বাড়িতে আসে। সেখানে আলাপের এক পর্যায়ে কুটুমকে আপ্যায়নের অংশ হিসেবে বাহারুল্লা তার জন্য হুকায় তামাকের বন্দোবস্ত করায় স্ত্রীকে দিয়ে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে গ্রামে কালীপূজার উৎসবের রাতে পূজার মণ্ডপের কাছেই অস্থায়ীভাবে দাঁড় করানো চালাঘরে সমবেত দর্শকেরা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে বসে। 'হাঁড়ি-ভরা তামাক টিকা কাছেই আছে। পাঁচ ছটা-হুকা জ্বলিতেছে নিবিতেছে। আগুনের তাপে আর তামাকের ধকে তারা একসঙ্গে উত্তাপিত হইতেছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৭)। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, আলুচাষি কাদির ও তার ছেলে ছাদিরের আলুবোঝাই নৌকা নদীতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত

বনমালী ও তার সংগীরা তাদের উদ্ধার করে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির মধ্যে ঠান্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে বনমালী সঙ্গে রাখা তামাক ও হুকা তাদের এগিয়ে দেয়।

৯. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত সাজপোশাক ও প্রসাধনের উল্লেখ লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে মালো নারীদের স্নানের কাজে ব্যবহৃত এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবান ব্যবহারের প্রসঙ্গ রয়েছে। তবে সাবান যে পুরুষদের পরনের পোশাক ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতার জন্যও জরুরি, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে। সুবল কিশোর ও তিলকচাঁদ প্রবাসযাত্রায় শুকদেবপুর গ্রামের উজানিনগর খলায় বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে আশ্রিত থাকে। গানের আসরে অংশগ্রহণের জন্য সুবলের পরিচ্ছন্ন পোশাক প্রয়োজন বিধায় সে জনৈক বেদেনির নিকট থেকে সাবান কেনে। নদীর ওপারের হাটে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি হলেও ভ্রাম্যমাণ বেদে বহরেও এসব পাওয়া যায়, গ্রামবাসীর চাহিদা থাকায়। 'বেদেনীরা আয়না চিরুনি সাবান বঁড়শি, মাথার কাঁটা, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা লইয়া নৌকা করিয়া শুকদেবপুরের ঘাটে বেসাত করিতে যায়' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৮)। গানের আসরে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ ধুতি পরে, বিশেষ কায়দায় গামছা কাঁধ থেকে বুকে ঝুলিয়ে সাজ পূর্ণ করে। অন্যদিকে নারীদের সাজসজ্জার মধ্যে শাড়ি ও হাতের চুড়ির উল্লেখ রয়েছে। মালোপাড়ার পুরুষেরা শীতকালে গাতি বা বেশ কয়েক পরতে তৈরি বিশেষ ধরনের জামা পরে। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ তার ছোটো ভাই গৌরাঙ্গকে বলেছিল, তার পিঠে গিঁট দেওয়া গাতি খুলে দিতে। কেননা তখন ঠান্ডার প্রকোপ কমে গিয়েছিল। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, কালীপূজার অনুষ্ঠানে 'সংযমী' ধর্মীয় কার্যাদি সমাপনের দায়িত্বে নিয়োজিত অনন্তের মা ধবধবে সাদা শাড়িতে নিজেকে আচ্ছাদিত করেছিল। কাপড়ের দোকানের পাশেই বেদেরা পসরা সাজিয়ে বসে। তারা তাগা, মাদুলি, আয়না, জলে ভাসা সাবান, পুঁতির মালা, রেশমি ও কাঁচের চুড়ি প্রভৃতি বিক্রি করে। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে উদয়তারার বিয়ের স্মৃতিচারণায় বিবৃত হয়েছে বর-কনের সাজসজ্জার পরিচয়। 'সেদিন উদয়তারার সামনে বসিয়াছিল অজানা একটা নূতন পুরুষ মানুষ– চুলদাড়ি সুন্দর করিয়া ছাঁটা, মাথায় জবজবে তেল দিয়া বাঁকা টেরি কাটা– নূতন কাপড়ে তাকে সেদিন দেবতার মত দেখা গিয়াছিল। ... তাহাকেও কি খুব সুন্দর দেখাইতেছিল না সেদিন! তিন-চার জনে ধরিয়া তাহাকে চুল আঁচড়ানো, তেল-সিন্দুর পরানো, চন্দন-তিলক লাগানো প্রভৃতি কর্ম করিয়াছিল। মালোদের পুরোহিত গলায় একটি চাদর ঝুলিয়ে ও হাতে একটি দর্পণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি মনসাপূজা করে। দয়ালচাঁদ যাত্রায় যখন মুনি-ঋষির চরিত্রে অভিনয় করে, তখন 'কৌপীন পরিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া খড়ম পায়ে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫১) সে আসরে প্রবেশ করে। মালোপাড়ার গৃহবধূরা লাল-কালো ডুরি-ডুরি শাড়ি পরে, পায়ে রুপার মল সাজিয়ে জলে আনতে কলসি কাখে ঘাটে আসে। 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে মুসলমান কৃষক পরিবারের পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত পোশাকের উল্লেখ রয়েছে। বিরামপুর গ্রামের কাদির মিয়ার নাতি রমু শিক্ষালাভের জন্য মক্তবে যায় নতুন লুঙ্গি, গেঞ্জি ও টুপি মাথায় দিয়ে। মাগন সরকার গলায় রেশমি চাদর ঝুলিয়ে মসৃণ জুতা পরে বাড়ি ফেরার একপর্যায়ে তার সঙ্গে রশিদ মোড়লের দেখা হয়। 'রশিদ মোড়লের খালি পা, লুঙ্গি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৫)। আবার এ পরিচ্ছেদেই নৌকাবাইচের আসরে আগত অনন্ত ও

অনন্তবালা দুজন খেলোয়াড়কে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। কারণ দুটি প্রকাণ্ড মাটির গামলা বিভিন্ন রঙে সাজিয়ে দুই হাতে দুটি করে বৈঠা নিয়ে তারা নদীতে সেগুলো ভাসিয়েছিল। 'উহাদের ... ফেশন করিয়া চুল দাড়ি ছাঁটাই করা, মাথায় জবজবে তেল, পরিষ্কার ধুতির উপর গায়ে সাদা গেঞ্জি' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩৫)। 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মালো নারীদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা রীতিমতো বিলাসিতার পর্যায়ে চলে যায়, যাত্রার চাকচিক্যময় সাজসজ্জার অনুকরণে। 'সুযোগ পাইয়া স্যাকরারা নানারকম গহনার নমুনা লইয়া, মনোহারী দোকানের লোকেরা তেল গামছা সাবান লইয়া ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করিতে লাগিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫০)। ফলে বাহুল্য মনোহারি পণ্য কিনতে গিয়ে দুর্দিনের সঞ্চয় খরচে তারা অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে, যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তাকে বহুলাংশেই বিপর্যস্ত করে।

১০. লোকযান

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের মালো সম্প্রদায়ের জীবনধারণ ও জীবিকা নির্বাহের মুখ্য অবলম্বন হিসেবে নৌকার বিবিধ ভূমিকা লক্ষণীয়। শুধু যাতায়াতের বাহন হিসেবেই নয়, নৌকা যে লোকসংস্কৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা এ উপন্যাসের আদ্যোপান্ত রূপায়িত। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভূ-ভাগ নদীমাতৃক পরিচয়ে খ্যাত। এদেশে অজস্র নদী জালের মতো ছড়ানো বলে নৌপথে যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মালামাল পরিবহণ, এমনকি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিবদমান সংঘর্ষেও এর নির্বিকল্প ভূমিকা এ উপন্যাসের প্রারম্ভেই উল্লেখিত। জলাশয়নির্ভর বিভিন্ন লোকগোষ্ঠী তথা বেদে, জেলে বা ধীবর, মালো, কৈবর্তরা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে একে ব্যবহার করে, পাশাপাশি চাষি এবং অন্যান্য পেশাজীবী মানুষেরাও এর দ্বারস্থ হয় নিত্যদিনের প্রয়োজনে। লেখক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিতাসনদীর বিবর্তন ও প্রবহমানতার সমান্তরালে মানবজীবনপ্রবাহের রূপরেখা উপস্থাপনায় মগ-মুগল-পাঠানদের যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সূত্রনির্দেশ করেছেন, যেখানে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নৌকার উল্লেখ। তবে তিতাসপারের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নৌকার ভূমিকাও বিবৃত এ পরিচ্ছেদেই। গ্রীষ্মকালে তিতাস শুকিয়ে গেলে এতে নৌকা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে সেটিকে তুলে রাখা হয় বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য। সেসময়ে অনেকেই বড়ো নৌকা নিয়ে চাঁদপুরের বড়ো গাং তথা মেঘনা নদীতে 'প্রবাসে' যায়, দুর্দিনে অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে। আবার ব্যবসার কাজে নিযুক্ত 'সওদাগরের নৌকা' বড়ো নদীতে পাল তুলে চলে। গন্তব্যে পৌঁছবার প্রয়োজনে নদীতেই যাত্রাবিরতি দিয়ে এর আরোহী মাঝিমাল্লারা 'নৌকায় রাঁধে, খায়, ঘুমাইয়া থাকে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০২)। অন্যদিকে, ছই দেওয়া বা ছই ছাড়া, যে কোনো খেয়া নৌকায় চড়ে বধূ কখনো যায় বাপের বাড়ি, কখনো শ্বশুরবাড়ি। জোবেদ আলীর তিন জোয়ান ছেলে নদীর ওপারের জমি চাষের জন্য ডিঙি নৌকায় চড়ে সেখানে যায়। তিতাসপাড়ের জেলে পরিবারগুলোর মাছ ধরে হাটে বিক্রির প্রয়োজনে 'বাড়ি পিছু একটা করিয়া নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১২)। ঋতুর বৈচিত্র্যময় পরিক্রমায় লোকসমাজের বর্ণাঢ্য উৎসবে-আয়োজনেও নৌকার উপস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয়, এটি তাদের বহমান সংস্কৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে—

> রঙ মানুষের মনে মনে। তারা তাদের নৌকাগুলিকেও সাজায়। বউ-ঝিরা ছোট থলিতে আবির নেয়, আর নেয় ধানদূর্বা। জলে পায়ের পাতা ডুবাইয়া থালিখানা আগাইয়া দেয়। নৌকাতে যে

> পুরুষ থাকে সে থালির আবীর নৌকার মাঝের গুরায় আর গলুইয়ে নিষ্ঠার সহিত মাখিয়া দেয়। ধানদূর্বাগুলি দুই অঙ্গুলি তুলিয়া ভক্তিভরে আবির মাখানো জায়গাটুকুর উপর রাখে। এই সময়ে বউ জোকার দেয়। সে-আবিরের রাগে তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জাগে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৩)

মালো পরিবারের পুরুষদের বিয়ের পূর্বেই নিজের নৌকা ও জাল কেনার বন্দোবস্ত করতে হয়। নতুবা কনের পিতা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। সুবলের বাপ গগন মালো এ শর্তে সম্মত হয়ে তবেই বিয়ে করেছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে আজীবন অন্যের নৌকায় মজুরির বিনিময়ে কাজ করে সংসার চালাতে হয়। সেকারণে সুবলের মা তাকে সুযোগ পেলেই খোটা দেয়– 'এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা। এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন? ... খাইবা বুড়াকালে পরের লাথি উষ্টা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৫)। ফলে তার ছেলে সুবল বাপের মৃত্যুর পর বন্ধু কিশোরের নৌকায় 'মাথা তোলা' হয়ে মাছ ধরার কাজ নেয়। এরপর তারা একদিন অভিজ্ঞ বৃদ্ধ তিলকচাঁদকে নিয়ে নৌকা সাজায় প্রবাসে যাত্রার জন্য। যেহেতু বড় নদীর বুকে বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে, তাই 'তারা পুরানো ছই নতুন করিল, নৌকা ডাঙায় তুলিয়া গাবকালি মাখাইল। জালগুলিকে কড়া গাব খাওয়াইয়া তিনদিন বিশ্রাম দিল। অতিরিক্ত কিছু বাঁশ আর দড়াদড়িও জোগাড় করিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)। প্রবাসযাত্রার একপর্যায়ে তারা যখন ভৈরব বন্দরে যাত্রাবিরতি করে, সেখানেও দেখা মেলে 'নানা ব্যবসায়ের অসংখ্য নৌকা। কোনো নৌকাই বেকার বসিয়া নাই। সব নৌকার লোক কর্ম-চঞ্চল। নৌকার অন্ত নাই' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৭)। সারারাত নৌকায় যাত্রার পর পরদিন ভোরে তারা নয়াকান্দা গ্রামে হাজির হয়। কিশোরদের সঙ্গে আলাপকালে তাদের একজন জানায়, তারা আগে পশ্চিমপাড়ের জনৈক জমিদারের গ্রামে থাকলেও তার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে এ স্থানে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর মালো পরিবার বসতি গড়ে তুলেছে। যদিও এ পাড়া থেকে স্থানীয় হাটবাজার দূরে, তবু এখানকার বাসিন্দারা নৌকায় চড়েই সাংসারিক কাজকর্ম ও মাছ ধরার বন্দোবস্ত করে। প্রবাসযাত্রা শেষে নিজ গ্রামে ফেরার পথে কিশোরের নৌকা যখন মেঘনার মোহনাসংলগ্ন খাড়িতে যাত্রাবিরতি করে, 'সেখানে অনেক নৌকার সমারোহ। তার বেশির ভাগ ধান-বেপারী, কাঁঠাল-বেপারী, পাতিল-বেপারীর নৌকা। সকলেই এখানে এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়াছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)। কিশোরের স্ত্রী ছেলে অনন্তকে নিয়ে আশ্রয়লাভের জন্য স্বামীর গ্রামে আসে । পথে অনন্ত তিতাসপাড়ের মালোপাড়ার যে দৃশ্য দেখে, সেখানেও নৌকার উপস্থিতি লক্ষণীয়– 'একটির পর একটি করিয়া বাঁধা নৌকা। সব নৌকা একই আকারের, একই গড়নের। সারি সারি বাঁশের খুঁটি পোঁতা আছে। তারই একটির সঙ্গে একটি করিয়া নৌকা বাঁধা। নৌকার পেছনের দিকে এক একটা ছই। ছইয়ের দুই দিকই খোলা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৪)। এ উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'-তে 'জিয়লের ক্ষেপ' দিতে গিয়ে কালোবরণের কর্মচারী সুবলের নৌকা চাপা পড়ে মৃত্যুর মর্মান্তিক বিবরণ রয়েছে। ঝড়ের তোড়ে নদীতীরে সেই নৌকাটি যখন আছড়ে পড়ার অবস্থা হয়, তা প্রতিহত করতে কালোবরণ তাকে আদেশ দেয় লগি নিয়ে তীরে লাফিয়ে নৌকা ঠেকাতে। অন্যদেরও সুবলের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ছিল। কিন্তু তারা তা না করায় একাকী সুবলের পক্ষে এত বড় নৌকাকে ঝড়ের মধ্যে সামলানো সম্ভব হয়নি। ফলে সুবল সেই নৌকার তলে চাপা পড়ে প্রাণ হারায়। এ উপন্যাসের 'তিন' অধ্যায়ের 'রামধনু' পরিচ্ছেদে মুসলমান কৃষক ও আলুচাষি কাদির এবং তার ছেলে ছাদিরের আলুবোঝাই নৌকাডুবির প্রসঙ্গ রূপায়িত। তাদের বিপন্ন মুহূর্তে জেলে বনমালী

ও ধনঞ্জয় নিজেদের মাছ ধরার নৌকা নিয়ে এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামলায়। এ ঘটনায় হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মা-বাপ হারা অসহায় এতিম বালক অনন্ত বনমালীর নিকট আশ্রয় লাভের আশায় বাজারের ঘাটে অপেক্ষা করে। কিন্তু বনমালী দিনের পর দিন ব্যস্ত থাকায় তার হাটের দিকে আসা হয় না। এমতাবস্থায় দারিদ্র্যের পীড়নে জর্জরিত বাসন্তী ও তার পরিবারের নিকট থেকে আশ্রয় হারিয়ে অনন্ত অবশেষে খালের মুখে ফেলে রাখা মস্তবড় একটি ভাঙা নৌকায় আশ্রয় নেয়। এর পেছন দিকে রয়েছে কয়েকটা পালিশ করা কিছু পাটাতন, ফলে সেখানে থাকলে রোদবৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নৌকাকে কেন্দ্র করে তিতাসপাড়ের গোকর্ণঘাট, নয়ানপুর, আমিনপুর, বিরামপুর, গোসাইপুর, নবীনগর, রাধানগর, কেষ্টনগর, মনপুরা প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে কোলাহল ও উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে বর্ষাকালে। কারণ এসময় নদনদী-বিল, দিঘি বর্ষার পানিতে থইথই করে বলে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। এ উপন্যাসের একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের শিরোনাম, 'রাঙানাও' যা থেকে অনুধাবন করা যায় তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের জীবনে নৌকার ভূমিকা। এটি যে তাদের নিত্যদিনের কর্ম সম্পাদন ও জীবিকার বাহন, যাতায়াতের অবলম্বন হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, বরং একে ঘিরে তাদের চিত্তবিনোদন ও আমোদ লাভের সুযোগও খেলার মাধ্যমে ঘটে থাকে, তা প্রতীয়মান হয়। বাইচে বা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নৌকার মালিক তার দলের সংগীদের নিয়ে নৌকা চালানোর তালিম নেয়। পুরাতন নৌকার মেরামত ও রং করার কাজটিও এ উপলক্ষ্যে চলতে থাকে। সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গান-বাজনাযোগে একে ঘিরে বালকবালিকাদের ঔৎসুক্য যে অপরিসীম, তা বিবৃত হয়েছে অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে—

> রাঙা নাও। ... নৌকাটি তিতাস পার হইয়া দূরের একখানা পল্লীর দিকে রোখ করিয়াছে। ... নৌকা সাজাইয়া রঙ করাইয়া লোকজন লইয়া তালিম দিতে গিয়াছিল। ... সাপের মত হিস্ হিস্ করিয়া চলিয়াছিল, ঐ-গাঁয়ে উহা থামিতেই পারে না। সারা গায়ে লতাপাতা সাপ ময়ূরের ছবি লইয়া রঙিন দেহ তার একের পর এক পল্লী পাশ কাটাইয়া আর হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মন পাগল করিয়া ছুটিয়াই চলিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৮–৫১৯)

বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ কাদিরের বিবাহিত ছেলে ছাদিরের নৌকাবাইচে অংশগ্রহণের উদ্যোগ ও এ সংক্রান্ত কর্মতৎপরতার সূত্রে 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে নৌকাবাইচকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের ভাবাবেগের স্বরূপ। ছাদির নৌকাবাইচে অংশগ্রহণের জন্য পাট বিক্রির চারশ টাকা দিয়ে বড়ো নৌকা বানানোর অনুমতি চায় কাদিরের কাছে। কাদির এ প্রস্তাব বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু ছাদির তাকে যুক্তি দেখায়, আশেপাশের অন্য সব গ্রামের মানুষের নৌকাকে পরাস্ত করে বিজয়ী হওয়ার সম্মান শুধু তার পরিবারের নয়, বরং সমগ্র বিরামপুর গ্রামের। বিপুল টাকা খরচ করে বানানো নৌকা নৌকাবাইচের পর কী কাজে লাগবে, কাদির জানতে চাইলে ছাদির প্রত্যুত্তরে বলে, 'বর্ষার যে কয়মাস ক্ষেতেখামারে পানি থাকিবে, এ নৌকা লইয়া বিলে গিয়া বোঝাই ভরতি ঘাস কাটিয়া আনা যাইবে গাই-গরুর জন্য ...বিলের পানি শুকাইয়া গেলে ... গেরাপি দিয়া তারে তিতাসের পানিতে ডুবাইয়া রাখিব, তার পেটে কতগুলি ডালপালা রাখিয়া দিব, আশ্রয় পাইয়া মাছেরা আসিয়া জমিবে; তখন সময় সময় জল সেঁচিয়া সে মাছ ডোলা ভরিয়া বাড়িতে আনিব' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৭)। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন বিকেলে তিতাসের বুকে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। এতে পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত ছিল মেডেল, পিতলের

কলসি ও একটি বড়ো খাসি। সেদিন সকালেই কাদিরের বাড়িতে গ্রামের তরুণ চাষিরা সমবেত হয়। তারপর তারা রাঙা বৈঠা নিয়ে নৌকা চালনার তালিম গ্রহণের জন্য নতুন নৌকা নিয়ে বিলে নামে। তারা বুঝতে পারে, 'সব লোকে একযোগে বৈঠা মারলে সাপের মত হিস হিস করিয়া চলে, শিকারীর তীরের মত সাঁ সাঁ করিয়া চলে, গাঁঙের সোতের মত কলকল করিয়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩৩) নৌকাটি চলে। দুপুরের আহারের পর ছাদিরের নৌকার দুই পাশে দুই সারি লোক বৈঠা নিয়ে বসে। তাদের মাঝে কয়েকটি তক্তার ওপর মাস্তুলের মত একটি ছোটো খুঁটিকে আশ্রয় করে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি কয়েকটি ঢোল, করতাল ও লাঠি নিয়ে নৌকায় ওঠে। তারপর তারা ইসলামের বীরপুরুষ আলীর নাম স্মরণপূর্বক নৌযাত্রা শুরু করে। তিতাস নদীর অপেক্ষাকৃত চওড়া অংশে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। সেখানে হাজার হাজার ছোটো বড়ো ছইওয়ালা নৌকা খুঁটিতে আবদ্ধ। ক্রীড়ামোদী লোকজন এসব নৌকায় চড়ে ভিড় জমায়। নদীর ঠিক মাঝখানে প্রায় একমাইল বিস্তৃত স্থানে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা পড়ার পরই বিভিন্ন নৌকায় নানা সুরে সারিগান গাওয়ার হিড়িক পরে। কিন্তু নৌকাবাইচকে ঘিরে প্রতি বছরই এক গ্রামের মানুষের সঙ্গে অন্য গ্রামের মানুষের সংঘর্ষ বাঁধে। এক্ষেত্রে কখনো পুরাতন বিবাদের জের, কখনো বা খেলায় জয়ী হবার প্রচেষ্টা, কখনো বা অন্যের সুন্দর নৌকা ধ্বংস করার মনোভাব প্রভৃতি এক্ষেত্রে দায়ী। সেই সঙ্গে নৌকাতেই লাঠি ও বাঁশ থাকায় একদলের সঙ্গে অন্যদলের মারামারিও অনিবার্য হয়ে পড়ে সেই পরিস্থিতিতে। প্রতি বছরই এরূপ ঘটনা ঘটে। এতে অনেকেই আহত, নিহত হয়। প্রতিপক্ষের নৃশংসতার কারণে ছাদিরের নৌকা বিধ্বস্ত হয়। অপরিচিত প্রতিপক্ষের আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব ছাদির এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হবার কারণ অনুধাবন করতে পারেনি। নদীতে বিপন্ন অবস্থায় তাকে বনমালী উদ্ধার করে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবন ও সংস্কৃতিতে নৌকার গুরুত্ব অনুধাবন করা চলে।

১১. লোকশিল্প

এ উপন্যাসে লোকশিল্প হিসেবে বাঙালি গ্রামীণ নারীসমাজে প্রচলিত সূচিশিল্প ও আলপনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। তবে 'শিল্প' অর্থে নয়, বরং জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন এবং ধর্মাচারের অংশ হিসেবে এসবের প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন 'তিতাস একটি নদীর নাম' পরিচ্ছেদে জোবেদ আলীর গৃহকাজে নিযুক্ত কামলা করমালীর স্ত্রী সারদিন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি কাঁথা সেলাই করে। সে এ কাজ করে কিছু অর্থ পায়। তবে সেলাইয়ের কাজ করতে গিয়ে তার হাত সুঁইয়ের ফোঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। করমালীর সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাসিক্ত বেদনার্তি– 'আমি ছিঁড়া খাঁথায় গাও এলাইয়া দিয়া পথের পানে চাইয়া থাকি। সে তখন পরের বাড়ি খাঁথা সিলাই করে, আর সে সুঁইচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১২)। তাছাড়া মালোপাড়ার নারীরা যে বয়ন শিল্পে পটু এবং ঘরে বসেই সুতা বানিয়ে মাছ ধরার জাল তৈরি করে, এ প্রসঙ্গে আমরা দৃষ্টিপাত করেছি লোকপ্রযুক্তি প্রসঙ্গে আলাপকালে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের বিবরণ রয়েছে। দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী এ ব্রত পালন করে। ব্রতের অংশ হিসেবে বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকতে হয়। কিন্তু বাসন্তী এ কাজে অনভিজ্ঞ ও অপটু বলে প্রতিবেশী কিশোর ও সুবলকে দিয়ে তার মা আলপনা আঁকিয়ে নেয়। তারা হাতি, ঘোড়া ও পাখি আঁকে। একারণে বাসন্তী বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কারণ 'সারা মালোপাড়ার কারো উঠানে হাতিঘোড়া নাই; কেবল তারই উঠানে থাকিবে।

শিল্পীদের অপটু হস্তচালনার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বাসন্তী এক সময় খুশিতে হাসিয়া উঠিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)।

১২. লোকভাষা

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের মালো, কৃষক ও বেদে সম্প্রদায়ের লোকভাষা ফুটিয়ে তোলার সতর্ক প্রয়াস লক্ষণীয় কুশীলবদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত সংলাপে, কথোপকথনের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, বাগ্‌ধারা ও অলংকারাশ্রিত বাক্যবিন্যাসে। লেখক এতদঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে সম্যক অবহিত ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকভাষার বিশেষ মেজাজ, ভঙ্গি ও পরিসর এ উপন্যাসে একেবারেই বাস্তবানুগ রূপ পেয়েছে তাঁর লেখায়। বিশেষ ধরনের উচ্চারণ, দেহভঙ্গিমা এবং আঞ্চলিকতার প্রভাবজাত পরিবর্তিত উচ্চারণ কুশীলবদের আলাপে, বাগ্‌বিন্যাসে প্রতিফলিত হওয়ায় পাঠকের কাছে এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো ধরনের সন্দেহের উদ্রেক ঘটে না। এ ভাষাকে আশ্রয় করেই তাদের নিত্যদিনের ওঠাবসা ও বৈষয়িক কর্ম সম্পন্ন হয়। আবার একটি নির্দিষ্ট লোকসমাজের বিশেষ চারিত্র্যও লোকভাষাকে ভিত্তি করেই প্রামাণ্য রূপ পায়। লোকভাষায় নারী-পুরুষ ভেদে উচ্চারণ ও রূপগত ভিন্নতা, স্বতন্ত্র মনোবাস্তবতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটায় একে ভিত্তি করে সেই সমাজের স্বরূপ অনুধাবন করা চলে। পাশাপাশি, এ ভাষাকে ভিত্তি করে রচিত লোকসাহিত্যের ভান্ডারেও বিধৃত হয় সমাজভুক্ত বাসিন্দাদের সমষ্টিমানসের পরিচয়। তিতাসপাড়ের লোকভাষা যে অন্য অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা থেকে ভিন্ন, এবং এ ভিন্নতাকে যে লেখক যথাযথ গুরুত্বসহযোগে এ উপন্যাসে বাঙ্ময় করে তুলেছেন, তা বুঝে উঠতে আমরা কুশীলবদের শব্দভান্ডার ও বাগ্‌ধারা বিবেচনায় রেখেছি।

১৩.১ শব্দভান্ডার

এ উপন্যাসের আদ্যন্ত তিতাস-তীরবর্তী লোকসমাজে প্রচলিত দেশজ ও কথ্য, আঞ্চলিক শব্দরাশির প্রয়োগ ঘটেছে। এর কিছু শব্দের ব্যবহার শুধু মালো ও কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ উপন্যাসে বিবৃত বর্ণনার পাশাপাশি কুশীলবদের ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনহেতু এসব শব্দরাশির প্রয়োগ প্রাসঙ্গিক, যথাযথ; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিকল্পহীন।

বিশেষণ– চোরা, কাঙাল, তাতিয়া, উবু, সবুজিমা, পচা, নাদুসনুদুস, টুকটুকে, ছোবল, চওড়া, হলদে, টুকিটাকি, কোনাকুণি, ঢঙ্গী, গলানো প্রভৃতি।

ক্রিয়া– ভাঙ্গে, তাতায়, পাড়াইতে, সাঁতরাইতে, ফোলায়, মাতিয়াছে, ফসকাইয়াছিল, বাহিয়া, ডুবিয়া, টানিয়া, মাজে, কাচে, ঢালাইতেছে, ঠেলা, ঝিমাইতেছে, নেতাইয়া, ঠেকাইয়া, খেকাইয়া, এলাইয়া, গুটাইতেছে, চুবাইয়া, গুঁজিয়া, রসাইয়া, চাপিয়া, ঘসাইয়া, গুলাইয়া, খেলাইয়া, ঝুলানো, ভানিয়া, গুজরায়, প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– মরাই, ব্যাপারী, ছিপ, পাল, কাঁকন, বাঁশ, সাঁকো, ঠেলাজাল, কুটুম, নিকারী, গাঙ, ঠেলা, চিপা, ডোলা, খেউ, চুনো-পুঁটি, খানাডোবা, ডালা, ভিটা, জটা, প্যাঁচ, বেড়া, ছই, আল, ডিঙি, মাড়, ঘাস, ভূষি, খইল, জোকার, খরা, ঠেলা, মটকি, চরকি, টেকো, তকলি প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়– গম্ গম্, কনকনে, ঠন্‌ঠনে, ভুরভুরি, টগবগ, কিলবিল, ধুকধুকানি, ছপছপ, ছল্যাৎ, ঝপাঝপ, সাঁ সাঁ, তাতা থৈতৈ, ঠকাঠক, গুনগুন, গল গল, ঝা ঝা ঝম্‌ঝম্, ঠকাঠক, ধপাস্ ধপাস্, হিসহিস, ফিসফাস, দুরুদুরু প্রভৃতি।

দ্বিরুক্ত পদ– ছুঁইয়া ছুঁইয়া, নাচিতে নাচিতে, টিপিয়া টিপিয়া, খাঁ খাঁ, ধূধূ, টুকিটাকি, ভানতে ভানতে, ফকফক, ভেনভেন, হিস হিস, দড়াদড়ি, ঠনঠন প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– শুকিয়ে>শুখাইয়া, বিজন>বিজনা, লেজ>ল্যাজ, উঠে>উইঠ্যা, পরে>পিন্ধে, ঝগড়া>কাইজ্যা, ছিনিয়ে>ছিনাইয়া, সাঝি>নাইয়া, উড়ে>উইড়া প্রভৃতি।

১৩.২ বাগ্‌ধারা

ক. মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তখন তারা যায় বোধাইর বাড়িতে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০১)

খ. আমার ভাই অত কথায় কথায় শ্বাস পড়ে না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১২)

গ. সুবল 'মাথাতোলা' হইয়া কিশোরের নৌকায় গিয়া উঠিল। (অচিন্ত্য, ২০১১: ৪১৫)

ঘ. কোনো লাভ হইবে না বলিয়া ডাকাতের মন ভিজাইতে হইবে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)

ঙ. কিছুদিন আগে পিছে দুজনেরই নাও-জালে হাতেখড়ি হইল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)

চ. আরো সুবলা, তুই বুঝবি কি! তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া-লোকের উপর। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৭)

ছ. দেশদেশান্তরের মাছ, এই সব বিলে আসর জমায়। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৯)

জ. তোমাকে কি মধ্যে মধ্যে ভূতে ভর করে? (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৬)

ঝ. একদিন সে মুখে ফুলচন্দন পড়িল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৭)

ঞ. এই তো জগৎবেড় ফেলিয়াছে। এদিকে রাঘব-বোয়াল আছে মনের আনন্দে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)

ট. কি সোনার মানুষ গো দিদি কত আদর করে আমারে আর আনন্দেরে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)

ঠ. দশ সের সূতা লইয়া সে অথৈ জলে পড়িল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

ড. বিয়া হইল গগনের পুত সুবলার সাথে। সেই সুবলা মরল। ছেমড়ি তার নামের জয়ঢাক হইয়া রহিল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

ঢ. অ মহনের মা, আজ যে দেখি আঘাটাতে চন্দ্র উদয়। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

ণ. এই যে কানা মানুষ ... তিনি লোকের বিচার করিতে গিয়া 'শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ায়, জামাইর বিছানায় শাশুড়ী শোয়ায়'। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫১)

ত. কথা কি আর আমরা বুঝতে পারি না। হাঁ করতে আলাজিহ্বার টের পাই। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫২)

থ. তিন বিবাহের তিন ছেলের বাপড হইয়া শ্যামসুন্দর বেপারী যদি আবার বিবাহ করে তো পূবের চাঁদ পশ্চিমে উদয় হইবে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)

দ. সে নিজেও সব জানিয়া-শুনিয়া জড়ভরত হইয়া আছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭৯)

ধ. মালোদের পুরোহিত ডুমুরের ফুলের মত দুর্লভ। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৪)

ন. একেবারে হাতে-বৈঠা-ঘাটে-নাও অবস্থা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৫)

প. উপরওয়ালা ফেলিয়াছে চৌদ্দ সানকির তলায়, কাঁদিয়া কি করিব। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫০)

ফ. আগে নিজের ঘর সামলা। তারপর পরের তরকারিতে লবণ দিতে আসিস। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫০) বাগধারান অর্থযোগে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিভুক্ত উপাদানসমূহের ভান্ডারে সমৃদ্ধ কালজয়ী উপন্যাস। নিছক সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা হিসেবে এটি লিখিত হয়নি। বরং তিনি নিজে যেহেতু তিতাসপাড়ের মালো সম্প্রদায়ের বাসিন্দা ছিলেন, তাই এতদঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব, আন্তরিকতা এবং দায়বোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহের বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্য উপস্থাপনে। মালো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীজীবনের বিশিষ্ট গড়ন, বিস্তার ও ভাঙনের যে অনুপুঙ্খ চালচিত্র তিনি রূপায়িত করেছেন, তা মোটেই কল্পিত বা বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। বরং ব্যক্তিজীবনে আহরিত নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, তাদের সঙ্গে অন্তর্গত সম্পৃক্ততা এবং মানবিক মূল্যবোধের তাড়নাহেতু তিনি এখানকার লোকমানুষের চালচিত্রকে গ্রন্থনায় উজ্জীবিত হয়েছেন, যার প্রতিফলন এর আদ্যন্ত লক্ষণীয়। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ভান্ডারকে সফলভাবে শিল্পায়নের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা এক কথায় অনন্যরহিত। লোকমানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর এ কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত–

ক. তিতাসকে একসময় আমি বলেছিলাম 'নদীর পাঁচালী। ... আমি দেখতে পাই 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং তার স্রষ্টার অচ্ছেদ্য অন্বয়ের নিগূঢ় যোগাযোগকে। কোনও ব্যক্তি, তা সে তিনি যত বড়ো শিল্পীই হোন না কেন, বাইরে থেকে গিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখতে পারেন না। কাহিনী এবং কাহিনীকার দুজনকেই সেই সুনির্দিষ্ট জলমাটি হাওয়া থেকে, সেখানকার সংস্কার থেকে, বিশ্বাস থেকে, জীবন-জীবিকার ঘাম কাদা মেখে এবং ছেনে উঠে আসতে হবে। বিষয় ও ব্যক্তিগুলি দীর্ঘকাল ধরে তাঁর কাছে অপ্রত্যাখ্যেয় হয়ে থাকে, তার পরে তার প্রকাশ অনিবার্য হবে। তিতাসের সঙ্গে জড়িত, গ্রথিত জীবন এই উপন্যাসের বিষয়। (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুখপাত', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. অনুল্লেখিত)

খ. 'তিতাস একটি নদীর নাম' যখন প্রথম ধারাবাহিকভাবে মাসিক মোহাম্মদী-তে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তা সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পরে গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে বেশ সাড়া জাগায়। ১৩৬৩-তে প্রথম প্রকাশের পর এ গ্রন্থের বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে, হয়েছে এর কাহিনীর চিত্ররূপও। কাজেই ভূমিকায় প্রকাশক যে লিখেছিলেন– 'আমাদের বন্ধু অদ্বৈত দীর্ঘজীবী হয় নাই, হয়ত তাঁহার তিতাসের কাহিনী দীর্ঘজীবী হইবে।' ... লেখক আরো গ্রন্থ লিখেছিলেন, কিন্তু বোধ করি এই গ্রন্থেই তিনি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে দিতে পেরেছিলেন বলেই– 'অদ্বৈতের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে এই গ্রন্থটিই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তি' হতে পেরেছে। (গুণময় মান্না, 'অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, *পাণ্ডুলিপি*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৪)

গ. একটি উপন্যাস রচনা করেই শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থে যে-আন্তরিক মমতায় রূপায়িত হয়েছে তার তুলনা বাংলা কথাসাহিত্যে খুব বেশী নেই। দরিদ্র ধীবর পরিবারের সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে এক উপেক্ষিত সমাজের জীবন সংগ্রামের কাহিনীকে দিয়েছেন অবিনশ্বরতা। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল, উদ্ধৃত, শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, 'প্রসঙ্গ-কথা', পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত)

ঘ. 'তিতাসে'র মানবিক ও সার্বজনীন আবেদন এবং প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও এর স্থানীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ও স্বাক্ষর। তিতাসকে কেন্দ্র করে এই জনপদে যে কালচার ট্রেটের জন্ম হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণ প্রকাশিত এই উপন্যাসে। উদাহরণ হিসেবে তিতাস-কেন্দ্রিক নৌকা বাইচের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পর্বটি নৌকা বাইচের ওপর রচিত। এই পর্বটির শিরোনাম 'রাঙা নাও।' কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হচ্ছে, ঔপন্যাসিক এখানে নৌকা বাইচকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেননি। নৌকা বাইচের প্রস্তুতি থেকে পরিণতি পর্যন্ত পুরো বিষয়টির সঙ্গে ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের প্রবহমানতাকে যুক্ত করেছেন। ফলে একদিকে যেমন কাদিরের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্তের জীবনেরও নানা বাঁকের ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্ণিত অঞ্চলের সমস্ত প্রেক্ষাপট এসে মিলেছে ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে। তাতে নৌকা বাইচের সাংস্কৃতিকতা জীবনেরই ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নৌকা বাইচের সময় গীত গানগুলি আঞ্চলিকতাকে ধারণ করা সত্ত্বেও কিংবা সে কারণেই হয়ে ওঠে হার্দ্য উচ্চারণ। (শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮)

ঙ. এক ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কখনওই লেখা সম্ভব হতে পারে না, অন্তত 'তিতাস' গোত্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বলার বিষয়টি এখানে, উপন্যাস কাগজে-কলমে লেখার বহু আগেই তিনি একটি উপন্যাসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মহৎ কর্মের ক্ষেত্রে যেটা জরুরি। তিনি বহু আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন মালো জীবন আর সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে হয়ে উঠেছিলেন পারদর্শী। (দেবীপ্রসাদ ঘোষ, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : এক ভিন্ন প্রতিস্রোত*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৮)

চ. 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই মহৎ উপন্যাসখানি ও তার স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ একে অন্যের পরিপূরক। উপন্যাসখানিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে ব্যক্তিমানুষ অদ্বৈতকে ভাবতে কষ্ট হয়। আবার স্রষ্টা অদ্বৈতকে আমরা যদি স্মৃতিতে আড়াল করি তা হলে তিতাসের জল আর তার কূলের সভ্যতার এককালের ধারা ভুলতে বসি। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টা একাত্ম, অভিন্ন। একের অস্তিত্বের সঙ্গে অন্যের অস্তিত্ব মিশে আছে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। নেই বললেই চলে। ... তিতাস কূলের জীবন চর্যার শরিক অদ্বৈত। সেই জীবন চর্যাকে অমরত্ব দিয়েছেন, অর্থবহ করেছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসকে কেন্দ্রমূলে রেখে হয়েছে সেই কাজ। ... তিতাস ও অদ্বৈত মিলেমিশে অন্ত্যজ বাঙলার এক চলমান দলিল— অনন্তকালের চাকার আবর্তিত ইতিহাস। (মনোহর বিশ্বাস, *ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩)

ছ. তিতাস-তীরের গোকর্ণ গ্রামের যে-পাড়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের বেড়ে ওঠা, ভদ্রভাষায় তার নাম মালোপাড়া হলেও, সেটি 'গাবরদের পাড়া' বলেই বহুল পরিচিত। শ্রমজীবী অন্তেবাসী জেলে সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা থেকেই 'ভদ্র'লোকেরা এ নাম সৃষ্টি করেছেন। জন্মসূত্রে এই 'গাবরদের পাড়া'র লোক বলে অদ্বৈতের শৈশব-কৈশোর-যৌবন কী বিড়ম্বনা ও অসহায়তার মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। এই অবজ্ঞা আর বিড়ম্বনাই উত্তরকালে প্রাকৃত জীবনের কথান্যাস নির্মাণে অদ্বৈতকে অনুপ্রাণিত করেছে। কেবল তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসেই নয়, তাঁর আর

> সব প্রধান রচনাতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রাকৃত জীবন ও কৌম সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা। ... তাঁর জীবন ও সাধনার কেন্দ্রীয় প্রবণতাই হচ্ছে কৌমজীবনের অঙ্গীকার। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'তিতাস একটি নদীর নাম : জল ও জীবনের বিকল্প নন্দন', *লোকপুরাণ, জনসমাজ ও কথাশিল্প*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২৬–১২৭)

> জ. অদ্বৈত স্বাতন্ত্র্যের সাধনাকেই বড় করে দেখতে চেয়েছেন। বস্তুত, গোকর্ণ গ্রাম ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও তিতাস অঞ্চলের ভূমিপুত্র, তিতাসের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, নদীলিপ্ত জনপদের অভিজ্ঞতায় বিত্তবান ও আর্থিক দিক থেকে প্রবল পশ্চাৎপদ শ্রেণীর, মালো কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত, অদ্বৈত মল্লবর্মণের আত্মবিশ্বাস ও মৌলিকত্বের অভিজ্ঞানে বিশিষ্ট ধারণাই ... নিজেকে নিজের মতন করে গড়ে তোলায় প্রাণিত করেছে আর তারই ফসল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ... অদ্বৈত'র বড় হয়ে ওঠা, গড়ে ওঠা এই জেলে বা মালো জীবনের ভিতর থেকেই। তাই তাঁর তিতাস হয়ে ওঠে 'জেলে জীবনের মহাকাব্য'। জলমজুর জেলে মালো সম্প্রদায়ের মানুষ অদ্বৈত, প্রকৃত অর্থে, ব্রাত্য-জীবনের কথাকার। ... (এ) উপন্যাস অদ্বৈত মল্লবর্মণের অভিজ্ঞতার দলিল ... জীবন-অভিজ্ঞতাকে শিল্প-অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করে একটি অসামান্য সাহিত্যকর্ম উপহার দেওয়া তাঁর প্রতিভারই পরিচয়বহ। (শুভঙ্কর ঘোষ, 'ব্রাত্য জীবনের কথকতা : কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ', *কথাশিল্পের বহুমাত্রিকতা*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৯৫–৯৬)

২. সমালোচকদের অভিমত–

> ক. 'নবশক্তি'র সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেশ কিছু নিবন্ধ লিখেছেন, যেগুলিতে তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চার নিবিড় আগ্রহের পরিচয় বর্তমান। ... লৌকিক উপাদান উপন্যাসে যখন উপস্থাপিত হয় তখন তা সাধারণভাবে আঞ্চলিকতার অনুষঙ্গী হয়ে ওঠে। তিতাস একটি নদীর নাম-এ যেহেতু আঞ্চলিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তাই লোকজীবন প্রবাহের অন্তর্গত হয়ে এসেছে লোকসংস্কৃতির উপস্থাপনা। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি অদ্বৈতের দুটি মন কাজ করে গেছে : ১. সংগ্রাহক ও বিশ্লেষক-মন, আর, ২. সৃজনশীল মন। 'নবশক্তি'-তে প্রথম স্তরের আর তিতাস একটি নদীর নাম-এ দ্বিতীয় স্তরের অদ্বৈতকে খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লোকজীবন আসে গূঢ়তর তাৎপর্য অঙ্গীকার করে।" (অচিন্ত্য বিশ্বাস, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫, ১২৮–১২৯)

তিনি এ উপন্যাসে অদ্বৈতের সংগৃহীত বিভিন্ন গানকে সরাসরি ব্যবহারের একটি তালিকা দিয়েছেন। এসবের অন্তর্গত সাতটি গান এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

> খ. অদ্বৈত মল্লবর্মণ কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় হলেও লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক ও গবেষক হিসেবেও তাঁর অবদান কম নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছাব্বিশটি প্রবন্ধের মধ্যে আঠারোটি প্রবন্ধ বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। গ্রাম-বাংলা থেকে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান তিনি সংগ্রহ করে প্রবন্ধকারে 'নবশক্তি', 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ... কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক ও গবেষক হিসেবেই নয়, কথাসাহিত্যিক হিসেবেও অদ্বৈতের বিস্ময়কর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই উপন্যাস রচনার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল, যখন তিনি অবিভক্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি এই উপন্যাস রচনা করেন, তখন বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠে ত্রিপুরার গ্রাম থেকে সংগ্রহীত লোকসঙ্গীতগুলি সংযোজন করে উপন্যাসটিকে নতুন মাত্রা দান করেছেন। (মিলনকান্তি বিশ্বাস, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১১–১২)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মোট ছাব্বিশটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলোর অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। এ প্রসঙ্গে জানতে দ্রষ্টব্য : মিলনকান্তি বিশ্বাস, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : পৃ. ৪৮–৪৯

৩. অদ্বৈতের সুহৃদ সুবোধ চৌধুরী সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন–

> অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছিল মানুষ আর প্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর insight। এমনটি আমাদের ছিল না। আমরা দেখেছি দর্শকের মতো, ভালো হয়ত লেগেছে। তবে অদ্বৈত দেখেছেন শিল্পীর চোখে। তাঁর সত্তার সঙ্গে তিতাস ছিল মিশে। এটা পৃথক করতে পারেন নি তিনি, চানও নি। তাঁর উপর ছিল তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ... প্রথম যখন পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম– "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' আর কি তোমার বই মানুষ নেবে"? বলেছিলেন অদ্বৈত "সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা– রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা" আর কিছু বলেন নি। পরিচয়ের এই প্রত্যক্ষতাই ছিল তাঁর গৌরবের ভিত। (*অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, প্রকাশক শুভ রহমান, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৮–৯)

৪. এ উপন্যাসে লোকপুরাণ বিস্তৃত পরিসরে শৈল্পিক ভাষ্যরূপ পেয়েছে। মালো জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অদ্বৈত নিজ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক গড়ন ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যে আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ ও ঐতিহ্যকে তিনি জন্ম-পারিবারিক সূত্রে পেয়েছিলেন, তাকে অকৃত্রিমভাবে এ উপন্যাসে তিনি ধারণ করেছেন। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি আর সংবেদনশীল সামাজিক মানুষের নৈয়ায়িক অবস্থান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের সামগ্রিক জীবনচর্যা গ্রন্থনায়। তাই প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা নির্বাহ আর আদিম ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত মানুষের কৌমবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয় এ উপন্যাসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উপস্থিত। লোকপুরাণের বর্ণাঢ্য জগতকে তিনি মালোদের প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতা ও সমষ্টিচেতনার পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এ সম্পর্কে দুজন সমালোচকের তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত–

> ক. প্রধানত যে তিনটি পুরাণ সংস্কৃতি-জাত আখ্যান তিনি নির্বাচন করেছিলেন তা হলো মনসামঙ্গল গান, দ্বিতীয়টি রাধাকৃষ্ণ কথা এবং তৃতীয়টি তুলনায় আগের দুটির চেয়ে কম শিব-দুর্গা কাহিনী। বিশেষত উদাসীন দেবতা শিব, যিনি চাষ করেন, ভিক্ষে করেন, গাঁজা খান অথচ প্রলয়ঙ্কর মহাদেব কোথাও কোথাও প্রতীকের মতো এসেছেন। ... প্রবাস খণ্ডে যখন কিশোর আর সুবল নৌকা বেয়ে মেঘনা নদীর স্রোতে চলতে চলতে আর এক মালোপাড়ায় গিয়ে নোঙর গড়ল, সেই গ্রামে বিষ্ণু ভক্ত অনেকেই। 'কৃষ্ণমন্ত্রী'দের গ্রাম। যেখানে নিত্য বাক্যালাপে পাঁজি-কীত্তনের শুরু। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন, লোলিতাসখী শ্রীমতী রাধিকাকে নিয়েই গড়ে ওঠে এক রসের মানসকুঞ্জ। কিশোর ও সুবল নাম দুটি যেন এই গ্রামে এসে পূর্ণতা পেলো। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ শ্যামল কিশোর আর সখা সুবল। যেন আপনা থেকেই মূর্ত হলো কিশোর ও সুবলের মধ্যে। ... অদ্বৈত সেই গ্রামের দোল পূর্ণিমার বর্ণনা দিয়েছেন। ... বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহকথার মাধুর্য এই উপন্যাসে যেভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি তার লোকায়তিক রূপটি আরও অনেক জায়গাতেই পাই। এখানে উল্লেখ্য একটি কথা– বিষ্ণু বা কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও বাংলার লোকজীবনেরই অন্তর্গত হয়ে গেছে। যা একদা ছিল শিষ্ট সাহিত্য, তা প্রাচীন কালে যখন সমাজের সাহিত্য ছিল প্রধানত শ্রুতি বহির্ভূত, তখন লোকজীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে অনেক গভীরভাবে। তাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ব্রাহ্মণ্য নীতি শাসিত শিষ্ট সাহিত্য হলেও তা ভারতের লোকজীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। এই দিক থেকে দেখলে অদ্বৈতের উপন্যাসে এই উপাদানটি গৃহীত হয়েছে। পৌরাণিকতায় নয়, লৌকিকতায়। দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ডে 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' এবং 'রামধনু' অংশে আবার প্রধান হয়ে ওঠে শক্তিদেবতা কালী আর মনসা-কেন্দ্রিক পুজো। যে উপন্যাস জলধারার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হয় সে উপন্যাসে মনসামঙ্গলের স্মৃতি অনিবার্য। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অংশে আছে কালীপুজোর অনুষ্ঠানের বর্ণনা। 'রামধনু' অংশে আছে পদ্মাপুরাণ

পাঠ, জালাবিয়া এবং মনসাপূজার বিবরণ। এ সবই মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গ। (সুমিতা চক্রবর্তী, 'তিতাস একটি নদীর নাম : ভাষা ও প্রকরণ', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩–৩৪)

খ. তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের নানা স্থানে মিথিক অনুষঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মিথের সূত্র ধরে আলোচ্য উপন্যাসের ভিন্ন এক তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব। উপন্যাসের তলদেশে ক্রিয়াশীল আছে পৌরাণিক এক দ্বৈধের স্মৃতি। মালোর সন্তান 'জাউলার পোলা' অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাছে সে-দ্বৈধের স্মৃতি অজানা থাকার কথা নয়। অজানা যে নয়, তা বোঝা যায় ওই প্রত্ন-উৎসের পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখে। ক্ষত্রিয় পিতা আর বৈশ্য-মাতার মিলন থেকে কৈবর্ত বা মালোদের জন্ম। মহাভারত-এ আছে অন্য এক অনুষঙ্গ। রাজা শান্তনু বা মুনি পরাশরের মতো উচ্চ ও অভিজাত বর্গের সন্তান হয়েও স্বীকৃতির অভাবে মৎস্যজীবী বর্গ সমাজে ছিল উপেক্ষিত। কৈবর্তদের মাঝ থেকে ক্রমে দুটি শাখা সৃষ্টি হয়– হালিয়া দাস তথা চাষি, আর জালিয়া দাস তথা জেলে। পুরাকাহিনীতেও আছে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই দুই শাখার দ্বৈরথের কথা। বক্ষ্যমান উপন্যাসেও দেখা যায়, তিতাসের বুকে চর জেগে উঠলে তার দখল নিয়ে জেলেদের সঙ্গে চাষিদের বিরোধ বাঁধে এবং সে-বিরোধেই ক্রমে শেস হয়ে যায় জেলেরা। তিতাস-তীরের এই কাহিনীতে পুরাকাহিনীর প্রত্নস্মৃতি কী তাহলে অলক্ষ্যে উঁকি দেয়? ... অনন্তের পরিণতির দিক থেকেও পুরাকাহিনীর ভিন্ন এক অনুষঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। অনন্তের কাছে তিতাসের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন প্রবীণ তিলকচাঁদ, আর নদীর উৎসের ভিন্ন এক মিথকথা অনন্তকে শোনায় উদয়তারা– 'নদীর সির্জন হইয়াছে হিমাইল রাজার দেশে। সেই দেশে স্বর্গে-সংসারে মিলন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির মহারাজা সেই দেশে গিয়া তারপর হাঁটিয়া স্বর্গে গেল।' যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পশ্চাতেও আছে একই উৎস থেকে জাত দুটি গোষ্ঠীর ভয়াবহ যুদ্ধের প্রত্নস্মৃতি। মহাভারতের 'মৌষল পর্বে' ভয়াবহ যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল যদুবংশ। তিতাসের তীরে চাষি আর জেলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জেলেদের পরাভব ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া কী একালের 'মৌষল পর্ব' নয়? বিশেষত যখন দেখি, নব্য-যুধিষ্ঠির অনন্তও তিতাসের তীর ধরে যেতে চায় হিমাইল রাজার দেশে, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে স্বর্গলোকে। ... কেবল যুধিষ্ঠির নয়, উদয়তারা অনন্তকে শোনায় বেহুলার গল্পও– যুধিষ্ঠিরের মতো বেহুলাও উজান ঠেলে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিল স্বর্গে। বেহুলার গল্প শোনাতে শোনাতে উদয়তারা অনন্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল– 'তুই কি লখাই পণ্ডিত?' অনন্তের কাছে উদয়তারার কেন এই প্রশ্ন? অনন্ত কি লখিন্দরের মতোই পরিস্থিতির শিকার, উচ্চবর্গ-নিচবর্গের দ্বৈরথের পরিণাম? অনন্তের প্রতি উদয়তারার প্রশ্নের মাঝেই লুকিয়ে আছে আলোচ্য প্রতিবেদনের ভিন্ন এক মিথিক অনুবর্তন। ... কেবল উদয়তারার বয়ানেই নয়, এ উপন্যাসের নানা জায়গাতেই আছে পদ্মাপুরাণের কথা, বেহুলার কথা, আছে সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য-পাঠের কথা। উপন্যাসে যুধিষ্ঠিরের পুরাকথা উত্তরণের সংকেতগর্ভ, বেহুলার বৃত্তান্ত পুনরুজ্জীবনের প্রতিভাস। প্রথম গল্পস্রোত ধরে অনন্ত যাত্রা করে আরেক 'হিমাইল রাজার দেশ' শহরে, শিক্ষিত হতে; আর দ্বিতীয় স্রোত ধরে সে প্রত্যাবর্তন করে গোকর্ণ গাঁয়ে, মৃতকল্প অনন্তবালার খোঁজে। কিন্তু বিশ শতকের অনন্ত যুধিষ্ঠির নয়, নয় বেহুলাও–তাই কিছুই করতে পারে না সে; নিরাসক্তভাবে কেবল দেখতে পায় এ কালের 'মৌষল পর্ব' মালোকৌমের ধ্বংস ও বিনষ্টি। এভাবে দেখলে, একথা বলতেই পারা যায়, তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে পুরাণকথা বিনির্মাণের ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত। অদ্বৈতের অনন্ত প্রতিকল্পে যুধিষ্ঠির সঞ্চার করে উত্তরণের ইঙ্গিত, আর বেহুলা পুনরুজ্জীবনের সংকেত। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, *লোকপুরাণ, জনসমাজ ও কথাশিল্প*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১৪৩–১৪৪)

৫. সমালোচকের অভিমত–

বাংলাদেশের নদীনির্ভর জনগণের কতগুলো নিজস্ব সম্পদ আছে; এদের অন্যতম হলো লোকগান। লোকসঙ্গীত প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর জীবনের মহার্ঘ সম্পদ। নদী- নৌকা-মাঝি-এই

> তিনটি অনুষঙ্গে স্বতঃই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠের গান। তাইতো দেখা যায়, কোনো ঘাটে একরাতের জন্য আশ্রয়রত নানা নৌকা থেকে বিচিত্র সঙ্গীতের মূর্ছনা ধ্বনিত হয়। কোনো নৌকায় গাওয়া হয় মুর্শিদি-বাউল, কোনো নৌকায় বারোমাসি গান, কোনো নৌকায় চলে পুঁথিপাঠ, আবার কোনো নৌকায় থাকে কেচ্ছার আয়োজন। এছাড়া, ভাটির টানে নৌকা ভাসিয়ে মাঝিরা গায় ভাটিয়ালি কিংবা নৌকাবাইচের সময় বৈঠাপতনের সঙ্গে তাল রেখে সারিগান। ... নদী-নৌকা-জাল-নির্ভর মালোজীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে অদ্বৈত গানের ডালি দিয়ে সাজিয়েছেন এই উপন্যাসটিকে। ... তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গ, নানা ব্রতকথা, পূজা-পার্বণাদি এই উপন্যাসে সঙ্গীত নির্ভর হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পূর্ণ এবং আংশিক কলি নিয়ে মোট ৫৯টি গান ব্যবহার করেছেন। ... গানগুলোর অধিকাংশই মালোদের সামগ্রিক জীবনচর্যার সঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রাণের গভীর হতেই এই গানগুলোর উৎসারণ ঘটেছে। (হরিশংকর জলদাস, *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১–১৮৩)

৬. নাইয়র প্রথা সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে দ্রষ্টব্য : রাজিয়া সুলতানা, 'বাংলা সাহিত্যে নাইয়র-এর সামাজিক উৎস', *সাহিত্য বীক্ষণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ১৩১–১৩৯

৭. সমালোচকের অভিমত–

> 'তিতাসে'র মানবিক ও সার্বজনীন আবেদন এবং প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও এর স্থানীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ও স্বাক্ষর। তিতাসকে কেন্দ্র করে এই জনপদে যে কালচার ট্রেটের জন্ম হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণ প্রকাশিত এই উপন্যাসে। উদাহরণ হিসেবে তিতাস-কেন্দ্রিক নৌকা বাইচের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পর্বটি নৌকা বাইচের ওপর রচিত। এই পর্বটির শিরোনাম 'রাঙা নাও।' কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হচ্ছে, ঔপন্যাসিক এখানে নৌকা বাইচকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেননি। নৌকা বাইচের প্রস্তুতি থেকে পরিণতি পর্যন্ত পুরো বিষয়টির সঙ্গে ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের প্রবহমানতাকে যুক্ত করেছেন। ফলে একদিকে যেমন কাদিরের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্তের জীবনেরও নানা বাঁকের ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্ণিত অঞ্চলের সমস্ত প্রেক্ষাপট এসে মিলেছে ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে। তাতে নৌকা বাইচের সাংস্কৃতিকতা জীবনেরই ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নৌকা বাইচের সময় গীত গানগুলি আঞ্চলিকতাকে ধারণ করা সত্ত্বেও কিংবা সে কারণেই হয়ে ওঠে হার্দ্য উচ্চারণ। (শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮)

৮. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : ক. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৩ খ. প্রদ্যোত ঘোষ, *বাংলার লোকশিল্প*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪ গ. খগেশকিরণ তালুকদার, *বাংলার লোকায়ত শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭ ঘ. মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পাদিত), *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪।

৯. সমালোচক জানিয়েছেন–

> উপন্যাসে লোকায়ত জনগোষ্ঠীকে জীবন্ত করে তোলার পথে সর্বাধিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সংলাপের ভাষা। বিবৃতির ভাষায় লেখক নিজস্ব বাকশৈলী ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনে কিছু আঞ্চলিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিয়ে আসতে পারেন স্থানীয় বর্ণাভা। কিন্তু সংলাপের ব্যবহার ভিন্ন। সেখানে, যদি লেখকের জানাও থাকে সেই জন-গোষ্ঠীর মুখের ভাষা স্বরূপ, তবু তা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে সব সময় তিনি সক্ষম হন না। কারণ, সে ভাষা বোধগম্য হবে না তাঁর উপন্যাসের পাঠকদের। আবার পাঠক যে ভাষায় কথা বলে, সেই নাগরিক ও শিষ্ট চলিত বাংলাও ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তেমন হলে উপন্যাসের স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে না।

> মানুষগুলি হবে না জীবন্ত। ... অদ্বৈত মল্লবর্মণ কাজ করবার চেষ্টা করেন বিশেষ শব্দের প্রয়োগে, ক্রিয়াপদের বিশেষ ধরনের এবং স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে। ... অদ্বৈত মল্লবর্মণের মাতৃভাষাই ছিল সেই মালোপাড়ার ভাষা। কাজেই সমস্যা তাঁর কিছু ছিল না। (সুমিতা চক্রবর্তী, 'তিতাস একটি নদীর নাম : ভাষা ও প্রকরণ', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯–৪০)

সহায়কপঞ্জি

অচিন্ত্য বিশ্বাস (২০০৫)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*। রত্নাবলী, কলকাতা।

অচিন্ত্য বিশ্বাস *সম্পা.* (২০১১)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৩)। *বাংলার ব্রত*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

খগেশকিরণ তালুকদার (১৯৮৭)। *বাংলার লোকায়ত শিল্পকলা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দেবীপ্রসাদ ঘোষ (২০০৮)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : এক ভিন্ন প্রতিস্রোত*। গাঙচিল, কলকাতা।

প্রদ্যোত ঘোষ (২০০৪)। *বাংলার লোকশিল্প*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২)। *লোকপুরাণ, জনসমাজ ও কথাশিল্প*। নান্দনিক, ঢাকা।

মনোহর বিশ্বাস (২০০৩)। *ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা*। চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা।

মিলনকান্তি বিশ্বাস (২০১৪)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ *সম্পা.* (২০০৪)। *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়*। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

রাজিয়া সুলতানা (১৯৯৮)। *সাহিত্য বীক্ষণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শান্তনু কায়সার (১৯৯৬)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শুভঙ্কর ঘোষ (২০০২)। *কথাশিল্পের বহুমাত্রিকতা*। প্রতিভাস, কলকাতা।

শুভ রহমান [প্রকাশক] (১৯৯৯)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা।

সুশান্ত দাস *সম্পা.* (১৯৯৯)। *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*। পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

হরিশংকর জলদাস (২০০৮)। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মঞ্জু সরকারের ছোটোগল্প : নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতা

লোকমান কবীর*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের ছোটোগল্পে মঞ্জু সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর গল্প মূলত উত্তরবঙ্গের মঙ্গা বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত মানুষের জীবনাখ্যান। তবে জীবিকার্জনের জন্য শহরে বাস করা নিম্নবর্গের জীবনচিত্রও তাঁর গল্পের অন্যতম উপকরণ। তাঁর রূপায়িত নিম্নবর্গ ক্ষমতাকাঠামোয় প্রান্তিক, খাদ্যাভাবে ক্ষুধার্ত, উচ্চবর্গের নিপীড়নে বিপন্ন, দারিদ্র্যের পীড়নে বিপর্যস্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর বিপন্নতা আরও অধিক। উচ্চবর্গের নানা চাপে নিষ্পেষিত এসব নিম্নবর্গ কখনো প্রতিবাদী কখনো বা অপরাধপ্রবণ। নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতার বহুবর্ণিল চিত্রের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনে তিনি অর্জন করেছেন শৈল্পিক বিশিষ্টতা। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য মঞ্জু সরকারের গল্পে প্রতিফলিত নিম্নবর্গের জীবনের বিচিত্র চালচিত্রকে উন্মোচিত করা; এবং নিম্নবর্গের জীবন রূপায়ণে লেখকের দক্ষতা বিচার করা।]

নিম্নবর্গ প্রত্যয়টি মূলত উচ্চবর্গের সঙ্গে ক্ষমতাকাঠামো দ্বারা সম্পর্কিত। সাধারণত উচ্চবর্গের তুলনায় ক্ষমতাকাঠামোর নিম্নে থাকা শ্রেণিকে বলা হয় নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গ শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয় ইতালীয় 'সুবলতের্নো' এবং ইংরেজি 'সাবঅল্টার্ন' (Subaltern) শব্দের পরিভাষা রূপে। ইংরেজি 'সাবঅল্টার্ন' শব্দটির বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায় সামরিকবাহিনীর ক্ষেত্রে। সেখানে ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদেরকে বলা হয় 'সাবঅল্টার্ন'। "তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত " (পার্থ, ২০০৮ : ২)। আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) *প্রিজন নোটবুকস* (১৯৫০) গ্রন্থে সর্বপ্রথম নিম্নবর্গ (সুবলতের্নো) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মুসোলিনির কারাগারে বন্দি থাকাকালে (১৯২৯-১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) মার্কস কথিত প্রোলেতারিয়েত শ্রমিক শ্রেণিকে নিম্নবর্গ হিসেবে উল্লেখ করেন (মেহেদী, ২০০৮ : ১৮)। নিম্নবর্গের ঠিক বিপরীতেই তিনি 'হেজেমনিক' বা আধিপত্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণির অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন। তবে গ্রামশি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ছাড়াও, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বে নিম্নবর্গ শ্রেণির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রামশির রচনায় বিশ শতকের শুরুর দিকে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে সামন্ত শ্রেণি কর্তৃত্ব ও কৃষক শ্রেণির অধীনতার সাধারণ চরিত্রই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি আধিপত্য ও অধীনতার বৈশিষ্ট্য সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে এক প্রান্তে অবস্থান করে প্রভুত্ববিস্তারকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি, আর তার বিপরীত মেরুতে বাস করে তাদের অধীন 'সাবঅল্টার্ন' শ্রেণি (পার্থ, ২০০৮ : ৩)। গ্রামশির ব্যবহৃত বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে প্রেরণা নিয়ে 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব হলেও ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসকে উপজীব্য করেই এই ধারণার প্রয়োগ ও বিস্তার ঘটেছে। এমনকি মার্কসবাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার জায়গায় প্রশ্ন তুলেই নির্মিত হয়েছে নিম্নবর্গ ধারণার প্রেক্ষাপট।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে নিম্নবর্গের ধারণা মার্কসবাদীদের উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণার বিকল্প কোনো ধারণা নয়, বরং ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের প্রয়োজনে, শ্রেণিদ্বন্দ্বের অসমান্তরাল বিকাশকে চিত্রিত করার জন্য এটি হচ্ছে উৎপাদনসম্পর্কের সম্পূরক ধারণা। (পার্থ, ২০০৮ : ৭) তাই নিম্নবর্গের ধারণা নির্মিত হওয়ার কারণে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির কয়েকটি নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচিত হয়েছে।

রণজিৎ গুহ 'সাবঅল্টার্ন'-এর বাংলা পরিভাষা রূপে 'নিম্নবর্গ' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন । (পার্থ, ২০০৮ : ২) তাঁর দেওয়া তথ্য ও যুক্তি থেকে জানা যায়, ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তা উচ্চবর্গের দ্বারা লিখিত ইতিহাস। সেখানে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দৃশ্যমান এবং নিম্নবর্গের অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি-ধর্মচেতনা ইত্যাদির অন্তর্গত স্বরূপ উপেক্ষিত। ফলে দেখা দেয় নিম্নববর্গের স্বতন্ত্র ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা। সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তীর মতে নিম্নবর্গের এই ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য হলো, "To make the subaltern the sovereign subject of history, to listen to their voices, to take their experience and thought" (Dipesh, 2000 : 102)।

তবে নিম্নবর্গের এই ইতিহাস নিম্নবর্গ নিজে লিখতে পারেনি। এই ইতিহাসচর্চাও শুরু হয়েছে শিক্ষিত উচ্চবর্গের মাধ্যমে। এ কারণে উচ্চবর্গের লিখিত ইতিহাসে নিম্নবর্গের সঠিক ইতিহাস উঠে আসতে পারে কি-না, সে বিতর্ককে সামনে রেখে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'Can the Sualtern Speak?' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গ নিজের কথা নিজে না বলতে পারলেও কিংবা ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচিত না হলেও, সময়ের প্রয়োজনে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে। তিনি প্রবন্ধটির শেষাংশে বলেছেন : If, in the context of colonial prodution, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow (Gayatri, 1988 : 28)।

গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রত্যাশা করেছিলেন নিম্নবর্গের এমন এক ইতিহাস, যেখানে তাদের 'কথা' উঠে আসবে গুরুত্বের সঙ্গে। রণজিৎ গুহ ও অন্যান্য তাত্ত্বিকরা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা শুরু করলে গায়ত্রী চক্রবর্তীর অভীপ্সা বাস্তবে রূপ নেয়। রণজিৎ গুহদের নিম্নবর্গ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস যেমন আলোর মুখ দেখে, তেমনি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিচিত্র দিক সম্পর্কেও জানা যায়।

গ্রামশির মতো রণজিৎ গুহও নিম্নবর্গের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য অধীনতা ও আধিপত্য, এই বিপরীত যুগ্মপদকে গ্রহণ করেছেন। নিম্নবর্গ সবসময় উচ্চবর্গের অধীন এবং উচ্চবর্গ আধিপত্য বিস্তারকারী শ্রেণি। এমনকি বিদ্রোহকালেও নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের অধীনেই থাকে। রণজিৎ গুহ ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে দেশি-বিদেশি-সরকারি-বেসরকারি প্রভুশক্তিকে উচ্চবর্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এই কর্তৃত্ববাদী উচ্চবর্গের বাইরে সকল ব্যক্তি কিংবা 'সমূহ'কে বিবেচনা করেছেন নিম্নবর্গ হিসেবে। ফলে দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব 'জনতা', আদিবাসী, নিম্নবর্ণ, এমনকি নারীরাও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

নিম্নবর্গের ইতিহাস সাম্প্রতিককালে চর্চিত হলেও, বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটোগল্পকারদের গল্পে নিম্নবর্গের জীবনচিত্রকে নানা বর্ণে ও রেখায় চিত্রিত হতে দেখা যায়। মঞ্জু সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ গল্পেই নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য প্রাধান্য পেয়েছে। জন্মস্থান রংপুরের নিম্নবর্গকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন খুব কাছ থেকে। তাই এই অঞ্চলের দরিদ্র-দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রান্তিক মানুষ তাঁর মূল উপজীব্য। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের জীবনকে কেন্দ্র করেও রচনা করেছেন অনেক শিল্পসফল ছোটোগল্প। এসব গল্পে শিল্পিত হয়েছে নিম্নবর্গের জীবনের বিচিত্র প্রান্ত ও প্রবণতা।

নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা : দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-দীর্ণতা ও অধীনতার চিত্র

নিম্নবর্গের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এবং সামাজিকভাবে উচ্চবর্গের নিকট অসম্মানের পাত্র। এই অর্থনৈতিক দৈন্য ও সামাজিক অধস্তনতা তাদেরকে পরিণত করে উচ্চবর্গের অধীন শ্রেণিতে। আবার অর্থনৈতিক অসামর্থ্য তাদেরকে অনেক সময় করে তুলে দুর্ভিক্ষপীড়িত। মঞ্জু সরকারের ছোটোগল্পেও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল, দারিদ্র্যজীর্ণ নিম্নবর্গের অধীনতার বহুমাত্রিক দিক পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রাম ও শহর–উভয় অঞ্চলের নিম্নবর্গের জীবনচিত্রকে ধারণ করলেও মঞ্জু সরকারের গল্পে মূলত গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনযুদ্ধের শক্তিশালী চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের দুর্ভিক্ষকালীন জীবনবাস্তবতার নান্দনিক উপস্থাপনে তিনি অর্জন করেছেন শৈল্পিক বিশিষ্টতা। মঞ্জু সরকারের জন্মস্থান রংপুর ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন জেলায় নিম্নবর্গের মৌসুমি দুর্ভিক্ষ 'মঙ্গা' নামে পরিচিত। মৌসুমী বেকারত্ব ও খাদ্যসংকটের ফলে সৃষ্ট মঙ্গার কারণ ও রংপুরের গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনে এর বিধ্বংসী প্রভাবের বহুবর্ণিল চিত্র মঞ্জু সরকারের গল্পের প্রাণশক্তি জোগায়। ১৯৭৯ সালে রংপুরের এক দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আনু মুহাম্মদ বলেন :

> রংপুরের লোকসংখ্যা প্রায় ৫৮ লাখ। এর মধ্যে শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ ভূমিহীন দিনমজুর। এখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প না থাকার ফলে এদের প্রায় সবাইকেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। কাজেই প্রতিবছরই এদেরকে মৌসুমী বেকারত্বে পতিত হতে হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাস এমনই দু'মাস যে দু'মাসে প্রথাগত নিয়মে কৃষিতে কাজ থাকে না যার ফলে ভূমিহীন যারা তারা নিজেদের ক্রয়ক্ষমতা সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলে। ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ এবং বার্ষিক সংকটে হারানোর পর অবশিষ্ট সম্পদও অনেকে (ঘর ভিটে, বাসনকোসন ইত্যাদি) এবার হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। এদের মধ্যে সৌভাগ্যবান অংশ কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে নিজেকে কোন রকমে ধরে রাখে, বাকিরা দিনের পর দিন অনাহারে থেকে পরবর্তী সময়ে কাজের ক্ষমতাও হারাতে থাকে এবং অতিষ্ঠ হয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অবাধে মৃত্যুবরণ করে। প্রথমে বৃদ্ধ, শিশু, তারপর অকালবৃদ্ধ নারী পুরুষ। (আনু, ১৯৭৯ : ৬৭-৬৮)

মঞ্জু সরকার রচিত 'প্রিয় দেশবাসী' গল্পে আনু মুহাম্মদের প্রতিবেদনের মতোই মঙ্গার বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়ে বৃদ্ধ আমানুল্লাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হতে দেখি। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ আমানুল্লার স্বজনদের স্বার্থপর ও আত্মসর্বস্ব হতে বাধ্য করেছে। তাই মুমূর্ষু ও অচেতন আমানুল্লাকে মৃত ভেবে, শোকার্ত হওয়ার পরিবর্তে, তার নাতিরা আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, উপার্জনে অক্ষম, অন্ন ধ্বংসকারী একজন ব্যক্তি তাদের সংসার থেকে কমে গেল। ফলে আমানুল্লার নাতিরা নির্দ্বিধায় বলতে পারে : "ও বুড়া মইলে তো ন্যাটা যায়" (মঞ্জু, ২০০৯ :

৭)। কিন্তু অচেতন আমানুল্লার মৃত্যু হয় না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের সুখস্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আমানুল্লা বেঁচে যায়। তিস্তাপাড়ের লোকালয়ে জনসভা করতে এসে, কালো চশমা পরিহিত হাস্যোজ্জ্বল রাষ্ট্রপতি, আমানুল্লাকে ক্ষণিকের জন্য আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিলেন। ফলে সে সময় গ্রামবাসীর কাছে বেড়ে গিয়েছিল তার সামাজিক সম্মান। কিন্তু গ্রামবাসীর কাছে সাময়িক সম্মানবৃদ্ধি আমানুল্লার দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। এমনকি গল্পের শেষে গ্রামের মেম্বারের কাছে দশ টাকা ধার চেয়েও সে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপর ক্ষুধার্ত-দুর্বল আমানুল্লা বাড়ি ফেরার পথে যখন পানি-ভরা ধানক্ষেতে পড়ে গিয়ে বিপন্ন বোধ করে, তখনও তাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসে না। বাঁচার জন্য আমানুল্লা যখন আর্তচিৎকারে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তোলে, তখনও রেডিওতে প্রচারিত হয় রাষ্ট্রপতির প্রতিশ্রুতিময় ভাষণ। এই দৃশ্য প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভণ্ড উচ্চবর্গ মিথ্যা আশ্বাসের মরীচিকায় নিম্নবর্গকে শুধু মোহগ্রস্তই করে; তাদের জীবন বাঁচাতে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

'কার্তিকের অতিথি' গল্পে কার্তিক মাসের মঙ্গায় কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয় মনতাজ। কিন্তু কাজ না পেয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে হয় তাকে। গ্রামের স্টেশনে নামার পর বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠার অপরাধে মনতাজের শেষ সম্বল কয়েকটি টাকা আত্মসাৎ করে স্টেশনের টিকিটচেকার। নিঃস্ব-রিক্ত মনতাজ বাড়ি ফিরে দেখতে পায় দুর্ভিক্ষপীড়িত রুগ্ন স্ত্রী-সন্তানের কঙ্কালসার দেহ, ছিন্ন বস্ত্র। অভাবের তাড়নায় কন্যা আছিয়া সম্ভ্রম বিক্রি করলেও, স্ত্রী-কন্যার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণে ব্যর্থ মনতাজকে বাস্তবতা মেনে নিয়ে প্রতিক্রিয়াহীন থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও 'টেস্ট রিলিফের' গম পাওয়ার মধ্য দিয়ে মনতাজের মতো নিম্নবর্গের মানুষকে মঙ্গা মোকাবেলার উপায় খুঁজে নিতে হয়। মঞ্জু সরকারের অন্যান্য গল্পে শরৎ ও হেমন্তকালীন দুর্ভিক্ষের চিত্র বিধৃত হলেও 'ভূতের সাথে যুদ্ধ' গল্পে বর্ষাকালীন মঙ্গার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মফিজ মাছ ধরার কাজে সমগ্র গ্রামের মধ্যে সুদক্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। "মাছের সাথে এমন নিবিড় সম্পর্কের কারণে গ্রামে তার নামকরণ হয়েছে মাছুয়া মফিজ" (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ২)। সে বর্ষার মঙ্গায় অসুস্থ স্ত্রীর ওষুধ জোগাতে ব্যর্থ। তিনদিন ধরে সপরিবারে অর্ধাহারে থাকা মফিজ প্রচুর মাছ ধরে, কিন্তু তা বাজারে বিক্রি করে মাত্র আধাসের আটা কিনতে পারে। কারণ মঙ্গার শিকার দরিদ্র মানুষ যেখানে ক্ষুধা নিবৃত্তির মতো ন্যূনতম খাদ্য কিনতে পারে না, সেখানে মাছ কিনতে যাওয়া তাদের কাছে বিলাসিতারই নামান্তর। অভাবের কারণে গ্রামের দেওয়ানের শহরবাসী মেয়ে-জামাইয়ের দাসী-বাদীর কাজ করতে বড় মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয় সে। "খেতে দেবে, পরতে দেবে, সময় হলে একটা বিয়েও যেন দেয়– এই বাড়তি অনুরোধটুকু করার পর মেয়েকে বড়লোক শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর মতোই নিশ্চিন্ত হয়েছে মফিজ" (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ২–৩)। ছোটো মেয়ে ও ছোটো ছেলেকে নিয়ে অনাহারে থাকার পর অনন্যোপায় হয়ে দুর্বল শরীরেই তাকে চরক বিলে মাছ ধরতে যেতে হয়। মাছ ধরতে যাওয়ার পর তীব্র বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায় জীবনীশক্তি কমে যাওয়ায় মফিজ বিশ্বাস করে অদৃশ্য কোনো ভূত তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। "যে ভূত অদৃশ্য-অস্পৃশ্য, হয়তো বা অস্তিত্বহীনও, তারই সঙ্গে অসম মোকাবিলায় এবং পরিণতিতে তোয়াজ-তোষণে অক্ষম দারিদ্র্যের নিরুপায় আত্মসমর্পণের কথকতাই গল্পটিতে রূপকার্থিক ব্যঞ্জনায় প্রতিভাসিত" (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৩৯০)।

মঞ্জু সরকারের *মৃত্যুবাণ* গ্রন্থের 'গ্রাস' গল্পেও দরিদ্র দিনমজুরের দুর্দশা ও বিড়ম্বনার চিত্র বিম্বিত হয়েছে। গল্পটিতে একসময়ের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি আকিমুদ্দি ভরসা বিলাসী জীবনযাপন করতে গিয়ে পরিণত হয় নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ নিম্নবর্গে। কিন্তু চালচলনে উচ্চবর্গের আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য সে দরিদ্র ছেলেদের সঙ্গে দিনমজুরের কাজ করতে সে অস্বীকৃতই হয় না, তাদেরকে 'চাষা-ভুষা' বলেও ভর্ৎসনাও করে। উচ্চবর্গের আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য সে অভাব সত্ত্বেও পুরোনো চা খাওয়ার অভ্যাসটা ধরে রাখে। কিন্তু উচ্চাভিলাষী জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় অকিমুদ্দি ভরসা স্ত্রী-সন্তান কাউকেই না জানিয়ে গোপনে চেয়ারম্যানের কাছে জমি বিক্রি করে। এরপর অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা ভরসা খুন হলে, পুলিশ এসে খুনের দায়ে মৃত ভরসার ছেলেদেরকেই গ্রেফতার করে। উচ্চবর্গশাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় ক্ষমতাকাঠামোর উপরের স্তরের পুলিশ ও চেয়ারম্যান একে অপরেরর সহযোগিতায় নিম্নবর্গের ওপর তাদের আধিপত্যকে সক্রিয় রাখতে পেরেছে।

'আবরণ' গল্পের খালেক মিয়াও আকিমুদ্দি ভরসার মতো জাত্যাভিমানী ও আত্মপ্রতারণাকারী নিম্নবর্গ। সমাসন্ন মঙ্গাতেও বাড়ির লুপ্ত বংশগৌরবকে সর্বান্তকরণে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট সৈয়দ বংশজ এই নিঃস্ব সন্তান। তবে যতই বংশগৌরব রক্ষার প্রচেষ্টা চালাক না কেন দর্জির পেশায় নিয়োজিত থাকায় গ্রামবাসীদের কাছে তার নাম খালেক মিয়া থেকে খালেক খলিফায় রূপান্তরিত হয়। সেলাই মেশিন কেনার সামর্থ্য না থাকায় মাসিক একশ টাকা ভাড়া দিয়ে গ্রামের 'নব্য ধনী' নজব মণ্ডলের সেলাই মেশিন ব্যবহার করে এবং তার দোকানে বসে অন্যের জামা-কাপড় সেলাইয়ের সুযোগ পায়। "মঙ্গার দুঃসহ পীড়ন এবং অন্নবস্ত্রাভাব সত্ত্বেও জাত্যভিমানী খালেক পর্দা, সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষার আত্মপ্রতারণায় অস্তিত্বকামী" (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৩৯২)। কিন্তু গল্পের উপান্তে একটি নতুন শাড়ির বিনিময়ে নজব মণ্ডলের সঙ্গে স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ককে আবিষ্কার করে খালেক মিয়া। এরপর নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে তার সম্ভ্রম ও বংশগৌরব রক্ষার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়। বস্তুত মঙ্গার সর্বগ্রাসী পীড়নে পরাজিত ও ক্ষত-বিক্ষত সদ্‌বংশের গৃহস্থের 'জায়াজীবী'তে পরিণত হওয়ার মর্মান্তিক চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে গল্পটিতে।

কার্তিকমাসী মঙ্গা কীভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষকে শহরমুখী করে তোলে তার উজ্জ্বল উদাহরণ মঞ্জু সরকারের 'দুর্গত অঞ্চলের দেবতা'। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নঈমদ্দি অভাবের কারণে জমিজমা বিক্রি করা নিম্নবর্গ। প্রথমে ভূমিহীন দিনমজুর, পরে ভ্রাম্যমাণ দোকানদারি করেও মঙ্গার বিভীষিকাকে দূর করতে পারে না সে। তাই তাকে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে মঙ্গা মোকাবিলার উপায় খুঁজতে হয়। কূটকৌশলের মাধ্যমে গ্রাম্য গৃহবধূ ও শিশুদের কাছে অল্প দামের মনোহারি জিনিস অধিক দামে বিক্রি করার পদ্ধতি বের করলেও, মঙ্গার কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় তার দোকানের উপযোগিতাও অবশিষ্ট থাকে না। ফলে কন্যা নসিফাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শহরে কাজ করতে পাঠায় সে, নিজেও শামিল হয়ে যায় ত্রাণসন্ধানী মানুষের দলে এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে গ্রামের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সপরিবারে রওনা দেয় শহরের উদ্দেশ্যে। এভাবেই দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রলয়ে বিপর্যস্ত হয়ে নঈমদ্দির মতো গ্রামীণ নিম্নবর্গরা জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হতে বাধ্য হয়।

মঞ্জু সরকারের 'রাঘব বোয়ালের খাদ্য' গল্পের ওসমান নদীভাঙনে নিঃস্ব একজন গ্রামীণ নিম্নবর্গ। সে এতটাই দরিদ্র যে, স্ত্রীর মৃত্যুতেও কাফনের কাপড় কেনার ক্ষেত্রে তাকে আমরা সামর্থ্যহীন

ও অক্ষম ব্যক্তিরূপে আবিষ্কার করি। তবে গ্রামবাসীর কাছে কাফনের কাপড় কেনার জন্য সাহায্য তুললেও অভাবের তাড়নায় স্ত্রীকে বিনা কাফনে কবর দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করতেও তার বিবেকে বাঁধে না। বড়ো আকৃতির বোয়াল মাছ ধরে বিক্রি করার আশায় সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে যায়। ছোটোমাছকে খাদ্যটোপ বানিয়ে রাঘব বোয়াল শিকারের আশায় নদীতে যাত্রাপথে ক্ষুধার্ত দুই ছেলেকে বুকে ও কাঁধে নিয়ে হাঁটার সময় সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। "তিনটি প্রাণীর ক্ষুধার ভার দু'টি পায়ে ভর করায় ওসমানের পা টলে। আরো দ্রুত হাঁটতে চায় সে। কিন্তু কোথায় গেলে, কোনদিকে হাঁটলে দ্রুত মুক্তি পাবে? ওসমান তা জানে না। হঠাৎ তার মনে হয়, রাঘব বোয়ালের খাদ্য এঁদো ডোবার চ্যাং মাছগুলো পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সন্তানসহ তাকে কেউ যেন অদৃশ্য থেকে বড় বড়শিতে গেঁথে বন্দী করে ফেলেছে, এক্ষুণি ভয়ঙ্কর মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে ফেলবে" (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ৮৫)। রাঘব বোয়াল-শিকারী ওসমানের মতো নিম্নবর্গের মানুষ এভাবেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের আক্রমণে বিপদাপন্ন হয়ে যায় বলেই দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ ক্ষুধাকে লেখক এই গল্পে তুলনা করেছেন রাঘব বোয়ালের সঙ্গে, আর ওসমানের মতো মানুষকে তাদের খাদ্য রূপে।

নিম্নবর্গের করুণ-কঠোর-বিপন্ন-বেদনার্ত বাস্তবতার নান্দনিক শিল্পরূপ লক্ষ করি মঞ্জু সরকারের 'দুশমন' গল্পে। এই গল্পের নায়ক হাকিমুদ্দি হতদরিদ্র কৃষক। "প্রথম যৌবনে দেওয়ানীর পরামর্শ মতো সম্পত্তি নিয়ে বোন-ভগ্নিপতির বিরুদ্ধে মামলা করেছিল সে। সেই মামলা থেকেই তার কপালভাঙার সূচনা" (মঞ্জু, ১৯৯০ : ২৯)। জমি বন্ধক রেখে হালের গরু কিনতে গিয়ে সুচতুর দালালের কাছে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা এই 'কপালভাঙা' নিম্নবর্গ চাষির জন্য যেমন বেদনাদায়ক, তার চেয়েও মর্মন্তুদ স্বার্থান্ধ হয়ে রাতের অন্ধকারে জমি বিক্রির টাকা চুরি করার জন্য পুত্র হবির চুপি চুপি হাকিমুদ্দির ঘরে প্রবেশ। তারপর অন্ধকারে ভুলক্রমে দুশমনের অনুপ্রবেশ মনে করে দা দিয়ে কুপিয়ে পিতা হাকিমুদ্দি কর্তৃক পুত্র হবিকে খুন করার ঘটনা গল্পে সৃষ্টি করে ট্রাজেডির আবহ। পিতা-পুত্রের জীবনে সংঘটিত এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে সৃষ্ট তাদের স্বার্থসচেতনতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অমোঘ নিয়তিকেই দায়ী করা যায়।

নাগরিক নিম্নবর্গের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং নষ্ট মানুষের রোষানলে পড়ে সংকটাপন্ন অবস্থার চিত্র রূপায়িত হয়েছে মঞ্জু সরকারের 'উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা' গল্পে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বাচ্চু। সে গুলিস্তান হকার্স মার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নূর মোহাম্মদ ঠাণ্ডুকে 'নগদ তিরিশ হাজার টাকা সেলামি' দিয়ে ছোট্ট একটি দোকান বরাদ্দ পায়। যদিও হকার্স মার্কেট সরকারি জায়গা, তবুও ঠাণ্ডুকে চাঁদা দিতে হয়। কেননা, "গুলিস্তান এলাকার দোকানদার, পকেট-মার, ছিনতাইকারী, কালোবাজারী, থানা-পুলিশ সবাই তাকে চেনে, ভয়ও পায়। কারণ ঠাণ্ডু সরকারি পার্টিতে যোগ দিয়েছে, মন্ত্রীর সঙ্গে মাখামাখি, রাষ্ট্রপতিও নাকি তাকে মাঝেমধ্যে ডাক দেয়" (মঞ্জু, ১৯৯০ : ৪৯)। ফুটপাতের হকার থাকাকালে 'পুলিশ ও বৈরী প্রকৃতির' কারণে বারবার ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ হতে হতো তাকে। কিন্তু হকার্স মার্কেটে দোকান নেওয়ার পরও তার মন থেকে উচ্ছেদের ভয় দূর হয় না। কারণ নতুন দোকান থেকে যে-কোনো সময় মার্কেটের সরকার-সমর্থিত সভাপতি ঠাণ্ডু যেমন তাকে উচ্ছেদ করতে পারে, তেমনি ক্ষমতার পালাবদল হলে মার্কেটের পরবর্তী নেতৃত্বও তাকে দোকানচ্যুত করতে দ্বিধা করবে না। বাচ্চুর জীবনে

বিপর্যয় নেমে আসে যখন চাঁদা দেওয়ার সময় সে মার্কেট কমিটির ক্যাশিয়ারকে হাসতে হাসতে বলে ফেলে :

> চাঁদার টাকায় আপনাদের খালি ভুঁড়ি ফোলে, ইলেকট্রিক বিলের লাখ লাখ টাকা পইড়া থাকে কেন? মানুষ মেলা কথা কয়, ওস্তাদরে কন না, একটা মিটিং ডাইকা বছরের হিশাবটা সবারে দিয়া দেউক। (মঞ্জু, ১৯৯০ : ৫৪)

বাচ্চু ভুলে গিয়েছিল যে সে ঠাণ্ডুদের মতো আধিপত্যশীল উচ্চবর্গের অধীন সামান্য নিম্নবর্গ। ঠাট্টাচ্ছলেও উচ্চবর্গের দুর্নীতির কথা বলাটা ক্ষমতাবান উচ্চবর্গের কাছে অপমানজনক ও গর্হিত কাজ। তাই শেষপর্যন্ত ঠাণ্ডুদের রোষানলে পড়ে তাকে দোকান থেকে উচ্ছেদ হতে হয় এবং ঠাণ্ডুর সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণে হতে হয় রক্তাক্ত। মঞ্জু সরকারের 'আমৃত্যু আকালু' ভূমিহীন উদ্বাস্তু দিনমজুর আকালুর জীবনের মর্মান্তিক উপাখ্যান। গল্পটি প্রকরণগত দিক থেকেও অভিনব। এই গল্পে প্রবন্ধসদৃশ বিভিন্ন উপশিরোনামের মাধ্যমে কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নদী-ভাঙনের ফলে সর্বস্ব হারিয়ে আকালু বাঁধসংলগ্ন স্থানে ঘর তোলে সস্ত্রীক বসবাস করে। তবে রাতে বাঁধের উপরে ঘুমাতেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এক "মধ্যরাতে অচেনা দুই পথিক আকালুর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে, ফিসফাস স্বরে আকালুর কাছেই জানতে চায়, আকালুর বউ কোন ঘরে থাকে?" (মঞ্জু, ২০০১ : ১৪৫) সহজ-সরল আকালুকে এই অপরিচিত দুই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে এবং আকালুর সামনেই পানি খাওয়ার ছলে তার স্ত্রী তিস্তা বিবির সম্ভ্রমহানির উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু তিস্তা বিবির সাহসী প্রতিরোধের কারণে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বিভ্রান্ত-বিহ্বল আকালুকে নিষ্ক্রিয়তা ও হঠকারী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করায়, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে আকালু। এরপর আত্মরক্ষাকামী স্ত্রীর ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে গিয়ে আকালুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়–যা নিম্নবর্গের বিপন্নতার ভিন্নতর দিককে পরিস্ফুট করে। আকালুর আচরণে আমরা নিম্নবর্গের সেই পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বকে আবিষ্কার করি, যারা সমাজের সবার কাছ থেকে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয়ে তাদের সমস্ত আক্রোশ প্রয়োগ করে স্ত্রীর ওপর। আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গের অন্যায় এরা সহ্য করে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার জন্য, কিন্তু স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত যুক্তিও এদের কাছে অসহনীয়। ফলে আকালুর মতো নিরীহ মানুষও নির্দ্বিধায় স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে। তবে সংগ্রামী ও প্রতিবাদী না হওয়ার ফলে এরা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

'আমৃত্যু আকালু' গল্পের আকালুর মতো 'নরকবাস' গল্পের সদর আলীও নদী ভাঙনের শিকার উদ্বাস্তু দিনমজুর। প্রথমে নদীর বাঁধের উপর ঘর তুললেও পরে গ্রামের দূর সম্পর্কের প্রভাবশালী আত্মীয় 'কসের দেওয়ানী'র সহায়তায় তারা ঘর বাঁধে মাশানকুড়া নামক দুর্গম স্থানে। কিন্তু সদর আলীর মতো অসহায় নিম্নবর্গকে কসের দেওয়ানীর মতো শোষক উচ্চবর্গ বিনা স্বার্থে কখনই যে সাহায্য করে না, তা প্রমাণিত হয় যখন কসের দেওয়ানী বিভিন্ন অজুহাতে সদর আলীর স্ত্রী সখিনার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়তে চায়। সদর আলী ও সখিনা কসের দেওয়ানীর অসৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরে প্রতিবাদ করলেও, এই প্রতিবাদের কারণেই তাদেরকে ভোগ করতে হয় মর্মান্তিক পরিণতি। গল্পের শেষ প্রান্তে রাতের অন্ধকারে একদল অজ্ঞাত উচ্ছৃঙ্খল তরুণ দ্বারা ছদর-আলীর লাঞ্ছিত হওয়া এবং স্ত্রী-কন্যার ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা

থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, এই ঘটনার নেপথ্যে কাজ করেছে কসের দেওয়ানীর মতো কপট উচ্চবর্গের প্রতিশোধস্পৃহা ও ক্ষমতার অপব্যবহার।

নিম্নবর্গের নারী : নিরাপত্তাহীন ও নিপীড়িত মানুষের কথকতা

আমাদের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রায় সকল নারীই পুরুষের সঙ্গে তুলনায় নিম্নবর্গ। ফলে নিম্নবর্গের পুরুষের স্ত্রী-কন্যা-মাতা একদিকে যেমন সমাজের উচ্চবর্গের তুলনায় অধস্তন, তেমনি পরিবারের পুরুষদের কাছেও অবহেলিত। এসব নারী অধিকাংশই আর্থ-সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন ও পুরুষতন্ত্রের নানামাত্রিক অনুশাসনে নিপীড়িত-নির্যাতিত। মঞ্জু সরকারের 'কার্তিকের অতিথি' গল্পে মনতাজের মেয়ে আছিয়া, 'আবরণ' গল্পের 'রুপালীর মা' উচ্চবর্গের কাছে সম্ভ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে মঙ্গাকালীন দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়ে। কিন্তু 'নগ্ন আহ্বান' গল্পে ধর্ষকামী পুরুষদের লালসার কারণে নিম্নবর্গের নারী হাজেরাকে বারবার তার সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে। এই গল্পের স্বামী পরিত্যক্তা যুবতি হাজেরা শহরে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় পাড়ার মাস্তানদের কুদৃষ্টির কারণে তাকে প্রতিনিয়ত বিব্রত হতে হয়। প্রতিমুহূর্তের সাবধানী পদক্ষেপে মাস্তানদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও রাতের অন্ধকারে গৃহকর্তার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ধর্ষিত হয়ে গৃহকর্তার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে তাকে রাতেই রাস্তায় নামতে হয় এবং টহলপুলিশের দ্বারা পুনরায় ধর্ষিত হতে হয়। ফলে তথাকথিত সভ্য পুরুষের পাশবিক আচরণের প্রতি ঘৃণায়-প্রতিবাদে, "সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনার সহস্র চিহ্ন আর বিক্ষুব্ধ চেতনায় শতাব্দীর প্রাচীন হাহাকার নিয়ে হাজেরা উলঙ্গই থেকে যায়" (মঞ্জু, ২০০৯ : ৫৭) বস্তুত হাজেরার এই নগ্নতা দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক উচ্চবর্গীয় সমাজের নারীনির্যাতনের প্রতি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদকেই প্রকাশ করেছে।

গৃহপালিত গাভীর প্রতি নিম্নবর্গের নারীর সন্তানসম বাৎসল্যের রূপায়ণ লক্ষ করা যায় 'গো-জীবন' গল্পে। এই গল্পের নিম্নবর্গের নারী ঘুতুর মা গ্রাম্য বিধবা। একমাত্র ছেলে ঘুতু ও পুত্রবধূর সংসারের খরচ মেটাতে গিয়ে তার সম্পত্তির সর্বাংশ বিক্রি করতে হয়েছে। এই বৃদ্ধা তার 'নালটি' নামের পোষা গাভীকে কন্যার মতো স্নেহ করে। ঘুতুর মার এই বাৎসল্যপ্রেমের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৮–১৯৭৬ খ্রি.) 'মহেশ' গল্পের মিল পাওয়া গেলেও গল্পের পরিণতিতে ঘুতু কর্তৃক গোপনে নালটিকে বিক্রি করে দেওয়ার পর ঘুতুর মার আত্মহত্যা এবং গল্পের নামকরণ থেকে যে আয়রনির সৃষ্টি হয়, তা থেকে বলা যায় যে গল্পকার ঘুতুর মার নারী-জীবনকে গো-জীবনের সঙ্গে প্রতিতুলনা করতে চান। এ বিষয়ে সমালোচক ভীষ্মদেব চৌধুরীর বক্তব্য :

> হাজীর ধানখেতে প্রবেশের শাস্তিস্বরূপ খোঁয়াড়বাস শেষে ঘুতু-কর্তৃক হাজীর কাছেই বিক্রি করে দেওয়ার মধ্যদিয়ে নালটির গো-জীবনের যে রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে, তারই সমান্তরালে গ্রীষ্মের মঙ্গায় তাপিত-উদর ঘুতুর মার নালটির বিনিময়মূল্যে কেনা নতুন শাড়িকে উদ্বন্ধন-রজ্জুতে পরিণত করে মর্মান্তিক আত্মহনন গো-জীবনের এক প্রতিরূপক-জীবনকে প্রতিভাসিত করে। এভাবেই রূপকার্থের ব্যঞ্জনা আর আয়রনির শাণিত লক্ষ্যভেদে গল্পোক্ত যুগল-জীবনধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৩৮৮)

মঞ্জু সরকারের 'গৃহবন্দীর ঘর-দুয়ার' গল্পে স্বামীর অযত্ন-অবহেলার জন্য গর্ভবতী নারীর দুর্গতির চিত্রউন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পে রংপুর জেলার হরিরামপুর গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর হেলেনা চার

সন্তানের জননী হওয়ার পরও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ না করে আরো একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করে। কিন্তু গর্ভবতী নারী হিসেবে স্বামী মেহের আলীর কাছে প্রত্যাশিত যত্ন ও সেবা হেলেনা কখনোই পায়নি। গর্ভাবস্থায় তার "মনে পড়ে গত বছরের কথা, কোলেরটা হওয়ার সময় হেলেনা মরতে বসেছিল, এক ফোঁটা অষুধ এনে দেয়নি মানুষটা" (মঞ্জু, ২০০৯ : ৩৮)। অভাবের সংসারে আরেকটি সন্তানের আগমনবার্তা দরিদ্র স্বামী-স্ত্রীর কাছে দুঃসংবাদ হয়ে আসে। নিজেরাই যখন ঠিকমতো খেতে পারে না, সেখানে নতুন সন্তানের ভরণপোষণের বাড়তি দায়িত্ব পালনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তারা সজাগ। ফলে তারা হেলেনার গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে গর্ভপাত ঘটানোর সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে গ্রাম্য ধাই বাতাসীর মার পরামর্শে একখণ্ড সূচালো বাঁশের কাঠি তলপেটে ঢুকিয়ে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণে মৃত্যুর পথে ধাবিত হতে হয় হেলেনার মতো নিম্নবর্গের নারীকে। স্বামীর অযত্ন-অবহেলা ও দায়িত্বহীনতায় নিম্নবর্গের নারীকে যে মর্মন্তুদ পরিণতি বরণ করতে হয় তার চিত্রই গল্পটিতে রূপায়িত হয়েছে। *পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'পাখির মা' গল্পে নাগরিক নিম্নবিত্ত নারীর জীবনসংগ্রাম ও বহুমাত্রিক সংকটের চিত্র বিন্যস্ত হয়েছে। এই গল্পের পাখির মা তার আট বছরের মেয়ে পাখি ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে শহরের বস্তিতে থাকে। গ্রাম থেকে শহরে আসা এই নারী হোটেলের রান্নাঘরে মশলা বাটার কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে খুব কষ্ট করে তাদেরকে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু পুলিশবাহিনী তাদের বস্তি উচ্ছেদ করে দিলে এবং পাখির মা তার চাকুরি থেকে ছাঁটাই হলে তারা গভীর সংকটে নিপতিত হয়। কর্মহীন উপার্জন-অক্ষম পাখির মার সংকট দেখে তার বৃদ্ধা মা গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু সংগ্রামশীল পাখির মা হতাশার মধ্যেও আশাবাদে অবিচল আস্থা স্থাপন করে তার মাকে বলে :

> অতো চিন্তা করস ক্যান মা? হাত দুইডা তো আর যায় নাই। ঢাকা টাউনে যতো হোটেল বাসা বাড়ি আছে, কামের বেটি ছাড়া চলব কারো? এতো দালান-কোঠা হইতাছে–আমরা কাম না করলি উঠবো? হোটেল-বাসাবাড়ির কাম না পাই যুদি, ইঁটা ভাঙ্গার কাম করুম। (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ৭৮)

পাখির মার উপরিউক্ত উক্তির মধ্যে আমরা একজন সংগ্রামী ও আশাবাদী নিম্নবর্গের নারীকেই আবিষ্কার করি। পাখির মার মতোই সংগ্রামী ও সাহসী নারীকে আমরা খুঁজে পাই 'আমৃত্যু আকালু' গল্পের তিস্তাবিবি ও 'টুকির মায়ের পুলিশ জামাই' গল্পের টুকির মায়ের চরিত্রে। উভয় নারীই গ্রামীণ সমাজে প্রতিকূল পরিবেশে জীবন-সংগ্রামে অবিচল, অন্যায়ের প্রতিবাদে দৃঢ়কণ্ঠ ও জীবনসংগ্রামে অনমনীয়। মঞ্জু সরকারের গল্পসমূহের বিভিন্ন দুর্বলচিত্ত অসহায় নারীর তুলনায় সংগ্রামী-সাহসী-প্রতিবাদী এই দুই নারী নিঃসন্দেহে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও ব্যতিক্রম। মঞ্জু সরকার সৃষ্ট আরেকজন ব্যতিক্রমী নারী 'দুধওয়ালীর পুষ্টি উৎস' গল্পের হাদির মা। বিধবা এই নারী গ্রামে বসবাস করলেও গ্রাম থেকে দুধ কিনে শহরে গিয়ে বিক্রি করে সংসার চালায়। ছেলে হাদিকে চাকুরি দেবে এমন আশ্বাসে তার পরিচিত এক মেমসাহেবের বাসায় কন্যা হনুফাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে দেয় হাদির মা। সেই বাসার গৃহকর্তার দ্বারা মেয়ে হনুফা অসম্মানিত হয়ে বিতাড়িত হওয়ার পর অপমানিত হাদির মার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠলেও শেষ পর্যন্ত শুভবোধের কাছে পরাজিত হয় তার অন্তর্গত অশুভ চেতনা। ছেলে হাদির পরামর্শে বিক্রীত দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে গৃহকর্তার পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেও শেষ পর্যন্ত সেই গৃহকর্তার নিষ্পাপ শিশুপুত্রের কথা মনে করে তিনি দুধের ভেতর বিষ মেশানো থেকে বিরত থাকেন। সুযোগ পেয়েও অশুভ উপায়ে প্রতিশোধ নেওয়ার পথ থেকে ফিরে আসার প্রবণতা হাদির মার চারিত্রিক দৃঢ়তাকেই প্রকাশ করে।

মঞ্জু সরকারের 'ভিতরে মানুষের কান্না' গল্পে শহরের বস্তিবাসী বৃদ্ধা কদবানুর অসহায়ত্বের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কারখানার বহুতল ভবন ভেঙে পড়ার কারণে কদবানুর পুত্র গার্মেন্টস শ্রমিক আকবরের মৃত্যু ঘটে। কদবানুর এই বিপদে গ্রাম থেকে তার মেয়ে-জামাই ওকিজুদ্দি ছুটে এলেও–তার আগমনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল আকবরের মৃত্যুর জন্য মালিকপক্ষের তরফ থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ করার দুরভিসন্ধি। কিন্তু সেই টাকা না পেয়ে ওকিজুদ্দি তার শ্যালিকা জয়গুনকে নিয়ে যখন নিখোঁজ হয়ে যায়, তখন আমরা কদবানুর মতো বৃদ্ধার জীবনের বিপন্নতার মর্মভেদী চিত্রকেই প্রত্যক্ষ করি। মঞ্জু সরকারের 'মরা নদীর ময়না' গল্পে আমরা ময়না নামের এক স্বামী পরিত্যক্তা গ্রাম্য নারীর জীবনসংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করি। এই গল্পের নিম্নবর্গের নারী ময়নার স্বামী মঙ্গার সময় শহরে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরে আসে না। তাই সাত-আট বছর বয়সি সন্তান, বৃদ্ধা মা ও নিজেকে বাঁচাতে ময়না বাধ্য হয়ে দোকান দেয়। ময়নার ধারণা হয়তো তার স্বামী শহরে গিয়ে আরেকটি বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছে। ময়নার একাকিত্বের সুযোগে শহর থেকে বেড়াতে আসা রহস্যময় ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারিত করতে চায়। কিন্তু ময়নার দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত এই শহুরে প্রতারককে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হতে হয়। ময়নার মধ্যেও আমরা একজন নিম্নবর্গের নারীর জীবনসংগ্রামের শিল্পিত রূপায়ণ লক্ষ করি।

নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ

নিম্নবর্গের অধীনতার মধ্যেই যুগপৎভাবে 'সহকারিতা' ও 'প্রতিরোধ' ক্রিয়াশীল থাকে। সহকারিতা ও প্রতিরোধ প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ বলেন :

> [...] নিম্নবর্গের ইতিহাসে দুটি রাশিই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, যদিও অবস্থাভেদে একটি অপরটির চেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে এবং অধীনদের চৈতন্যে হয় একটি বা অন্যটি প্রাধান্য কায়েম করে সাময়িকভাবে। তাই একথা মনে করা ভুল হবে যে প্রতিরোধই নিম্নবর্গের চৈতন্যের একমাত্র উপাদান। বরং অসাম্য সত্ত্বেও যেহেতু সমাজ সাধারণত স্থিতিশীল তাই অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে সহকারিতাই প্রতিরোধের চেয়ে সাধারণত বেশি শক্তিমান। (রণজিৎ, ২০০৮ : ৪৩)

যেহেতু নিম্নবর্গের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের অধীনতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রতিবাদের বীজ, তাই নিম্নবর্গের এই প্রতিবাদ উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবেও হতে পারে, আবার পরোক্ষ প্রতিবাদেও পাওয়া যেতে পারে তাদের প্রতিরোধের আভাস। মঞ্জু সরকারের 'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা' গল্পে নরসুন্দরের পেশায় নিয়োজিত কানাইয়ের আচরণেও পরিস্ফুট হয়েছে উচ্চবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গল্পের 'বছির ধনী' কানাইয়ের কাছ থেকে চুল কাটিয়ে নেওয়ার পর বিভিন্ন অজুহাতে পয়সা না দেওয়ার চেষ্টা করলে কানাই "প্রায় হুকুম ছুঁড়ে দেওয়ার মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলে–'পয়সাটা এলায় নিয়া আইসেন কাকা'।"(মঞ্জু, ২০০৯ : ৪৫) কিন্তু প্রতিউত্তরে বছির ধনীর কাছ থেকে চপোটাঘাত পেয়ে অপমানিত কানাই ক্ষোভে-দুঃখে শেষ পর্যন্ত পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে কল্পিত স্বর্গ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে নতুন পেশা গ্রহণ করে নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য। 'নগ্ন আহ্বান' গল্পে তথাকথিত সভ্য পুরুষদের দ্বারা বারবার ধর্ষিত হয়ে নগ্ন থাকার মাধ্যমেই হাজেরা প্রকাশ করেছে তার ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ। তবে *অবিনাশী আয়োজন* গ্রন্থের নাম গল্পটি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই গল্পে আমরা শোষিত নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে আশাবাদী ও স্বপ্নচারী মঞ্জু সরকারকে আবিষ্কার করি। ফেলু কামারকে উপলক্ষ্য করে কার্তিকমাসী মঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুৎপিপাসাকাতর মানুষের সামষ্টিক শক্তিতে রূপান্তর এবং ক্ষুধার্তের খাদ্যভান্ডার

দখল করে রাখা সেরাজ চৌধুরীর মতো শোষকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের প্রস্তুতিকেই মঞ্জু সরকার 'অবিনাশী আয়োজন' শিরোনামে দ্যোতিত করেছেন। মঙ্গাজীর্ণ খরার মৌসুমে গভীর নলকূপবাহিত সেচব্যবস্থার মাধ্যমে, ইরিধান চাষের সরকারি প্রকল্পের ফাঁকফোকর দিয়ে, গ্রামের গরিব কৃষককে অনেক সময় মহাজন-জোতদারের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হতে হয়। 'দহন' গল্পে এ ধরনের ষড়যন্ত্রে নিঃস্ব হওয়ার আগেই বরকতুল্লাকে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখা যায়। গল্পের শেষপ্রান্তে নিষ্ঠুর-নির্দয় শোষকের অন্যায়ের প্রতিবাদে বরকতুল্লা কর্তৃক দেওয়ানীকে কোদাল দিয়ে আঘাত করার পর দেওয়ানীর লোকজনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিঃসঙ্গ বরকতুল্লার সঙ্গে তার নয়-দশ বছরের ছেলে বেলালের শামিল হওয়া নিম্নবর্গের প্রোজ্জ্বল প্রতিরোধ চেতনাকে প্রকাশ করেছে। মঞ্জু সরকারের 'উপেক্ষিত দুইজন' গল্পের নিম্নবর্গের চরিত্র গোমাকেও আমরা আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেখি। এই গল্পে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী রহিম ব্যাপারী ক্ষমতার দাপটে পেয়ার আলী মাস্টারের পাঠাগার কক্ষ দখল করে পাটের আড়ত বানায়। রহিম ব্যাপারীর মতো ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে পেয়ার আলী মাস্টারের মৌখিক প্রতিবাদ কোনো ফল বয়ে আনে না। তাই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে রহিম ব্যাপারীর মতো কুটিল মানুষকে শায়েস্তা করার গোপন পরিকল্পনা করে নানা পেয়ার আলীকে আশ্বস্ত করে গোমা : "মুই আইজ রাইতের মধ্যে হারামজাদা ব্যাপারীর কোষ্টার গুদামত আগুন জ্বালে দিম!" (মঞ্জু, ২০০৯ : ৪৮) বস্তুত উচ্চবর্গের দ্বারা বারবার উপেক্ষিত হতে হতে পেয়ার আলী ও গোমার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে ক্ষোভ ও হতাশা জমা হয়েছিল–তাই তাদেরকে সরবরাহ করেছে প্রতিরোধের গুপ্ত অগ্নিবীজ। 'রাজবন্দীর বোধশোধ' গল্পের শাদুল্লা বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে অবচেতন মনে থুতু ফেলে প্রকাশ করেছে তার প্রতিবাদ। অবশ্য এই থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত মারামারির কেসে আসামি হয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভয়ে তাকে বাড়ি থেকে পালাতে হয়।

মঞ্জু সরকারের 'বিচূর্ণ প্রতিবিম্ব' গল্পের হারাণ নাপিতের পেশায় নিয়োজিত একজন গ্রামীণ নিম্নবর্গ। "নাপিতকুলের মধ্যে হারাণই যে শ্রেষ্ঠ গরিব, সেটা তার চেহারা ও বেশভূষা দেখেই অনুমান করা বেশি সহজ" (মঞ্জু, ২০০১ : ৭১-৭২)। অর্থনৈতিক দীনতার জন্যই মুক্তহাটে ঘরভাড়া করে সেলুন দেওয়ার বদলে হাটের পাশে রাস্তায় কড়ই গাছের গোড়ায় বড় আয়না সাজিয়ে, চেয়ার বসিয়ে সেলুন বানাতে হয় হারাণকে। অন্যদিকে মুক্তহাটে ঘর ভাড়া করে সেলুন দেওয়া শ্যামল পেশায় নাপিত হলেও অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিবেচনায় হারাণের তুলনায় উচ্চবর্গ। গল্পে প্রতিদ্বন্দ্বী হারাণের উন্মুক্ত সেলুন ভেঙে ফেলার কারণে হারাণ শ্যামলের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ঠিকই কিন্তু শ্যামলের পেশিশক্তির আধিপত্যে উল্টো তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। এভাবেই শ্যামলের মতো উচ্চবর্গের পেশিশক্তির দাপটে চাপা পড়ে যায় নিম্নবর্গের প্রতিরোধ চেতনা।

নিম্নবর্গের অবক্ষয় ও অপরাধপ্রবণতা

মঞ্জু সরকারের গল্পগুলোতে আমরা অবক্ষয়ী-অপরাধপ্রবণ নিম্নবর্গেরও সন্ধান পাই। তবে এই চরিত্রগুলো স্বেচ্ছায়-সচেতনভাবে অপরাধপ্রবণ নয়। তাঁর গল্পগুলোতে নিম্নবর্গের দুর্ভিক্ষশীর্ণ মানুষ, অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়। তাঁর মঙ্গাপীড়িত চরিত্রগুলো ক্ষুধার

যন্ত্রণায় মিথ্যা কথা বলে, অন্যকে ঠকিয়ে লাভবান হতে চায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে, পিতার সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য। যেমন 'দুর্গত অঞ্চলের দেবতা' গল্পের নঈমুদ্দি প্রতারণা করে গ্রাম্য মহিলাদের তার দোকানের দ্রব্য বিক্রি করতে চায় দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার প্রয়োজনে। 'দুশমন' গল্পের হবিও পিতার টাকা চুরি করার চেষ্টা করে একই কারণে। 'রাঘব বোয়ালের খাদ্য' গল্পের ওসমানও মৃত স্ত্রীর কাফনের কাপড় কেনার জন্য সাহায্য তুলে কিন্তু কাফন ছাড়াই স্ত্রীকে কবর দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালায়। 'দানেশের দেশবিদেশ' গল্পের দানেশ দুর্দিনের আশ্রয়দাতার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। এছাড়া আছিয়া এবং রুপালির মার মতো নারীকে লক্ষ করি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকার জন্য এরা বাধ্য হয়ে এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়লেও এরা কেউই পেশাদার অপরাধী নয়।

নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতার বিবিধ প্রসঙ্গ

মঞ্জু সরকারের বিভিন্ন গল্পে নিম্নবর্গের প্রচলিত বিশ্বাসে ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে। 'ভূতের সাথে যুদ্ধ' গল্পে মাছুয়া মফিজ মাছ ধরতে গিয়ে ভূত দ্বারা আক্রান্ত হয়। মফিজের অসুস্থ স্ত্রীকে ভূতে ধরেছে বলেই সে বিশ্বাস করে। এছাড়া এই গল্পে মফিজের মেয়ে জমিরন ভূতের ভয় দেখিয়েই তার ক্ষুধার্ত ছোটো ভাইয়ের কান্না থামায়। 'আমৃত্যু আকালু' গল্পের গপ্পোবুড়োর গল্পের মধ্যেও ভূতের প্রসঙ্গ এসেছে। 'প্রিয় দেশবাসী' গল্পে আমানুল্লার নাতিরা ভূতের প্রতি যেমন বিশ্বাসী তেমনি আজরাইল ফেরেশতার অস্তিত্বেও আস্থাশীল। এছাড়া মঞ্জু সরকারের বিভিন্ন গল্পের নিম্নবর্গকে জ্বিন-পরির মতো শক্তিশালী জীবের প্রতিও বিশ্বাসী হতে দেখি। বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গের মানুষের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক আচরণ মঞ্জু সরকারের 'আনন্দযাত্রা' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এই গল্পে কনের বাড়ি থেকে ফেরার সময় বরযাত্রীদের বাস মাঠে আটকে যাওয়ার পর সবাই মিলে চেষ্টা করেও সেই জায়গা থেকে নড়াতে পারে না। ফলে গ্রামবাসীরা স্থির সিদ্ধান্তে আসে যে "বাসের ওপর জ্বিনের আসর পড়ছে" (মঞ্জু, ১৯৯৫ : ৮৩)। এভাবে মঞ্জু সরকারের বিভিন্ন গল্পে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে নিম্নবর্গের মানুষের যে দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়, তা নিম্নবর্গের জীবনাচরণেরই একটি অংশ।

মঞ্জু সরকারের গল্পে যেসব নিম্নবর্গের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাব নিম্নবর্গের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক মাপকাঠি। এরা কথা বলার সময় প্রমিত বাংলায় কথা না বলে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যে-কোনো ধরনের অপভাষা বা অশিষ্ট ভাষা (Slang) প্রয়োগেও জড়তা অনুভব করে না। তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষগুলো কথা বলার সময় তাদের আঞ্চলিক সংলাপ ও লোকায়ত শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার ঘটিয়েছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গল্পের চরিত্রসমূহ নির্দ্বিধায় অপভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর গল্পে প্রকরণ-পরিচর্যার চেয়ে নিম্নববর্গের জীবনের রূঢ় বাস্তবতার বিচিত্র দিকের তীক্ষ্ণমুখ প্রকাশই পেয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। গ্রাম ও শহর–উভয় অঞ্চলের নিম্নবর্গের জীবনকে উপজীব্য করলেও উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষের জীবনবাস্তবতা রূপায়ণে তিনি বিশিষ্ট ও অনন্য। এক্ষেত্রে তাঁর গল্পের যে বিষয়-বৈচিত্র্যও নান্দীযোগ্য। নিরীক্ষাপ্রবণ না হলেও নিম্নবর্গের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা (detail) মঞ্জু সরকারের গল্পকে

করেছে শিল্পোত্তীর্ণ। মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের জীবন রূপায়ণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি নিরাসক্ত-নির্মোহ থেকে শৈল্পিক সিদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। তাই মঞ্জু সরকারের এসব গল্প বাংলাদেশের নিম্নবর্গের জীবনভিত্তিক ছোটোগল্পকেও করেছে সমৃদ্ধতর।

সহায়কপঞ্জি

আনু মুহাম্মদ (২০০৪)। 'রংপুরের দুর্ভিক্ষ : ১৯৭৯'। *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০০৮)। 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। সম্পাদক : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৪১২)। 'দুর্ভিক্ষের শিল্পরূপ'। *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২। সম্পাদক : নাঈম হাসান।

মঞ্জু সরকার (২০০৯)। *অবিনাশী আয়োজন*। তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৯৫)। *আনন্দযাত্রা*। সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৯০)। *উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা*। রমা প্রকাশনী, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৮৬)। *পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প*। নিখিল প্রকাশন, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৮৬)। *মৃত্যুবাণ*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (২০০১)। *যৌথ একাকিত্ব*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা।

মোঃ মেহেদী হাসান (২০০৮)। *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন*। মনন প্রকাশন, ঢাকা।

Dipesh Chakrabarty (2000). 'Minority Histories, Subaltern Pasts'. *Provincializing Europe (Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princton University Press, Oxfordshire.

Gayatri Chakravorty Spivak (1988). 'Can the Subaltern Speak?'. *Marxism and the Interpretation of Cultrue*.Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds). Macmillan, London.

বিদ্যাসাগরের কর্মপদ্ধতি ও কৌশল : প্রসঙ্গ শিক্ষা ও সমাজসংস্কার

ফাতেমা-তুজ-জোহরা*

[সারসংক্ষেপ : শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। বিধবাবিবাহের প্রচলনের মাধ্যমে তিনি নারীমুক্তির অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রেও নিয়েছেন বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। বহুবিবাহপ্রথা বাতিল করার জন্যও তিনি আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন; বাল্যবিবাহের কুফল নিয়েও ছিলেন সরব। ঔপনিবেশিক শাসনামলে শাসক শ্রেণিকে তাঁর সংস্কার কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে তাঁকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে; সনাতন রক্ষণশীল সমাজের সমালোচনা ও বিরূপ আচরণকে সামাল দিতেও নিতে হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ– যাতে তাঁর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের কীর্তির মূল্যায়ন এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি ও কৌশল বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় তুলে ধরা।]

ভূমিকা

সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালির ত্রাতারূপে আবির্ভূত এক স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৯৯১)। বিশেষ করে সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন পদে এবং দক্ষিণ বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি শিক্ষা সংস্কারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনে তিনি পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে লিখছেন প্রবন্ধ। বহুবিবাহ রহিতকরণেও করেছেন সর্বোচ্চ চেষ্টা। "বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী" এই মহৎ ব্যক্তিত্ব বাংলা গদ্যের সংস্কার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বাধার সম্মুখীন না হলেও, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে নানামুখী বাধা ও আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসককে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হয়েছে, অন্যদিকে রক্ষণশীল সনাতন সমাজের বাধার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। সংস্কার প্রসঙ্গে শাসকশ্রেণি তাঁর সঙ্গে কখনো ঐক্যমত্যে পৌঁছলেও অনেক ক্ষেত্রেই মতদ্বৈধতার কারণে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও এগিয়ে নিতে হয়েছে তাঁর কার্যক্রম। অনেকটা জেদি ও একগুঁয়ে হিসেবে পরিচিত বিদ্যাসাগর, মতের মিল না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই যেমন প্রয়োজনে পদত্যাগ করেছেন; তেমনি বিপরীত চিত্র হিসেবে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশেও তাঁকে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে দেখি। ফলে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে আত্মপ্রত্যয়ী স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরকে কখনো কখনো নিজ অবস্থান থেকে নমনীয় হতে হয়েছে। মূলত সংস্কারের প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে নানারকম কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে– যা তাঁর সংস্কার উদ্যোগকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সংস্কার

বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পাঁচ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এরপর পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে "কয়েক মাস পাঠশালে পড়িবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন" (শিবনাথ, ১৯৮২ : ১৭)। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়ে উত্তীর্ণ হন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ শূন্য হলে বিদ্যাসাগর সেই পদে যোগ দেন। এসময় থেকেই তিনি শিক্ষা সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেক্রেটারি রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কারণ বিদ্যাসাগর "শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব করিতেন, তাহা সময় সময় সেক্রেটারীর অনুমোদিত হইত না" (বিহারীলাল, ১৯৯১ : ১১৪)। তাই উক্ত পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণে বিদ্যাসাগরকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়। এসময় তাকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা ঋণ করে বাড়িতে পাঠাতে হয়েছে। তাছাড়া রসময় দত্ত ছিলেন পারিবারিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি। এমন একজনের সঙ্গে দ্বৈরথে লিপ্ত হয়ে পদত্যাগ করার সাহস সবার থাকে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সেই সৎসাহস দেখাতে পেরেছে। কারণ সংস্কৃত কলেজে চাকরি শুধু তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল না; এটি ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শন ও মতাদর্শ বাস্তবায়নের স্বনির্বাচিত ক্ষেত্র। তাই জীবিকাচিন্তাকে পরিত্যাগ করে তিনি সহজেই পদত্যাগ করতে পেরেছেন। বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরের এ রকম সৎসাহস দেখে মন্তব্য করেন : অনন্যোপায় সামান্যবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ পদত্যাগ দুষ্কর নিশ্চিতই; কিন্তু যাঁহাদের ভিতরে তেজ আছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিচিত্র কিছুই নহে (বিহারীলাল, ১৯৯১ : ১১৪–১১৫)।

বস্তুত তিনি পদত্যাগ করেছিলেন বলেই তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করে।

১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরানি পদে যোগ দেন মাসিক ৮০ টাকা বেতনে। ১৮৫০ সালেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে চলে যান– শূন্য হয় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ। এসময় বাংলার শিক্ষা সংসদের সচিব এফ.জে. ময়েট সেই পদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ দিতে চান। নিয়োগের কথা জানতে পেরে বিদ্যাসাগর স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে, কেবল চাকরি লাভের জন্য এই দায়িত্ব নিতে তিনি অনাগ্রহী। শুধু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও গুণগত পরিবর্তন করার ক্ষমতা পেলেই তিনি সেই পদে যোগদান করবেন। বিদ্যাসাগরের দৃঢ় অবস্থান ও আত্মবিশ্বাসকে সম্মান জানিয়ে সরকার তাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়। নিয়োগের সময় বিদ্যাসাগর শর্তারোপ করেছিল যে, আপাতত অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিলেও সুযোগ সৃষ্টি হলেই তাঁকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিতে হবে। "বিদ্যাসাগরের এই শর্তারোপ সংস্কৃত কলেজের নিছক অধ্যক্ষ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না; তিনি মূলত চেয়েছিলেন কর্তৃত্ব" (বিশ্বজিৎ, ২০২০ : ২৫)। আর এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গ্রহণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলের একটি দিক। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই কর্তৃত্ব না পেলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া তিনি যে ক্ষমতা ও পদের প্রতি অনুরক্ত নন, ইতঃপূর্বে রসময় দত্তের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কারণে পদত্যাগের ঘটনা থেকে স্পষ্টতই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি।

বিদ্যাসাগরের এই জেদ, আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল ইংরেজ সরকারের কাছে শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক ধারণা তৈরি করে। তাই ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব নিয়েই তিনি উপলব্ধি করেন, ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় নানামাত্রিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য এসময় নানান উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করতে থাকেন তিনি। অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে তিনি যে সংস্কারকর্মগুলো গ্রহণ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ, ২. ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য বর্ণের ছাত্রদের কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ প্রদান, ৩. ছাত্রদের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্তন, ৪. উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, ৫. দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রথা প্রবর্তন, ৬. সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন ইত্যাদি। ১৮৫২ সালের ১২ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংসদের সচিব এফ.জে. ময়েটের কাছে ২৬টি অনুচ্ছেদসংবলিত একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। 'নোটস্ অন দ্য সংস্কৃত কলেজ' শিরোনামের এই পরিকল্পনার প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি উল্লেখ করেন যে, "বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা" (বিনয়, ২০১১ : ১৭৩)। এই পরিকল্পনাপত্রে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম, পাঠ্যবইয়ের ভাষা, পঠিতব্য বিষয়সমূহ, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ, কলেজের অর্থব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত মত প্রদান করেন। সর্বশেষ (২৬ নং) প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন যে, তাঁর সংস্কার প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সংস্কৃত কলেজের যেমন কোনো উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তেমনি তার প্রকৃত আদর্শও বাস্তবে রূপায়িত হবে না (বিনয়, ২০১১ : ১৭৬)। বাংলার ছোটোলাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনা নিজের মন্তব্যসহ শিক্ষাসংসদে পাঠিয়েছিলেন; যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'It is the result of several consultations I have held with the Principal and, I lay it before the council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration' (বিনয়, ২০১১ : ১৭৬)। এই সুপারিশের প্রায় এক বছর পর বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. ব্যালান্টাইনকে শিক্ষা সংসদ সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৫৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে একজন পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করেন ব্যালান্টাইন। কলেজ পরিদর্শনশেষে ব্যালান্টাইন শিক্ষা সংসদের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যমান সংস্কৃত ও ইংরেজি– উভয় প্রকার পাঠপদ্ধতিকে ভালো হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। ব্যালান্টাইন তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে ইংরেজি ও সংস্কৃত– এই দুই ভাষায় ছাত্ররা জ্ঞানবিদ্যার চর্চা করার ফলে তাদের ধারণা জন্মাতে পারে যে, সত্য দুই রকমের। বিদ্যাসাগর এই মত মেনে নিতে পারেননি। এছাড়া ব্যালান্টাইন সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে বিশপ বার্কলের ভাববাদী দর্শন সংযুক্ত করতে বলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া মতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। তাই তিনি ব্যালান্টাইনের যুক্তিখণ্ডন করে পাঠ্যসূচিতে বস্তুবাদী দার্শনিক স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিবিদ্যা পাঠ্য করতে চান। বিদ্যাসাগর তাঁর আয়াসসাধ্য পরিকল্পনায় অন্যের হস্তক্ষেপ, বিশেষ করে তাঁর সমমর্যাদার একজন ইংরেজ অধ্যক্ষের আধিপত্য মানতে পারেননি। এ বিষয়ে তিনি ড. ময়েটকে তাঁর অনুযোগ ও ক্ষোভ জানিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা সংসদের সমর্থন চান। এ সময় বিদ্যাসাগর

ময়েটকে লেখেন, "এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি ক'রে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যার প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজিবিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে" (বিনয়, ২০১১ : ১৮২)। সরকার শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের দাবি মেনে নেয়। এই বিতর্কের পর সাময়িকভাবে হলেও বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান। অনেকের হয়তো মনে হতে পারে বিদ্যাসাগর ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে বিবাদ ও বিতর্কে জড়িয়ে তাঁর পেশা ও সংস্কারকর্মকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিলেন। আমাদের বিশ্লেষণে, এই বিতর্ক তাঁর ভবিষ্যৎ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই কৌশল। কারণ সংস্কার শুরুর প্রথম দিকেই তিনি যদি ব্যালান্টাইনের অভিমতকে মেনে নিতেন, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো সংস্কারসম্পর্কিত সকল ভিন্নমতকে মেনে নিতে হত। নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকা বিদ্যাসাগরের জেদি চারিত্র্যকে প্রকাশ করলেও সরকারের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ় অবয়বও চিত্রিত হয়ে ওঠে। ফলে সরকার বুঝতে পারে যে, বিদ্যাসাগর যে সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন, তা গভীর চিন্তা ও পরিপক্ব পরিকল্পনার মাধ্যমেই করেন। নিজের সংস্কার পরিকল্পনাকে সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য স্বমতে অনড় থাকাও তাই জরুরি ছিল।

১৮৫৭ সাল থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শিক্ষাসংসদের নানা কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক নিয়োগদানের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর একক কর্তৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন। শূন্য পদের কোনো বিজ্ঞাপন না দিয়ে তিনি সাহিত্য ও গণিতের অধ্যাপক হিসেবে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও মোহিনীমোহন রায়কে নিয়োগ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নচন্দ্র রায়কে। শিক্ষা বিভাগের পরিচালক গর্ডন ইয়ং এই নিয়োগকে মেনে নিলেও, ভবিষ্যতে নিয়োগবিধি অনুযায়ী শূন্য পদের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পরামর্শ দেন। নিয়ম-নীতির দিক থেকে বিবেচনা করলে গর্ডন ইয়ংয়ের পরামর্শ যৌক্তিক। তবে বিজ্ঞাপন ছাড়া শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পেছনেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারকৌশল লক্ষণীয়। এ বিষয়ে বিনয় সেনের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

> শিক্ষক-অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারেও তিনি যে পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেছেন, তার কারণ মনে হয়, শিক্ষা বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। তিনি জানতেন, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজে কাজ করার পথে অন্তরায় অনেক। তার উপর তাঁর সহযোগীদের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের কর্তারা যদি প্রকাশ্য মনোনয়নের সুযোগ নিয়ে নিজেদের তাঁবের লোক দু-চারজন ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তা হলে পদে-পদে নানা রকমের বাধা পেয়ে একেবারেই কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। (বিনয়, ২০১১ : ১৮৫)

এ কারণে আমরা বুঝতে পারি, বিদ্যাসাগরের এই কর্মপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারিতা মনে হলেও, সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গর্ডন ইয়ঙের সাথে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক এরপর আরও দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের ১৩ই এপ্রিল বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে ইয়ং বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব 'স্কুল বুক সোসাইটি'কে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর তখন একজন প্রধান পাঠ্যবই রচয়িতা। এছাড়াও তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি'র মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকও। পাঠ্যবইয়ের ওপর বিদ্যাসাগরের একক আধিপত্য খর্ব করার জন্য ইয়ং এ কাজ করেন। বিদ্যাসাগর ইয়ঙের এ চিঠিকে ইতিবাচকভাবে নেননি। তাই ইয়ঙের চিঠিকে কোনো গুরুত্ব দেননি তিনি। ফলে ইয়ং বিদ্যাসাগরের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এরপর সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকার কলকাতার বিভিন্ন বড়ো বড়ো অট্টালিকাকে সৈন্যসমাবেশের স্থান হিসেবে বেছে নেয়। সে কারণে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের বৃহৎ অট্টালিকাকেও দখলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তও বিদ্যাসাগর মেনে নিতে পারেননি। তাই কলেজের অট্টালিকার দখল ছাড়তে অসম্মতির কথা জানিয়ে সরকারকে চিঠি লেখেন। বাংলা সরকারের সচিব বিদ্যাসাগরের চিঠির উত্তরে ১৮৫৭ সালের ১৭ই আগস্ট একটি চিঠি লিখেন। সেখানে দেরি না করে গ্যারিসান-কমান্ডারের কাছে তাঁকে "বিদ্যালয় গৃহ ছেড়ে দেবার" (বিনয়, ২০১১ : ১৮৬)। জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সরকারি সিদ্ধান্তকে তিনি আর কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না। তাই শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ মেনে কলেজের ভবন ছেড়ে দেন এবং বৌবাজার স্ট্রিটে দুটি ভাড়া বাড়িতে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে কলেজের ক্লাস চালিয়ে নেন। এতদিন আমরা নিজ অবস্থানে অনড় বিদ্যাসাগরকে পেলেও, এখানে আমরা একজন নমনীয় বিদ্যাসাগরকে পাই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, না চাইলেও সরকার কলেজভবন দখল করে নেবে। তাই তিনি এসময় সরকারকে সহযোগিতা করার কৌশল অবলম্বন করেন।

এরপর শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে মতবিরোধ বৃদ্ধি পেলে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন যে, তিনি আর স্বাধীনভাবে সংস্কারকাজ চালাতে পারবেন না। তাই তিনি শুধু বেতন পাওয়ার জন্য চাকরিতে থাকতে চাইলেন না। ফলে ১৮৫৮ সালের ৫ আগস্ট শিক্ষা বিভাগের পরিচালকের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন। একই বছর ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর পদত্যাগপত্র মঞ্জুর হয়। সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে চাকরিরত অবস্থায় শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক মোট চারটি পরিকল্পনাপত্র পেশ করেন তিনি। সহকারী সম্পাদক পদে থাকার সময় একটি, সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে একটি, অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় হ্যালিডের মাধ্যমে পেশকৃত একটি ও ব্যালান্টাইনের অভিমত প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনা আমরা লক্ষ করেছি। এসব পরিকল্পনাপত্রের মূল সুর প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেন :

> এই সব পরিকল্পনার ভিতরে আলোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষাদর্শের যে মূলসুরটি সর্বত্র ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, সেটি হল মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নত বাংলাভাষার ভিত্তির উপর সুসমৃদ্ধ নতুন বাংলা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগরের সমস্ত শিক্ষাচিন্তার মূল উৎস ও প্রেরণা হল এই আদর্শ। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি সংস্কৃতবিদ্যা ও ইংরেজিবিদ্যা, অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা দুয়েরই আন্তরিক অনুশীলনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'ওরিয়েন্টালিস্ট' বা 'অ্যাংলিসিস্ট' কারও পদাঙ্ক তিনি অনুসরণ করেননি, উভয়েরই যুক্তিতর্ক তাঁর কাছে একপেশে মনে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার এইটাই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য। (বিনয়, ২০১১ : ১৮৮)

বাংলা মাধ্যম ও নারীশিক্ষা সংস্কার

১৮৫৫ সালের ১ মে থেকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বের পাশাপাশি দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির জন্য সহকারি পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তাঁর কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত স্থানে মডেল স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় গুণী

শিক্ষকের অভাববোধ থেকে তিনি ১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই স্থাপন করেন নর্মাল স্কুল। নর্মাল স্কুলে মূলত শিক্ষকদের, বিশেষ করে বাংলা স্কুলের জন্য শিক্ষকদেরকে উপযুক্ত করে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সহকারী পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ২০টি মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তিনি বাংলা শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার ঘটাতে ভূমিকা রাখেন। ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে পর্যন্ত সময়ে তিনি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের শুরুতে সরকারের কাছে তিনি আশ্বাস পেয়েছিলেন যে, বিদ্যালয়ের ঘরগুলো যদি গ্রামবাসী নির্মাণ করে দেয়, তাহলে বাকি ব্যয় সরকার দেবে। কিন্তু ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন বাবদ ৩৪৩৯.৫০ টাকা বাকি পড়ে যাওয়ার পর, বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে আশানুরূপ সহযোগিতা পাননি। শেষ পর্যন্ত একাধিক চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করলেও, সরকার এই বিদ্যালয়গুলির পরবর্তী ব্যয় চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে দমে যাননি। "বালিকা-বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন; তাতে নিয়মিত চাঁদা দিতে লাগলেন কয়েকজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক। সেই চাঁদার টাকায় বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন" (ইন্দ্র, ২০০১ : ২২০)।

১৮৪৯ সালের ৭ মে বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হয়েও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও প্রসারে অবদান রাখেন। ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ড থেকে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন মিস মেরি কার্পেন্টার। তৎকালীন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন অ্যাটকিনশন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মেরি কার্পেন্টারের পরিচয় করিয়ে দেন। বিদ্যাসাগরের কাছে নারীশিক্ষা নিয়ে কার্পেন্টার বিভিন্ন পারমর্শ নিতেন, একত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শনেও যেতেন। কিন্তু বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নর্মাল স্কুল চালু করা নিয়ে দুজনের মতপার্থক্য তৈরি হয়। শিক্ষাসংস্কার করতে গিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজমানস সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুল সম্পর্কে ছোটোলাট উইলিয়াম গ্রেকে বলেন :

> এদেশের ভদ্রপরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই গৃহের বাইরে যেতে দেয় না, তখন তারা যে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে সম্মতি দেবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকি থাকে অসহায় অনাথা বিধবারা, এবং তাদেরই একাজে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকতার কাজে তারা কতদূর উপযুক্ত হবে আপাতত সে-প্রশ্ন বাদ দিয়েও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বিধবারা যদি সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দেয়, তাহলে লোকের কাছে তারা অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠবে। তা যদি হয় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। (বিনয়, ২০১১ : ২৩২)

তিনি আরও বলেন, "যে-কাজে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন করি না, তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি না" (বিনয়, ২০১১ : ২৩২)। বিদ্যাসাগরের এই উক্তিটি তাঁর কর্মকৌশল বোঝার জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি, যে কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, সে কাজ মহৎ উদ্দেশ্যে করা হলেও বিদ্যাসাগরের তাতে উৎসাহ ছিল না। একারণে নারীদের জন্য নর্মাল স্কুল খোলার ক্ষেত্রে তিনি সাড়া দেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরামর্শকে আমলে না নিয়ে কার্পেন্টারের ইচ্ছায়

সরকার বেথুন স্কুলে নর্মাল স্কুল চালু করেন ১৪৬৯ সালে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা সত্য হয়। প্রত্যাশানুযায়ী ফল না পাওয়ায় ১৯৭২ সালে বেথুন স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে বাস্তব প্রতিবেশজ্ঞান ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি বিদ্যাসাগরের সংস্কারপরিকল্পনাকে সফল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

সমাজসংস্কার : বিধাববিবাহ আইন

ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি" (ইন্দ্র, ২০০১ : ৩০০)। উপর্যুক্ত উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করাকে বিদ্যাসাগর কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। তবে বিদ্যাসাগরই প্রথম বিধবাবিবাহের উদ্যোগ নিয়েছেন তা নয়। বিধবাবিবাহের প্রচলনচেষ্টা বিদ্যাসাগরের পূর্বেও অনেকেই করেছিলেন। রাজা রাজবল্লভ ১৭৬০ সালে তাঁর বিধবা কন্যার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দ্রাবিড়, কাশি, মিথিলা অঞ্চলের পণ্ডিতদের কাছে 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়' মর্মে বিধান পর্যন্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিতগণ, রাজার গোপনাদেশের কারণে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করলে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'তেও (১৮১৫) বিধবাদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হতো। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য ছোটো ছোটো উদ্যোগ নেন। নানা কারণে এসব উদ্যোগ সফল হতে পারেনি।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অন্যতম কৌশল ছিল কোনো ধর্মীয় বিতর্কে পক্ষাবলম্বন না করা। সে সময় মিশনারির মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার তুঙ্গে। সনাতন ধর্মের রক্ষণশীলরাও তাদের ধর্মীয় আচারকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছেন। অপরপক্ষে ইয়ংবেঙ্গল দলের নাস্তিকতায় আস্থা ও ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নানা আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। আবার রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারও তখন ঊর্ধ্বমুখী। এরকম পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর যদি কোনো পক্ষ অবলম্বন করতেন, তাহলে বাকি পক্ষগুলো হয়তো তাঁর সংস্কার-উদ্যোগকে সন্দেহের চোখে দেখতো। ফলে এই সংস্কারকর্ম বিঘ্নিত হত। তাই হয়তো বিদ্যাসাগর নিজের ধর্মমত নিয়েও যেমন সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি, তেমনি কোন ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষেও বক্তব্য প্রদান করেননি। এ বিষয়ে ঋষি দাস বলেন :

> ধর্ম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরব রইলেন। তাঁর এই নীরবতার জন্য তাঁকে অনেকে নিরীশ্বরবাদী বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সংস্কার বা কুসংস্কার ছিল সর্বজনীন। তাই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকে তিনি সর্বদা পৃথকভাবে দেখতেন। (ঋষি, ১৯৭১ : ৪৯)

বিশেষ করে, বিধবা বিবাহ প্রথা শুরু করার জন্য সনাতন সমাজের চোখে শত্রু হয়ে গেলে তাঁর সংস্কারপ্রচেষ্টা সফল করা কঠিন হয়ে যেত। এ কারণে সনাতন ধর্মের সকল আচারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তিনি কথা বলেননি। বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য যেটুকু আচার ও প্রথা নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন, ভালোভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সেটুকু অংশ নিয়েই বিতর্ক করেছেন পত্রিকায়। এগুলোও তাঁর প্রজ্ঞাময় কৌশলের অন্যতম প্রকাশ হিসেবে আমরা বিবেচনা করতে পারি।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু করার আগে বিদ্যাসাগর আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন এবং সে কৌশল যে সুচিন্তিত ছিল, তা আমরা বুঝতে পারি তাঁর 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' (১৮৫৫) পুস্তিকার সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে। এখানে তিনি বলেছেন যে, বিধবাবিবাহ চালু করতে গেলে রক্ষণশীল সনাতন সমাজকে আগে এই কাজটিকে তাদের কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করাতে হবে। আর আচার ও শাস্ত্রনির্ভর তৎকালীন সমাজকে যে যুক্তির মাধ্যমে বিধবাবিবাহকে কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করানো যাবে না, তা তিনি জানতেন। তিনি এও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শুধু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েই তাদেরকে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা বোঝানো সম্ভব :

> কিন্তু যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশের শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই কর্ত্তব্যকর্ম্ম। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক। (উদ্ধৃত, বিনয়, ২০১১ : ২৪৬)

একারণে সনাতন ধর্মের আচার ও সংস্কার সম্পর্কে উদাসীন বিদ্যাসাগর নতুন করে প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ ঘেটে বিধবাবিবাহের পক্ষে তথ্য ও ব্যাখ্যা খুঁজে বের করলেন। তারপর সেসব তথ্যকে সুসংবদ্ধ করে রূপ দিলেন উপর্যুক্ত পুস্তিকায়। আর ধর্মশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য এসময় তিনি রাতেও কলেজেই থাকতেন।[৮] তাঁর এই তথ্যসমৃদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত, কৌশলী রচনাগুলো বিধবাবিবাহের পক্ষ-বিপক্ষের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উক্ত পুস্তিকাটি এত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণের দুই হাজার কপি শেষ হয়ে যায়। এই বই প্রকাশের পর রক্ষণশীল পণ্ডিতরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। বিধবাবিবাহকে আইনগত বৈধতা দেওয়ার কাজ করতে গিয়ে তাঁর শত্রু বেড়েছিল। এই গ্রন্থের প্রতিবাদে তারাও বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেন– যেখানে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত যুক্তিখণ্ডনের চেয়ে তাঁর প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বিধবাবিবাহ আন্দোলন গতিশীল হলেও এর বিরুদ্ধপক্ষও সরব হয়ে উঠে। উভয় দলের পক্ষে-বিপক্ষে নানা কবিতা, গান, ছড়া, পালাগান রচিত হতে থাকে। কিন্তু বিদ্যাসাগর শাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রমাণ করে দিলেন। ফলে বিদ্যাসাগরের সমর্থক ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু "বিদ্যাসাগর জানতেন, বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ করলেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা যাবে না। কারণ, বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করতে না পারলে বিধবা বিবাহের ফলে জাত সন্তানরা পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হবে না" (ঋষি, ১৯৭১ : ৫৭)। তাই তিনি ১৮৫৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিধবাবিবাহের পক্ষে ৯৮৭ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে সরকারের কাছে বিধবাবিবাহ বৈধতা দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করেন। সেই আইনে বিধবার পুনরায় বিবাহজাত সন্তান যেন সমাজে বৈধতা পায় সে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেন। কিন্তু বিধবাবিবাহের বিপক্ষে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ভারত সরকারের কাছে ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষরসম্বলিত একটি দরখাস্ত জমা পড়ে ১৮৫৬ সালের ১৭ মার্চ। এরপরও ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। একই সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিয়েতে বর ছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কনে কালীমতি দেবী। বিদ্যাসাগর নিজে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা তার নিজের পরিবারেও

বাস্তবায়িত করেছেন। ১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভাবসুন্দরীর বিয়ে দেন। আত্মীয়স্বজনের আপত্তির পরেও এই বিয়েকে সানন্দে বরণ করেছেন তিনি। অবশ্য তাঁর পুত্রেরও এতে সম্মতি ছিল। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত ১১ বছরে ৬০টি বিধবাবিবাহ দিতে তাঁকে ৮২,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। এতে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এসব বিধবাবিবাহে যারা তাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন, তাদের অনেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ফলে তাঁকে বিপদাপন্ন হতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজসংস্কারের মনোবল হারাননি তিনি। এসময় তাঁকে নানা রকম হুমকির শিকার হতে হয়েছে। আশঙ্কা ছিল তাঁর প্রাণনাশেরও। ফলে বিদ্যাসাগরের পিতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য লাঠিয়াল পর্যন্ত নিয়োগ করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই হয়তো চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতো। কিন্তু দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগর একটুও ভয় পাননি। তিনি বুঝেছিলেন, দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলচিত্ত ও ভীরু সত্তা দ্বারা এত বড়ো সংস্কার কাজ অসম্ভব। তাই তিনি নির্ভয়ে তাঁর আন্দোলন চালিয়ে নিয়েছেন। বিদ্যাসাগরকে সামাজিক জীবনে নানা রকম ব্যঙ্গের শিকার হতে হয়েছে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উচ্চশিক্ষিত বাঙালি তাঁর বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) উপন্যাসে সূর্যমুখীর মাধ্যমে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলেছেন।[২] বিদ্যাসাগর স্বভাবে জেদি হলেও এসব ব্যঙ্গের সরাসরি কোনো জবাব দিতে যাননি। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজসংস্কারের বৃহৎ মহৎ কাজকে সফল করতে হলে মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। সবার ব্যঙ্গের জবাব দিতে গিয়ে শক্তি ও সময় নষ্ট করলে সংস্কার কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই ধৈর্য ধরে এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছেন তিনি।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা সংস্কার

'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে বিদ্যাসাগরের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল বারো বছর বয়সে। এটি বিদ্যাসাগরের প্রথম সামাজিক লেখা। এই লেখাটি খুব বেশি আলোচিত হয়নি। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর "বহুবিবাহ রহিত হওয় উচিৎ কি না– এতদ্বিষয়ক বিচার"। একই শিরোনামের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। বল্লালী আমলের কৌলীন্য প্রথার কারণে কুলীন ব্রাহ্মণরা বহুবিবাহের মতো অপকৃষ্ট প্রথায় আবদ্ধ ছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে ১৮৪২ সালে প্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় কলম ধরেছেন। ১৮৫৫ সালে প্রথম কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণের আবেদন করেন। একই বছর বিদ্যাসাগরও অনুরূপ আবেদন করেন (গোপাল, ১৯৯১ : ৫০)। ক্রমে জনমত সৃষ্টি হতে থাকা এই আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে। সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে ছিল। তাই সরকার নতুন করে বহুবিবাহ প্রথা রদ করে ধর্মীয় আবেগে আঘাত দিতে চাননি। "পরে ছোটলাট সিসিল বীডনের সময় (১৮৬৬) আবার নতুন করে চেষ্টা হয়। আবেদনেও হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল, বিরোধীরাও সংখ্যায় সেরূপ" গোপাল, ১৯৯১ : ৫০)। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই প্রথার সংস্কার বিষয়ে সরকারের উৎসাহ কম ছিল। তবুও সরকার সাত সদস্যের একটি কমিটি করেন। এই কমিটির পাঁচজন দেশীয় লোকের মধ্যে বিদ্যাসাগরও একজন ছিলেন। এই কমিটি মত দিলেন যে, বহুবিবাহ একটি কুপ্রথা– তাই এই প্রথা সময়ের সঙ্গে আপনা-আপনিই উঠে যাবে। বিদ্যাসাগর অবশ্য দ্বিমত পোষণ করে এই প্রথা বন্ধের আইন চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের অনিচ্ছার

কারণে সেই আইন প্রণিত হয়নি। তবুও বিদ্যাসাগর তাঁর স্বনামে ও বেনামে প্রকাশিত পুস্তিকার মাধ্যমে বহুবিবাহের বিপক্ষে লেখালেখি চালিয়ে যান। এভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে লেখালেখির মাধ্যমে জনমত তৈরির কৌশল অবলম্বন করেন তিনি।

উপসংহার

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে নানা রকম প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এসব প্রতিকূলতাকে দূর করার জন্য তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছে নানা কৌশলের। শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে যখন তাঁর সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিতর্ক ও মানসিক অনৈক্য হয়েছে, তখন তিনি প্রথমে যুক্তি দিয়ে তাঁর অভিমতকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সেই যুক্তি কখনো কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, কখনো প্রতীয়মান হয়েছে ভ্রান্তরূপে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর নীতি ও আদর্শের জায়গায় কখনো ছাড় দেননি। প্রয়োজনে পদত্যাগ করে বরণ করে নিয়েছেন অর্থকষ্টকে। আবার ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অনেক সিদ্ধান্তে যেমন তিনি প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি সরকারের অনেক নীতিতেই সহযোগের মাধ্যমে সংস্কারকর্মকে এগিয়ে নিয়েছেন। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে ছিল বলে ধর্মগ্রন্থ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও বহুবিবাহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন। পারিপার্শ্বিক চাপ ও প্রাণনাশের ভীতিকে জয় করেই তিনি অব্যাহত রেখেছেন তাঁর সমাজসংস্কারের অগ্রযাত্রাকে। গভীর আত্মবিশ্বাস, অদম্য মানসিকতা, কঠোর পরিশ্রম ও বিচক্ষণ ভবিষদ্‌দৃষ্টির সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌশলী হয়েছিলেন বলেই শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা একজন সফল বিদ্যাসাগরকে পেয়েছি।

টীকা

১. এ বিষয়ে বিহারীলাল সরকার বলেন : "রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহের আন্দোলনকালে তিনি প্রায়ই সংস্কৃত কলেজেই রাত্রি যাপন করিতেন এবং নিজ মত সমর্থনার্থ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন" (বিহারীলাল, ১৯৯১ : ১৪৮)।

২. বিষবৃক্ষ উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখী একটি পত্র লেখে কমলমণিকে। পত্রের এক জায়গায় সে বলে : "ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করেছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" (বঙ্কিম, ১৩৬০ : ১৭৯)

সহায়কপঞ্জি

ইন্দ্র মিত্র (২০০১)। *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
ঋষি দাস (১৯৭১)। *বিদ্যাসাগর*। অশোক প্রকাশন, কলকাতা।
গোপাল হালদার (১৯৯১)। *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর*। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৬০)। *বঙ্কিম রচনাবলী*। (প্রথম খণ্ড : সমগ্র উপন্যাস)। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
বিনয় ঘোষ (২০১১)। *বিদ্যাসাগর ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। অরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০২০)। 'ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রশাসন ও বিদ্যাসাগরের যুদ্ধ'। *কালি ও কলম* (সপ্তদশ বর্ষ : নবম-দশম সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর)। সম্পাদক : আবুল হাসানাত। ঢাকা।
বিহারীলাল সরকার (১৯৯১)। *বিদ্যাসাগর*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।
শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯৮২)। 'বিদ্যাসাগর যুগ'। *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*। সম্পাদক : বিশ্বনাথ দে। সাহিত্যম, কলকাতা।

লোক-ইমেজ সংস্কৃতি : রিকশাচিত্রে পদ্মমোটিফ

দীপ্তি রানী দত্ত*

[সারসংক্ষেপ : প্রয়োজনীয় উপাদানের জোগানদাতা শ্রমজীবী সাধারণ শ্রেণিকে এই প্রবন্ধে 'লোক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রাম বা নগর, স্থান যাই হোক না কেন, রূপান্তরিত অনুষঙ্গে 'লোক' টিকে থাকে। এবং লোকের হাতে প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় ইমেজ। আলোচ্য প্রবন্ধে লোক-সৃষ্ট সেইসব ইমেজের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বরূপ বোঝার প্রক্রিয়া হিসেবে পদ্মমোটিফকে একটি প্রধান উদাহরণ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিবর্তিত রিকশাচিত্রে এটি দীর্ঘদিন ধরে একটি জনপ্রিয় মোটিফ হিসেবে টিকে আছে। পদ্ম মোটিফের জন্মসূত্র ও তার বিবর্তনের ধরন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান প্রেক্ষাপটে লোক-ইমেজ সংস্কৃতি বোঝার একটি প্রয়াস এই প্রবন্ধ।]

লোক-সংস্কৃতিতে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সহজলভ্য মাধ্যমে নিয়ত জন্ম নেয় ইমেজ। লোক-সৃষ্ট সেইসব ইমেজের ধারাবাহিকতায় নাগরিক পটভূমিতে রিকশাচিত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। প্রায় সত্তর বছরের রিকশাচিত্রের ইতিহাসে তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ইমেজ বা চিত্র। নানা মোটিফ এই ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ, বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় মোটিফ হলো পদ্মমোটিফ। লোক-ইমেজ সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝার প্রক্রিয়া হিসেবে পদ্মমোটিফকে একটি প্রধান উদাহরণ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিবর্তিত রিকশাচিত্রে যা দীর্ঘদিন ধরে একটি জনপ্রিয় মোটিফ হিসেবে টিকে আছে। পদ্ম মোটিফের জন্মসূত্র ও তার বিবর্তনের ধরন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান প্রেক্ষাপটে লোক-ইমেজ সংস্কৃতি বোঝার একটি প্রয়াস এই প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনটি ধাপে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। প্রথম ধাপে 'লোক'-এর সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ধাপে লোক-ইমেজ নির্মাণের প্রকরণ, তৃতীয় ধাপে লোক-ইমেজ হিসেবে রিকশাচিত্রে পদ্মমোটিফের ব্যবহার ও বিবর্তন এবং শেষ ধাপে লোক-ইমেজ, তথা পদ্মমোটিফ বিবর্তনের পেছনের কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে।

১.

লোকের তৈরি ইমেজ ও তার সংস্কৃতি বোঝার আগে প্রথমেই লোক-কে কীভাবে এই প্রবন্ধে দেখা হবে তা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক—

> বেঁচে থাকার সংগ্রামের সামষ্টিক প্রয়াসের অংশ হিসেবেই জগতে মানুষসৃষ্ট বস্তুগত উপাদানের উদ্ভব ঘটে। সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সাথে সাথে, যার চরিত্র রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে শিকারনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা শ্রেণি বিন্যস্ত অন্য এক সমাজ-কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সমাজ কাঠামোতে দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হতে থাকে– ১. সামষ্টিক ও ২. ব্যষ্টিক। আর এই দুটি চরিত্রগুণ তৈরির পেছনে দুটি মূল প্রভাবক শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে– ১. ভৌগোলিক চরিত্র ২. অর্থনৈতিক কাঠামো। এর ফলে মানুষসৃষ্ট বস্তুগত উপাদানও এই দুটি প্রভাবক নিয়ন্ত্রিত হয়ে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক গুণে আবর্তিত

* সহকারী অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> হয়। একদিকে সমন্বিত সৃষ্টি, যা দেখা যায় প্রয়োজনের তাগিদে আদিম জীবনের সূচনালগ্নেই। অন্যদিকে মানুষের চিরন্তন আমিত্ব বোধ। যা সমাজ বিকাশের স্তরে স্বতন্ত্র ক্ষমতা কাঠামো নির্মাণের সুযোগ নিয়ে বিকশিত হয়েছে। যার প্রথম ক্ষেত্রটিতে লোকশিল্পের এবং দ্বিতীয়টিতে পরিমার্জিত বা অভিজাত শিল্পের দেখা মেলে। অন্যভাবে বলা যায়, সবসময় সমাজে এই দুটি সংহত, সমন্বিত এবং সমভাবাপন্ন শ্রেণি স্পষ্টতই বিদ্যমান থাকে, যার একটি প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান দেয় এবং অন্যটি প্রয়োজন উৎপাদন করে। (দীপ্তি, ২০১২ : ১)

এই প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগানদাতা শ্রমজীবী সাধারণ শ্রেণিকে এখানে 'লোক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যা–

> কেবল গ্রামে বাস করে না, শহরেও বাস করে। শহরেও অশিক্ষিত শ্রমজীবি মানুষ আছে, তারা গ্রাম থেকে শহরে ভীড় জমায়, তারা পূর্বের ও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে লোককলার জন্ম দেয় ও চর্চা করে। (ওয়াকিল, ২০০৭ : ৭)

এবং পটভূমির পরিবর্তনের সাথে সাথে নিঃশেষ হয় না, নতুন অনুষঙ্গে রূপান্তরিত হয়, টিকে থাকে।

> Folklore is not antiquated, old, old-fashioned, outdated, exotic or wholly rural. It is not dying out when rural life changes even drastically. Nor does it die out when urban life becomes more cosmopolitan or technologically far more sophisticated and complex. When some elements of folklore become extinct, it does not mean that folklore is declining or on the verge of extinction. Broadly speaking, folklore never dies out but transforms, especially in the urban context. (Shamsuzzaman, 2016 : 9)

এখন প্রশ্ন হলো এইসব লোকের হাতে ইমেজ কীভাবে নির্মিত হয়? গ্রামীণ প্রেক্ষাপট থেকে যখন নগরে 'লোক'-এর স্থানান্তর ঘটে, তখন এই ইমেজ নির্মাণের প্রক্রিয়াটিও কি রূপান্তরিত হয়? যদি রূপান্তর ঘটে, তবে তার স্বরূপটি কেমন? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য রিকশাচিত্রে বিশেষ করে পদ্মমোটিফের ব্যবহার ও তার রূপান্তরের প্রকরণ-পাঠের চেষ্টা করা হবে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে।

২.

প্রাথমিকভাবে লোক-ইমেজ নির্মাণ-প্রকরণের দুইটি ধাপকে চিহ্নিত করা যায়– প্রথমত আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হলো অনুকরণ। আদিতে গুহাচিত্র থেকে ব্রতে, পরবর্তীকালে গ্রামীণ লোকশিল্পে এইসব প্রকরণের দেখা মেলে। অভিজাত শিল্পেও এই দুটি স্তর ইমেজ নির্মাণের পেছনে কাজ করেছে। লোক ও অভিজাত– এই দুই শ্রেণিতেই যখন উল্লিখিত দুটি প্রকরণের দেখা মেলে, তখন প্রথমে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া দরকার– আকাঙ্ক্ষার ধরন কেমন এবং কিসের অনুকরণ বা কেন অনুকরণ? এবং এই দুই প্রকরণ সাধারণ ও অভিজাত শিল্পে কীভাবে কাজ করে?

আকাঙ্ক্ষার প্রাথমিক রূপটি ছিল প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য সংগ্রহ, তথা জীবন রক্ষার সাথে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক খাদ্য-সংগ্রহভিত্তিক জীবন-প্রক্রিয়া থেকে কৃষিভিত্তিক জীবনে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ছিল। আকাঙ্ক্ষা, জীবন তথা জীবিকা নির্বাহ মূলত শ্রমের সাথেই সম্পর্কিত। শ্রমের

কাঙ্ক্ষিত ফল কী হবে এবং সেই ফল যেন নস্যাৎ না হয়– দুটি বিষয়েই নিশ্চয়তা তৈরির আকাঙ্ক্ষা থেকে, আদিম জীবন থেকে কৃষিসভ্যতা পর্যন্ত– মানুষ তার কর্মকে প্রত্যক্ষ কিছু আচরিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে। ক্ষেতে ফসল ফলানো হবে, যেন ক্ষেত ভরে ওঠে সোনার ধানে। প্রথম অংশ শ্রম, পরেরটুকু আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাই নির্মাণ করে প্রাথমিক ইমেজের ইতিহাস। শ্রমের সাথে কাঙ্ক্ষিত ইমেজের সম্মিলনে পূর্ণতা প্রাপ্তি, যা গুহাচিত্র থেকে পরে ব্রতচিত্রে বিকশিত হতে দেখা যায়। এভাবে লোক-মানস তার আকাঙ্ক্ষার কতগুলো ইমেজ তৈরি করে। ইমেজ এখানে নিজেই পুরো ক্রিয়ার বাস্তবিক অংশ, যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ঘটনা বাস্তবরূপ, তথা পূর্ণতা পাবে। এইসব ইমেজ লোক-মানস নির্মাণ করে তার দেখা বস্তুজগতের রূপের সদৃশ আরেকটি রূপ হিসেবে– যা তার কাঙ্ক্ষিত। এই প্রক্রিয়ায় ইমেজ নির্মাণকে বলা হয় অনুকরণ। অনুকরণ করা ইমেজে মূলত লোকের দেখা জগতই নির্মিত হয়। ফলে তার ক্ষমতা ধারণাটিও গড়ে ওঠে তার দেখা বস্তুজগত তথা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে।

অন্যদিকে আইডিয়া বা ধারণা পুরোহিত বা রাজার শাসন রক্ষাকারী একটি হাতিয়ার। যেখানে ইমেজ এমন এক আকাঙ্ক্ষার নির্মাণ করে, যা মূলত প্রাগৈতিহাসিক জাদু বিশ্বাসের বিপরীত দিকে যাত্রা করে। শাসক এমন এক ইমেজ নির্মাণ করতে চায়, যে ইমেজের জাদুতে আটকে থাকবে লোক-মানস। ফলে এখানে প্রকৃতি তথা দৃশ্যমান বস্তুজগত নয়, বরং লোক-মানসকে শাসন করতে এক অতি-প্রাকৃত সত্তা নির্মাণ করা হয় বা অতিপ্রাকৃত সত্তাকে দৃশ্যমান করা হয়। যদিও এই সত্তা-নির্মাণের ধারণা মানুষ প্রথম প্রকৃতি থেকেই লাভ করেছিল। আকাঙ্ক্ষা, লোক-মানস এতে ধরা দেবে। ফলে এর মধ্য দিয়েই শাসকের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

তাহলে নতুন ইমেজ নির্মাণ করে কে?

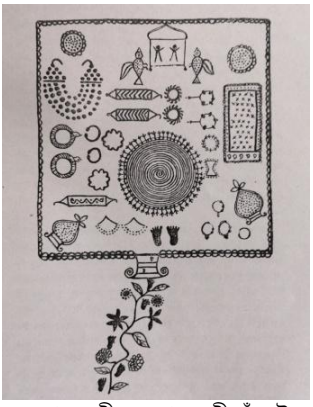
শাসক তার ধারণার অনুগামী ইমেজ নির্মাণ করে। সেদিক বিবেচনায় শাসকের ইমেজকে ধারণাশিল্প এবং লোক-ইমেজকে অনুকরণ শিল্প বলা যায়। বলা যায়, লোকের আকাঙ্ক্ষার ধরন সাধারণভাবে ইমেজে প্রকাশ পায় বাস্তবিক অভিজ্ঞতার অনুরূপ, তাই তার ইমেজ দেখা জগতের অনুকরণ। আর লোক-মানসের এই আকাঙ্ক্ষাকে অভিজাত বা শাসক শ্রেণি এমনভাবে ইমেজে রূপান্তরিত করে, যেন অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে সে হাজির করতে পারে। ফলে তার ইমেজ আকার-আকৃতি এবং রচনা-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে লোকের দেখা জগতের বাইরে এক অদেখা ইমেজ হিসেবে হাজির হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বস্তুজগতের অভিজ্ঞতার আলোকে যে লোক-ইমেজ নির্মিত হতে শুরু করে, সেই লোক-মানসে শাসকের নতুন ইমেজের ভূমিকা কী? শাসকের ইমেজ কি লোকের কাছে কেবলই একটি দৃশ্যবস্তু, নাকি ক্ষমতা-বস্তু?

লোক-ইমেজ যেখানে থাকে হাতের নাগালে, সেখানে অভিজাত বা শাসক শ্রেণির ইমেজ মানুষের ক্ষমতাকে প্রশ্ন করে তাকে অধীনস্থ করতে চায়। পদ্ম-ব্যবহৃত ইমেজের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হবে লোকের ইমেজ নির্মাণের প্রকরণ। একইসঙ্গে শাসকের ইমেজ একই মোটিফ থেকেও জন্ম নিয়ে কীভাবে আলাদা হয়ে যায় তাও এই বিবর্তনে ধরা পড়ে।



চিত্র ১ : লক্ষ্মীব্রতের মাঝের খুঁটির গোড়ায় আলপনা



চিত্র ২ : বসনভূষণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদি

ব্রত লোকসংস্কৃতির একটি আদিমতম রূপ। পরবর্তীকালে ধর্মের প্রসারের সাথে সাথে ধর্মীয় ইমেজে পদ্মের ব্যবহার দেখা যায়। তাই ব্রত বা লোকসংস্কৃতিতে, ধর্মীয় নানা মূর্তির অনুষঙ্গে, অভিজাত চিত্রকলায় এবং সবশেষে রিকশাচিত্রে পদ্মের ব্যবহার, পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোক-ইমেজ নির্বাচন ও নির্মাণের প্রকরণ ব্যাখ্যা করা হবে।

১ এবং ২ ইমেজ দুটি লক্ষ্মীব্রতের। ব্রতের অনুষঙ্গ হিসেবেই পদ্ম এখানে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, নাকি তাতে শাস্ত্রীয় প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল– এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু কতগুলো ধারণা সাপেক্ষে এর সমাধানের দিকে এগোনো যায়। তাই প্রথমে দেখে নেওয়া যাক ব্রত কী–

> ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়... বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত...। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ১১)।

এই ব্রতের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমেজের (যা আলপনা নামে পরিচিত) সম্পর্ক থাকে। ব্রত এবং ইমেজের সাথে লৈঙ্গিক সম্পর্কের দিকটিও উনিশ ও বিশ শতকের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাঁচে গড়ে উঠেছে (শিল্পের মালিকানা নির্মাণের উনিশ শতকীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্য প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)–

> জাদু বিশ্বাস থেকে সম্ভূত হলেও আলপনা একান্তভাবে ব্রত শিল্প নয়, তবে মেয়েলি শিল্প অতি-অবশ্যই। ব্রতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও আলপনা একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রথাগত আদিম শিল্পপ্রকরণ...। (খগেশকিরণ, ১৯৮৭ : ১৬)

এই আদিম শিল্পপ্রকরণ–আলপনাকে অবনীন্দ্রনাথ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– 'অক্ষর বা চিত্রমূর্তি' এবং 'শিল্পকার্য'। প্রথম ভাগে শিল্পী বা ব্রতীর মন যা চায়, তাই আঁকা হয়, যাকে অবনীন্দ্রনাথ 'মানচিত্র' বলছেন। দ্বিতীয় ভাগ শিল্পীর কল্পনা-আশ্রিত। ফলে তাকে তিনি শিল্প বলছেন। অবনীন্দ্রনাথের এই শ্রেণিকরণ অনুযায়ী চিত্র ১ 'শিল্পকার্য' এবং চিত্র ২ 'মানচিত্র'। দেখা যাচ্ছে, এখানেও অনুকরণ এবং ধারণা বা কল্পনা-আশ্রিত শিল্পের শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

এই শ্রেণিকরণ কে করছেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে বসে করছেন, তা যেমন নজরদারি দাবি করে, তেমনি ব্রতকেন্দ্রিক ইমেজ কতটুকু চিত্রমূর্তি, আর কতটুকু শিল্পকার্য, তা নির্ধারণ করার আগে ব্রতের লৌকিক প্রাথমিক রূপটি জানা প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ-ই জানাচ্ছেন–

> হিন্দুধর্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন অদলবদল হয়ে গিয়েছে যে, এখন যে ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প, এবং দু-চারটি ছাড়া সেগুলিও খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাই। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ১১)

একইভাবে লৌকিক ব্রতের শিল্পকার্যের আদিরূপও মূলত বাস্তবরূপের অনুকরণ থেকে উদ্ভূত। ক্রমে যা বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে 'অলংকরণ' বা 'শিল্পকার্য'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই বলা যায়, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার যে আয়োজন তাই ব্রত। আর যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য যে ব্রত করা হচ্ছে, সেই ব্রতে সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর ইমেজ আঁকাই মূল বিষয়। যেমন লক্ষ্মীব্রতে 'লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেঁচা এবং ধানছড়া হলো আলপনার প্রধান অঙ্গ (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ২৩)।' লক্ষ্মীব্রত এখনও বাংলার সনাতন ধর্মপন্থীদের একটি সাধারণ আচার। যেখানে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন এবং ধানছড়া মূলত লক্ষ্মীব্রতের প্রধান অঙ্গ। যদিও লক্ষ্মীর পদচিহ্নও মৌলিক ব্রতের অংশ কিনা, সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তবে বর্তমান লক্ষ্মীব্রতের আলপনার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে খুঁটির গোড়ার আলপনায় যে পদ্ম ব্যবহার করা হচ্ছে, তা মূলত অলংকরণের জন্য।



চিত্র-৩ : নকশী কাঁথায় পদ্মের ব্যবহার (সূত্র : Perveen Ahmed. The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha. Bangladesh National Museum Collection, Dhaka 1997)

জাদু বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরেও লোকজীবনে পদ্মের ইমেজ ব্যবহৃত হয়েছে নকশী কাঁথায় (চিত্র ৩)। আবার ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকস্তম্ভে পদ্মের মোটিফ দেখা যায়। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম-প্রধান শিল্পে পদ্ম ব্যবহার করা হচ্ছে আসন হিসেবে (চিত্র-৪)। অজন্তা গুহাচিত্রে অবলোকিতেশ্বরের হাতে পদ্ম দেখা যায়। একই রীতিতে পরবর্তীকালে বুদ্ধ ও সনাতন দেব-দেবীর হাতে পদ্ম দেখা যায়। অজন্তাচিত্রে অভিজাত সরোবরে হাঁস ও পদ্মের প্রাচুর্যও চোখে পড়ে (চিত্র ৫)। (সূত্র : Herringham, 1998 : 36)



চিত্র-৪ : পদ্মের ওপর উপবিষ্ট ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধ



চিত্র ৫ : অজন্তা গুহাচিত্রে হাঁস ও পদ্ম

পদ্ম ও হাঁস দেখা যায় উনিশ শতকে রবি বর্মা চিত্রিত লক্ষ্মীর সরোবরেও (চিত্র ৬), যেখানে ধর্মীয় প্রয়োজনের চেয়ে সৌন্দর্যের বয়ান প্রধান হয়ে ওঠে। পদ্মের এই ধারাবাহিক ইতিহাসে পদ্মের গুরুত্ব কী? নিরেট সৌন্দর্য ধারণার পাশাপাশি আর কীভাবে পদ্মকে দেখা হয়?

> পদ্মকে সৃষ্টির প্রাথমিক প্রতীক (The prime symbol of creation) বলে ধরা হয়। সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের আকারবিহীন জড়পিণ্ডবৎ অবস্থা বা Chaos-এর ওপর পদ্মর মতো Cosmos বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসমান ছিল। পদ্মের মূল মাটিতে, ভাসে পানিতে, চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। এই তিনের সমন্বয় ঘটে পদ্মে। পুরাতন বিশ্বাসে তাই পদ্মের স্থান ব্যাপক। (শীলা বসাক উদ্ধৃত, ২০০২ : ৭০)

একইভাবে 'আ ডিকশনারি অব সিম্বলস'-এ বলা হয়েছে–

> In Egypt, the lotus symbolizes nascent life, or first appearance...This symbol finds other forms of expression in many different ways, but always related

> to the symbolism of numbers, that is, depending upon the number of petals'. From the remotest days of antiquity, the lotus was the unanimous choice of the chinese, the Japanese, the Hindus, the Egyptians and the Aryans. The lotus flower growing out of the navel of Vishnu, symbolizes the universe growing out of the central sun-the central point or the 'unmoved mover'. (Cirlot, 1971 : 193)

পদ্মকে ঘিরে জন্ম নেওয়া এইসব ধারণাকে বিবর্তনের নানা স্তর হিসেবে দেখলেও একটি মৌলিক সূত্র এখানে চিহ্নিত করা যায়। সেটি হলো পদ্মের সাথে জন্মের একটি সম্পর্ক রয়েছে। যে সম্পর্কটি আরও স্পষ্ট হয় পাপড়ির সংখ্যাকে সাধারণভাবে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তাই 'শতদল পদ্ম, প্রস্ফুটিত পদ্ম, শঙ্খপদ্ম, মঙ্গলাপদ্ম, অষ্টদল পদ্ম, চরণপদ্ম, মীন পদ্ম,' (খগেশকিরণ পৃ. ২১) ইত্যাদি নানা পদ্মের নামও মিলে যায়। জন্ম ও এর সংখ্যাবৃদ্ধি যদি এর মূল প্রতীকী গুরুত্ব হয়ে থাকে, তবে এর সাথে উর্বরতার আদি সম্পর্কটিই বেরিয়ে আসে। "It was also associated with the worship of Indian mother-Goddesses from very early times, as a symbol of the cosmic womb" (Hall, 1996 : 149). একই লোক-প্রকরণ 'কোলে পো, কাঁখে পো' পুতুলের মধ্য দিয়েও দৃশ্যমান হয়। ফলে পদ্মের বৈচিত্র্যপূর্ণ নাম ও তার ব্যবহার এ কথাও প্রমাণ করে যে, এ অঞ্চলে ভৌগোলিকভাবে এই ফুলের প্রাচুর্যও ছিল অফুরান।

তাই পদ্মের পাপড়ির সাথে জন্মের সম্পর্ক খোঁজার প্রয়াসটিকে প্রাথমিক তাৎপর্য হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। আর বিষ্ণুর নাভি-কেন্দ্র ধারণাটিকে দ্বিতীয় স্তরিক প্রয়াস বলা যায়। কেন্দ্র ধারণাটি লোক-মানসের নয়। ব্রতের যে কয়টি মৌলিক ইমেজ এখনও পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাবে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর ইমেজই তাতে দৃশ্যায়িত হয়েছে একটি কেন্দ্রবিহীন বয়ান ধারণায়। তবে বস্তুর আকার-প্রকারের অভিজ্ঞতানুযায়ী ইমেজ ছোটো-বড়ো হয়।

এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে দ্বিতীয় ধারণাটি শাসকের কেন্দ্র ধারণা নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। আদিমতম উর্বরতার প্রতীক পদ্ম– শাসকের বাহন বা আসন হয়ে উঠেছে। যার সাথে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিবর্তনের ধাপটিও পাঠ করা যেতে পারে। তৃতীয় ধাপে শাসকের শক্তি প্রচারের জন্য বহুল ব্যবহৃত পদ্মই আবার লোকের হাতে অলংকরণের উপকরণ হিসেবে ফিরে আসে। অভিজাত শিল্পেও, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের তাত্ত্বিক পাঠের পাশাপাশি পদ্মের বস্তুগত সৌন্দর্য চেতনাটিও সক্রিয় ছিল। অর্থাৎ অনুকরণ এবং কল্পনা বা ধারণাকেন্দ্রিক ইমেজ নির্মাণের দুটি তত্ত্বই তাতে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখান থেকে রাজা রবি বর্মার ছাপচিত্রটির দিকে (চিত্র ৬) এবার ফেরা যাক। ঔপনিবেশিক ভারতে ভারতীয়ত্ব নির্মাণের একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে রবি বর্মার কাজকে, যেখানে ধর্ম একটি উপাদান হিসেবে উপস্থিত হয়। তারই সাক্ষী এই ইমেজ। 'Ravi Varma appeared to fit ideally the colonial prescriptions for a new improved Indian art' (Tapati Guha, 2008 : 108)



চিত্র ৬ : লক্ষ্মী, রাজা রবি বর্মা, ১৮৯৪

ঔপনিবেশিক শাসনের কালে কেন্দ্রের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে। ভারতবর্ষ তখন প্রান্তে রূপান্তরিত। দেশজ চেতনায় রবি বর্মা সেই কেন্দ্র ধারণা পুনর্নির্মাণে বা ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করানোর কাজে হাত দেন। ফলে এই ধরনের প্রচুর ইমেজ ছাপচিত্র মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর এর মধ্য দিয়ে মন্দিরের দেবতা ভারতীয় নারী-পুরুষের আদর্শ ইমেজ হিসেবে রবি বর্মার কাজের মাধ্যমে হাজির হতে শুরু করে, যা দ্রুত জনপ্রিয়তাও লাভ করে। রিকশাশিল্পীরা কীভাবে এইসব জনপ্রিয় ইমেজকে গ্রহণ করেন?

৩.

পুরোনো ঢাকাকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকে রিকশাচিত্রের যে জন্ম ও বিকাশ, তার পেছনে সিনেমা ব্যানার পেইন্টিং-এর একটি ভূমিকা আছে। আবার দেখা যায় রবি বর্মা বা কোলকাতা আর্ট স্টুডিও নির্মিত ইমেজের প্রভাবক সম্পর্ক আছে সিনেমার বিষয় ও ভাষার সূত্র ধরে অঙ্কিত সিনেমা ব্যানার পেইন্টিং-এর সাথে (সূত্র : শাওন, ২০০৭ : ৪৫৩)। ঔপনিবেশিক শাসন ও সংস্কৃতির বিপরীতে এইসব 'ভারতীয়' ইমেজ জন্ম নেয় ও বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে অর্জন করে জনপ্রিয়তা। এসব 'ভারতীয়' ইমেজ প্রতিষ্ঠার অনেক পরে আসে সিনেমা ব্যানার

পেইন্টারদের যুগ। যাদের হাতেই বিশ শতকের মাঝামাঝি রিকশাচিত্রের জন্ম। কারণ প্রথম দিকে রিকশাপ্লেটটি সিনেমা ব্যানার চিত্রীরা করে দিতেন। বাকি অলংকরণের কাজ করতেন অন্যরা। পরে রিকশাশিল্প বিকাশের সাথে সাথে তা স্বকীয় রিকশাশিল্পী গোষ্ঠীর জন্ম দেয়।

শিল্পীদের সাথে কথা বলে দেখা যায়, তারা বেশিরভাগই কোনো না কোনো নির্দেশনা ধরেই কাজ করেন। যারা নতুন ইমেজ তৈরি করেন, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়–

> The rickshaw artists derive their inspiration from various sources- calenders, magazine pictures, film posters, and so on. When I visited Ahmed Art he showed me a boxful of cuttings which he had collected for future use. (Rob, 1992 : 646)

বাকিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব ইমেজ জনপ্রিয় হয়, সেগুলোই তারা বেশি করে কপি করেন। একাধিক সূত্র বলছে রাজকুমার (আর কে) দাস পদ্ম বা শাপলার ওপর তাজমহল আঁকা প্রথম শুরু করেন এবং পদ্মের ওপর তাজমহল বা মসজিদ ছিল একটি জনপ্রিয় ইমেজ।

> A favorite religious image for the backboard is the mosque with its ablution pool, or the Taj Mahal floating on a lotus or water lily, an image created originally by Das. Another favorite is a little boy praying before a Qur'an stand; above him are representations of the holy cities of Makkah and Madinah and renderings of other religious themes, borrowed from ever-popular calendar scenes. (Joanna and Kevib, 1994 : 34)

যদিও আর. কে. দাস একে পদ্ম বলেই আলোচ্য প্রবন্ধ লেখকের কাছে উল্লেখ করেন। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগ পর্যন্ত শাপলার ব্যবহার চোখে পড়ে না। সিএনজি (চিত্র ৭) এবং রিকশাতে (চিত্র ৯, ১০) এ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শাপলার পাপড়ির আকৃতি এবং পদ্মের রঙের সমন্বয়ে একটি ফর্ম রিকশাচিত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যদিও গোলাপি রঙের



চিত্র ৭ : সিএনজি'র বডিতে আঁকা পদ্ম ও শাপলার একটি মিশ্ররূপ, সাভার, ঢাকা, ২০১৭

শাপলাও হয়ে থাকে, তবু রিকশাচিত্রে পদ্ম মোটিফের বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে সাজালে সমন্বয়ের ধারণাটিই প্রধান হয়ে ওঠে। সাদা রঙের শাপলা সচেতনভাবে কিছু সিএনজিতে মাঝে মধ্যে দেখা গেলেও এর বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে না। রিকশাচিত্রে তো নয়ই। আবার শিল্পী স্থাপত্য হিসেবে মসজিদ নয়, মূলত পদ্মের ওপর তাজমহল-ই এঁকেছেন। চার মিনার বেষ্টিত তাজমহল স্থাপত্য ইমেজ হিসেবে ধর্মীয় দিক বিবেচনায় মুসলিম রিকশামালিক বা রিকশাচালক উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। অন্যদিকে প্রেমের সমাধির প্রতীক হিসেবে জনপ্রিয় তাজমহলকে পদ্ম ফুলের সাথে মিলিয়ে নিতে আর. কে দাসদের জন্যও ছিল একটি গ্রহণযোগ্য পথ। এ থেকে ইমেজ নির্মাণের নির্বাচনমুখী প্রবণতা এবং পেশাগত লড়াইয়ে টিকে থাকার স্বার্থে পরিবর্তিত সময়ের সাথে নতুন ইমেজ নির্মাণের প্রকরণ-সূত্রের দেখা মেলে। আর. কে. দাসের হাতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পেক্ষাপটে জন্ম নেওয়া এই ইমেজ এখনও একইভাবে এঁকে চলেছেন অন্যান্য রিকশাচিত্রীরা। এবং ছাপচিত্র মাধ্যমে একবিংশের প্রথম দশকে যে রিকশা-ছাপচিত্রের বিকাশ, সে মাধ্যমেও এটি বোধহয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছাপা ছবিগুলোর একটি (চিত্র ৮)।



চিত্র ৮ : ছাপাই ছবি, পদ্মের ওপর তাজমহল, ঢাকা, ২০১২

মন্দিরে বিষ্ণু বা বুদ্ধকে পদ্মাসীন করা, আর রবি বর্মার পদ্ম সম্বলিত ইমেজ আপাতভাবে যেমন এক নয়, তেমনি রবি বর্মা বা কোলকাতা আর্ট স্টুডিও'র ইমেজ থেকে পদ্ম নিয়ে আর. কে. দাস তাজমহল সংবলিত যে নতুন ইমেজ নির্মাণ করেন, তার স্বরূপও এক নয়। এক নয় একবিংশ শতকে রিকশাচিত্রে ব্যবহৃত পদ্ম ব্যবহারের ধরনটি। তবে মৌলিক প্রকরণে সাদৃশ্য রয়েছে।

পদ্মের ওপর তাজমহল রিকশাচিত্রে এখনও ব্যবহৃত হলেও নতুন রূপেও পদ্মের ব্যবহার যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি পদ্মকে সরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ইমেজও তৈরি হয়েছে। পদ্মের ওপরে তাজমহলের পরিবর্তে মসজিদ, মক্কা (চিত্র ৯, ১০), বা গ্লোব (চিত্র ১১) ব্যবহার হতেও দেখা যায়। পদ্মের ওপরের বস্তুকে শুধু প্রতিস্থাপন করার পরিবর্তে ফুলের প্রকারের রূপান্তর ঘটে একুশ শতকে। দেবদেবীকে সরিয়ে দিয়ে রাজকুমার দাস সত্তরের দশকে পদ্মকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ওপর তাজমহল বসিয়েছিলেন, আবার একুশ শতকে মুসলিম এবং হিন্দু উভয় রিকশাচিত্রীই গোলাপ ফুলের ওপর তাজমহল (চিত্র ১২) ও মক্কা (চিত্র ১৩) এঁকে চলেছেন।

কোথাও কোথাও পুরোপুরি পদ্ম বা ফুলকে সরিয়ে চাঁদের ওপর তাজমহল (চিত্র ১৪), আরও এক ধাপ এগিয়ে চাঁদের ওপর মসজিদ ও মক্কা (চিত্র ১৫) জায়গা করে নিয়েছে।



চিত্র ৯: পদ্মের ওপর মসজিদ, নেত্রকোণা , ২০১৬



চিত্র ১০ : পদ্মের ওপর মক্কা, নেত্রকোণা, ২০১৯



চিত্র ১১ : পদ্মের ওপর গ্লোব, ঢাকা, ২০১৮



চিত্র ১২ : গোলাপের ওপর তাজমহল, ঢাকা, ২০১৯



চিত্র ১৩ : গোলাপের ওপর মক্কা, সাভারের তৈরি রিকশা, ময়মনসিংহ, ২০১৮



চিত্র ১৪ : চাঁদের ওপর তাজমহল, ধামরাই, ঢাকা, ২০১৮



চিত্র ১৫ : চাঁদের ওপর মসজিদ ও মক্কা, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ২০১৮

হাতে আঁকা বা ডিজিটাল প্রিন্ট উভয় ক্ষেত্রেই পদ্মফুলের বদলে গোলাপের ব্যবহার এখন অনেক বেশি। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরে মেশিন চালিত রিকশায় মূলত ডিজিটাল প্রিন্টের বিভিন্ন সুন্দর বাড়ি বা ফুলের ইমেজ ব্যবহার করা হয় (চিত্র ১৬)।



চিত্র ১৬ : ময়মনসিংহ, নেত্রকোণায় এই ধরনের রঙের প্রাচুর্যপূর্ণ ইমেজ দিয়ে রিকশা সাজানো বেশি চোখে পড়ে, ২০১৯

ফুলের ওপর কোনো বস্তুকে বসানোর বদলে ফুলসহ অন্যান্য বস্তু ডিজিটাল মাধ্যমে কোলাজ করে ছাপচিত্র হিসেবে রিকশায় কয়েকটি ইমেজ জনপ্রিয়। যেমন– কোরআনের সামনে প্রার্থনারত বালকের ছবি নির্মিত হয় গোলাপগুচ্ছ ও মায়ের দোয়ার কোলাজে (চিত্র ১৭)। চাঁদ-তারা, হাত জোড় করে দোয়া করা– এসব ছাপিয়ে ইমেজে ফুল এবং 'মায়ের দোয়া' টেক্সট প্রধান হয়ে ওঠে। ফুল, পাখি, রং, মায়ের দোয়া ইত্যাদি মৌলিক বিষয় রিকশাচিত্রে পরিবর্তিত হয়নি। বরং এসবের অনুষঙ্গ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। একুশ শতকে পায়ে চালিত রিকশার জনপ্রিয়তা ও এর ব্যবহার নানা কারণে কমে যাওয়ায় রিকশাচিত্রে যেমন ইমেজের রূপান্তর ঘটেছে, তেমনি মেশিন চালিত রিকশা বা অটোরিকশার জনপ্রিয়তার কারণে রিকশাচিত্র নতুন উদ্যমে ফিরেও এসেছে। তবে হাতে আঁকার চেয়ে ডিজিটাল প্রিন্টের ব্যবহারই তাতে বেশি। রিকশা চিত্রকর এবং ডিজিটাল প্রিন্টের শ্রেণি এক নয়। তাই ডিজিটাল প্রিন্টের সাথে সংযুক্ত শ্রেণির শ্রেণি চরিত্র আলাদাভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। হতে পারে নতুন মাধ্যমে এটি আরেকটি রিকশা-মালিক বা চালকের সমমনা শ্রেণি বা প্রভাবক শ্রেণি বা উভয়ই। জনপ্রিয় ক্যালেন্ডার, পত্রিকায় ছাপা ছবি বা কার্ড থেকে ইমেজ বা মোটিফ পছন্দ করে হাতে নতুন ইমেজ আঁকা হতো প্রথম দিকে। কারও আঁকা একটি ইমেজ রিকশাচালক বা মালিকের পছন্দ হলে ওই ইমেজটিই রেফারেন্স হিসেবে পরবর্তী রিকশাচিত্রকরদের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। এই পদ্ধতিতে ইমেজ নির্বাচন, নির্মাণ ও বিস্তার প্রক্রিয়া জারি থাকে। ডিজিটাল মাধ্যমে ইমেজ নির্বাচনের কাজটি আরও দ্রুত করা হয়, যদিও প্রক্রিয়া প্রায় একই। কিন্তু আগে সংগৃহীত বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে যে ইমেজ সরাসরি রিকশাচিত্রীর হাতেই জন্ম নিত, এখন সে

ইমেজ কম্পিউটারের দোকানে তৈরি হয়। তা রিকশাচিত্রী বা রিকশা-ছাপচিত্রীর হাতে যায়। ফলে রিকশাচিত্রের ইমেজ নির্মাণে নতুন আরেকটি শ্রেণি প্রযুক্তির যুগে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আগ্রহের বিষয় হচ্ছে, গণমাধ্যমের এই যুগে প্রচুর ইমেজ নির্বাচনের সুযোগ থাকার পরও দেখা যায়, ঘুরেফিরে ডিজিটাল প্রিন্টেও একই ধরনের ইমেজ পুনরাবৃত্ত হতে, যা থেকে একটি সাধারণ শ্রেণিমানস চিহ্নিত করা যায়।



চিত্র ১৭ : ডিজিটাল রিকশা চিত্র, ময়মনসিংহ, ২০১৩

৪.

রিকশাচিত্রের ইমেজ সহজ ও সাবলীল, রঙের প্রাচুর্যে ভরপুর। রিকশাচিত্রীর ইমেজ নির্মাণ ও নির্বাচনের প্রকরণ লোক-ইমেজের সাধারণ প্রবণতারই চলমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। রিকশাচিত্রের বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করে অভিজাত শ্রেণির পক্ষে ইমেজ নির্মাণ করা সম্ভব নয়; যদিও-বা নির্মাণ করেন, তবে কত বড়ো বিনির্মাণ এখানে করেছেন, সেই গল্পটাই প্রধান হয়ে উঠত। রিকশাচিত্রে বিনির্মাণের তত্ত্বগত ধারণা নেই। তাহলে কোন শক্তি দিয়ে এই লোক-ইমেজ নির্মিত হচ্ছে?

> সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি যদিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চাপে ভারাক্রান্ত থাকে, তা সত্ত্বেও 'সাবলটার্ন' শ্রেণীগুলি তাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকেই মাত্র বেছে নেয়, সবটুকু নেয় না। ফলে ধর্মীয় জীবনের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মধ্যেও এক ধরনের স্তরবিন্যাস দেখা যায়। শাসকশ্রেণীর ধর্মবিশ্বাস আর তাদের অধীন শ্রেণীগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র পৃথক, এমন কী বিরোধী রূপও ধারণ করতে পারে। (পার্থ, ১৯৯৮ : ৫)

পদ্ম মোটিফের বিবর্তন বোধহয় এই সত্যটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ইমেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা যেমন গুরুত্ব পায়, তেমনি বাজারে ইমেজের প্রাচুর্যও ইমেজ নির্বাচনে প্রভাব রাখে। এই প্রভাব পারস্পরিক এবং নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। রিকশাচিত্রের বিস্তারের কালে গণমাধ্যমের চরিত্র বা সম্মতি উৎপাদনের রাজনীতিও স্মরণে রাখতে হবে। আর এই সামসময়িক রাজনীতির স্বরূপ স্বীকার করে বলা যায় যে, লোক বহুল প্রচলিত ইমেজ থেকেই তার ইমেজ নির্বাচন করে; এটি একটি সাধারণ সত্য। ভৌগোলিক রাজনীতিতে গ্রামীণ শিল্পে দেখা যায়, পরিবেশে যার প্রাচুর্য বেশি, তারই প্রাধান্য। দেশভাগের রাজনীতিতে পদ্মের ওপর তাজমহল,

মক্কা বা মদিনা বা বোরাক বা কোরআনের পাশে প্রার্থনারত বালক বা আরবি হরফ ইত্যাদি নানা সময়ে দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত রিকশাচিত্রে ইমেজের রাজনৈতিক প্রবাহ থেকেই কেবল একমুখী নির্বাচন নয় লোক-ইমেজ, এ কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লোক-মানস পরম্পরাগত কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই সুখ, দুঃখ যেমন সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তেমনি তা প্রকাশের জন্য আঞ্চলিক ইমেজ ফুল, পাখি, রং-ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাই ধর্মীয় রাজনীতির কারণে বুদ্ধ বা বিষ্ণু বা লক্ষ্মীকে সরিয়ে পদ্মের ওপর তাজমহল বা মক্কা বসে, আবার পদ্ম সরিয়ে দিয়ে গোলাপ আসে। তেমনি ইমেজ রাজনীতি গুরুতর হলেও পদ্মের ওপর তাজমহল টিকে থাকে। পাশাপাশি পদ্মের ওপর গ্লোব একটি বহুল ব্যবহৃত ইমেজ হয়ে ওঠে। প্রার্থনারত বালকের সামনে গোলাপ ও 'মায়ের দোয়া' প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিস্থাপন ঘটায়। এবং বস্তুজগতকেন্দ্রিক লোকের আকাঙ্ক্ষা, তথা লোক-মানস স্পষ্ট হয়। এ বিনির্মাণ লোক-ইমেজ সংস্কৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত। তত্ত্বমুখীনতা থেকে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় সুলভ-ইমেজ থেকে নিজের প্রয়োজন পছন্দানুযায়ী নির্বাচিত হয় ও নতুন ইমেজ নির্মিত হয় লোক-সংস্কৃতিতে। তাই প্রার্থনারত বালকের আকাঙ্ক্ষা 'মায়ের দোয়া'র মধ্যে মিশে যায়।

এই লোক-মানস নির্মাণে বস্তুগত অভিজ্ঞতা একটি প্রধান প্রকরণ। এইখানে শব্দগত মতভেদকে স্বীকার করে নিয়ে যদি মর্গানের মানব সভ্যতার সর্বজনীন সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের তত্ত্বকে স্বীকার করা যায়, তাহলে সভ্যতার ত্রিস্তরিক অভিজ্ঞতার ফসল বলতে হবে এই লোক-ইমেজগুলোকে। যেখানে উইলেনডর্ফের মাতৃকামূর্তির ভাবনা ভাষান্তর হয়েছে প্রার্থনারত হাত ও মায়ের দোয়ার কোলাজে। আর বস্তুগত সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে পদ্মের পরিবর্তে বর্তমানে সুলভ গোলাপই প্রধান হয়ে উঠেছে লক্ষ্মীব্রতের খুঁটির গোড়ার অলংকরণের পদ্মের মতো। বিলুপ্তপ্রায় পদ্মের স্বরূপটি বহুলরূপে চাক্ষুষ গোলাপ দ্বারা নিয়ত প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করেছে। পাশাপাশি ফুল সরিয়ে সরু চাঁদের ওপরে মক্কাও দৃশ্যমান। যেমন পি. সি. (প্রশান্ত চন্দ্র) দাসের আঁকা ছবিতে পদ্ম সরিয়ে মাছের ভেতরে তাজমহল দৃশ্যমান।



চিত্র ১৮ : রিকশাচিত্রে দু'টি ময়ূর বা পাখির জায়গায় দু'টি মোরগ, পুরান ঢাকা, ২০১৯

আবার এই সময়ে রিকশাচিত্রে আলোচ্য ইমেজের পাশাপাশি ময়ূরের জায়গায় মুরগি (চিত্র ১৮), হাঁসের পরিবর্তে মুরগী, বোরাকের পরিবর্তে লাল গরুতে তাজমহল, লোক-মানসে ইমেজ নির্মাণের প্রকরণকে পাঠ করতে সাহায্য করে। সরস্বতীর ইমেজে পদ্মের সাথে হাঁস, রাধাকৃষ্ণের পদ্মের সাথে ময়ূর বহুল প্রচারিত ইমেজের অংশ হয়ে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। যা বর্তমান মুরগি খামার ও হোটেল ব্যবসার মধ্য দিয়ে নতুন ইমেজের বাস্তবতা তৈরি করেছে। সহজলভ্য, বহুল প্রকাশিত বা প্রাপ্ত ইমেজ থেকে লোক-মানসের এই যে ইমেজ নির্বাচন, তা কি কেবলই নির্দোষ সমাজতাত্ত্বিক বিষয়, নাকি একটি রাজনীতিও? এইখানে ফুকোর ক্ষমতা ধারণাটি কাজ করে কি? ফুকো তার 'Archaeology of Knowledge and the discourse on language' বইটিতে ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন, ক্ষমতা ব্যক্তি বা সমাজের অধীন নয়, বরং ব্যক্তি বা সমাজের মাধ্যম। অর্থাৎ ব্যক্তি বা সমাজের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা নিজেকে প্রকাশ করে। এই তত্ত্বটি লোক-মানসের ক্ষমতামুখী সাধারণ প্রবণতাকে চিহ্নিত করার পাশাপশি লোকের ক্ষমতা প্রকরণের নিজস্বতাকেও চিহ্নিত করে। একরৈখিক পথে রিকশাচিত্র অগ্রসর হয়নি এই সত্যটি লোক-মানসের ইমেজ সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝার সময় তাই সচেতনভাবে মনে রাখতে হয়। সরকারি বারবার নিষেধাজ্ঞার সীমানা (সূত্র : Rob, ১৯৯২ : ৬৫২) পার হয়ে রিকশাচিত্রে ইমেজ নির্মাণের ধারণাটি কতটা বস্তুগত ও তার স্বরূপ কী– কিছুটা বোধগম্য হয়, যখন রিকশা সজ্জার সাথে বউয়ের মতো সাজানো রিকশার ধারণা চালক বা মালিকপ্রিয় হয়। "The newest, shinest models are, as one bengali put it, 'as gorgeous as a bride going forth for the first time to her in-laws" (Joanna and Kevib, 1994 : 33)। রিকশাচিত্রে পদ্ম মোটিফের ব্যবহার এবং সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রেক্ষাপটে এর বিবর্তনকে আমলে নিয়ে বলা যায়, লোক-ইমেজ সংস্কৃতি; বস্তুগত অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার নানাস্তরিক পর্যায়ের সম্মিলন এবং লোক-মানসের নিজস্ব ক্ষমতার ধারণার একটি যোগফল।

সহায়কপঞ্জি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫০)। *বাংলার ব্রত*। বিশ্বভারতী, কোলকাতা।

এডওয়ার্ড এস. হারম্যান ও নোম চমস্কি, অনুবাদ : আ-আল মামুন (২০০৮)। *সম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। সংহতি, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমেদ (২০০৭)। *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*। ঢাকা, ২০০৭।

খগেশকিরণ তালুকদার (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) (১৯৯৮)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

দীপ্তি রানী দত্ত (২০১২)। *বাংলাদেশের লোকশিল্পের বির্বতন এবং অভিযোজিত বর্তমান*। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা।

নোয়াম চমস্কি (২০০৮)। *গণমাধ্যম*। বাঙলায়ন, ঢাকা।

লালা রুখ সেলিম (সম্পা.) (২০০৭)। *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ চারু ও কারুকলা*। প্রবন্ধ : শাওন আকন্দ। সিনেমা ব্যানার পেইন্টিং ও অন্যান্য অনুষঙ্গ। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৪৫১-৪৬০।

লুইস হেনরি মর্গান, অনুবাদ : বুলবন ওসমান (২০০০)। *আদিম সমাজ*। অবসর, ঢাকা।

শীলা বসাক (২০০২)। *বাংলার নকশী কাঁথা*। আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

J. E. Translated by Jack Sage (1971). *Cirlot A dictionary of Symbols*. second edition, Routledge, London.

James Hall (1996). *Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art*. Westview, Colorado.

Joanna Kirkpatrick and Kevib Bubriski (1994). *Transports of Delight, Richsha art of Bangladesh*, Aramco World. Bimonthly, January-February, Vol.45, NO. 1: 33-35.

Lady Herringham (1998). *Ajanta Frescoes*. Aryan International, New Delhi.

Michel Foucault. Translated by A M Sheridan Smith (1972). *Archaeology of Knowledge and the discourse on language*. Pantheon books, New York

Nalini Kanta Bhattasali 1929, reprint 2008. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Bangladesh National Museum, Dhaka.

Raja Rabi Varma, wikimedia, http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Lakshmi_by_ Raja_Ravi_Varma.jpg

Rob Gallagher (1992). *The Rickshaws of Bangladesh*. The University Press Limited, Dhaka.

Shamsuzzaman Khan *edt.* (2016). *Folklore in the Urban Context*. Bangla Academy, Dhaka.

Tapati Guha-Thakurta (2008). *The Making of a new 'Indian' art : Artists, aesthetics and nationalism in Bengal, c. 1850-1920*. Cambridge University Press, digitally printed version, New York.

সাক্ষাৎকার

ক. শিল্পী রাজকুমার দাস, নারিন্দা, পুরান ঢাকা

খ. শিল্পী প্রশান্ত কুমার দাস, নারিন্দা, পুরান ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হকের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনসংকট

নাহিদা বেগম*

[সারসংক্ষেপ : ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় নব্যসৃষ্ট উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথাকার সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)। সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক মধ্যবিত্তকে ব্যবহার করেছেন তাদের বহুভঙ্গিম জীবন ও বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায়। 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সমাজের এমন একটি বিশেষ শ্রেণিস্তরের নাম যার উপরে এবং নিচে আরও একটি করে শ্রেণি বা স্তর বিরাজমান। এই শ্রেণির ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিযোজন তুলনামূলক অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় নাজুক ও সংকটময় বলেই সাহিত্যতত্ত্বে তাদের আর্থিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তাদের মননগত অন্তর্বেদনা, কাম, রিরংসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বপ্ন-প্রত্যাশার মতো প্রভাববিস্তারী অনুভূতিগুলো পরিবার ও সমাজে ইতি-নেতি যে বহুরৈখিক জীবনধারার সৃষ্টি করে তা নিঃসন্দেহে কখনো সংঘাতময় কখনো আনন্দময়। এই গবেষণার ক্ষুদ্র পরিসরে সৈয়দ শামসুল হকের ছোটোগল্পের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বান্দ্বিক অবস্থান, হতাশা, দৈন্য, ব্যর্থতার মতো জীবনসংকটের নানারূপ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি এবং তৎসংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্র অনুসন্ধানের প্রয়াস দেখানো হবে]

পঞ্চাশের সবচেয়ে প্রতিভাদীপ্ত গল্পকার সৈয়দ শামসুল হক। বস্তুত তাঁর ছোটোগল্প সমকালীন অন্য গল্পলেখকদের থেকে বিষয়ভাবনা ও জীবনবৈচিত্র্যে স্বকীয়। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন সৈয়দ শামসুল হক সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন– 'তিনি তো সেই লেখক যিনি জীবনকে দেখেছেন বোধের মগ্নতায়, দেখেছেন মননের শস্যক্ষেত্রে, দেখেছেন প্রেমের কল্পনায়, দেখেছেন ঔজ্জ্বল্যে, বিবর্ণতায়, ধ্বংসে, যুদ্ধে, প্রতিরোধে, ভালোবাসায়, সঙ্কটে এবং সামগ্রিক সত্যে' (সেলিনা, ২০১৫ : ২২৯)। কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শিশুতোষ রচনাসহ সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই শিল্পকর্ষণের উৎকর্ষে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সব্যসাচী বিশেষণ। স্বকালে তিনি যেমন আপন প্রজ্ঞায় আলোচিত ছিলেন তেমনি কালোত্তীর্ণ যাত্রায় তাঁর শিল্পপুঁজি পূজিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে আপন গৌরবে। আমাদের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের প্রতিটি বাঁক, আবহ, ঘটনা এমনকি সমসাময়িক চরিত্র তাঁর কবিতায় যেমন উঠে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়, তেমনি তীক্ষ্ণভাবে পরিপার্শ্বকে পর্যবেক্ষণের স্বোপার্জিত প্রবণতা তাঁর গল্প-উপন্যাসে চিহ্নিত হয়েছে বাস্তব সত্যে (খালেদ হোসাইন, ২০১৯ : ২৭৮)। রোমান্টিক ভাববিলাস, উত্তুঙ্গ চেতনার পরিবর্তে মনোবাস্তবতার গভীরতর সংকট, বাহ্যিক-অন্তর্লোকের সমান্তরাল ক্ষরণ এবং সামাজিক প্রেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত মানবজীবনের অসঙ্গতিগুলো সংকটরূপে অবলোকন করে সেখান থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনভাষ্য নির্মাণে সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন তাঁর নিজস্ব শিল্পভুবনের সমৃদ্ধ কথাশিল্পী।

ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে সেদিন থেকে উৎপত্তি ঘটেছে শ্রেণি ধারণার। বলা হয়–

> The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word,

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

> oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes. (Marx Karl & Engles Friedrich 2018:09)

লেনিন মতে 'শ্রেণি বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে যাদের মধ্যে একগোষ্ঠী অর্থনীতিতে নিজ অবস্থানের জোরে অপর কোন গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম' (শোভনলাল দত্তগুপ্ত, ১৯৯০ : ১৩২)। সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবার কার্লমার্কসের মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণি ধারণার বিশ্লেষণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ আলোচনা করতে গিয়ে এই দুই শ্রেণির মধ্য-মধ্যবর্তী আরো একটি শ্রেণির কথা বলেছেন, তার মতানুসারে শুধু এই দুই শ্রেণিতে সমাজের সকলকে ফেলা যায় না, সমাজে অনেক লোক আছে যারা উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সরাসরি যুক্ত নয় কিন্তু তাদেরও আলাদা শ্রেণিতে বিবেচনা করতে হয়। তাদের শ্রেণি নির্ধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সমাজতত্ত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধারণাটি উদ্ভব।

সরল সংজ্ঞায়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্ণনা প্রদান দুরূহ ব্যাপার। সাধারণত কিছু বৈশিষ্ট্যের আদলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবয়ব কল্পনা করা হয়। যেমন– 'The majority of middle class people work for a living and do no involve manual labour.They include those of bussiness woners and managers, clerks, lawyers, doctors and teachers' (মো: মুস্তাফিজুর রহমান, ২০০৯ : ০২)। অর্থাৎ কায়িক শ্রম পরিহারকারী ও অপরের শ্রম আত্মসাৎকারী অথবা কায়িক শ্রমজীবীদের শ্রমের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল এবং প্রচুর বিত্ত বা বৃহদায়তন উৎপাদন উপকরণের মালিকহীন ব্যক্তিরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। (মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৫ : ০২) এ প্রসঙ্গে আর এইচ গ্রেটেনের মনোভাব মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশ্লেষকরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে গিয়ে মুদ্রানির্ভর শ্রেণিকে মধ্যবিত্ত হিসেবে নির্দেশ করছেন। তিনি মনে করেন মুদ্রা যাদের প্রধান নিয়ামক ও প্রাথমিক উপাদান তারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ (বিনয় ঘোষ, ২০১৬ : ৭৫) মধ্যবিত্তের অবস্থা সব সময় অস্থিতিশীল। তারা যেকোনো সময় অধিক সম্পদ আহরণ করে ধনিক শ্রেণিতে উন্নীত হতে পারে আবার স্ব-অবস্থান হারিয়ে সর্বহারা শ্রেণিতেও অবনত হতে পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইংরেজি প্রতিশব্দ Middle class। পাশ্চাত্যের সমাজতত্ত্ববিদরা middle class-কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। যেমন গোল্ডথরপ middle class-কে service class হিসেবে দেখেছেন। মার্কসবাদীরা দেখেছেন 'new working class' হিসেবে। গর্ডন মার্শাল 'middle class' পরিভাষাকে 'the least satisfactory term' বলে আখ্যা দিয়েছেন। (অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৭ : ২)। সাধারণভাবে, 'বুর্জোয়া' ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমর্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় (আবদুল মওদুদ, ২০১১ : ৫৫)। বুর্জোয়া শব্দটি ফরাসি Burgh থেকে উদ্ভূত (জিনাত আরা হক, ২০১৪ : ১৫৪) যার অর্থ নাগরিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী বা ছোটো দোকানদার। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমিত চিহ্নিতকরণের শক্ত মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয় শিক্ষা এবং চাকুরি। কখনো কখনো মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সুবিধাভোগী বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ, এই শ্রেণির লোকেরা অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের সামাজিক অবস্থা এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে (ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, ২০১৩ : ১৮) সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণায় মধ্যবিত্তের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। সে সকল আলোচনার সারকথা এই– মধ্যবিত্ত হচ্ছে আকৃতিহীন এমন কিছুসংখ্যক গরিষ্ঠ মানুষ যারা ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক আচরণে ভদ্রলোক হতে চায় বলেই পারিবারিক ও

সামাজিক জীবনের প্রতি দুর্বল থাকে, তারা মানবীয় গুণাবলি প্রকাশে আগ্রহী। পরিবার ও সন্তান প্রতিপালনে যত্নশীল। শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা উন্নত জীবন লাভের চেষ্টায় সর্বদাই সংগ্রামরত এমনকি বস্তুগত সম্পত্তির মালিক হওয়ার সাধ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। মধ্যবিত্তের রয়েছে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতি পরিচর্যার আকাঙ্ক্ষা। দেশের সংকট সময়ে তারা যে কোনো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কণ্ঠ সোচ্চার করার সাহস রাখে। কিন্তু শ্রমবিমুখতা, পলায়নপরতা, স্বার্থপরতা, পরমুখাপেক্ষিতার মতো নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সমাজে এই শ্রেণির নানারকম ভূমিকা থাকার পরও অপর দুই শ্রেণি কর্তৃক প্রায়ই নিন্দিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি সমাজকে গতিশীল রাখার পেছনে মধ্যবিত্তের সার্বিক ভূমিকা কল্যাণকর এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় তারা প্রাগ্রসর বলেই পরিবর্তনমুখী সমাজ বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব অপরিসীম।

পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যান্ডে যাজক, সামন্ত শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যবর্তী পুঁজিপতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত হতো। (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮৮ : ১০) আদিতে ইংল্যান্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী সমাজকে বোঝানো হতো। প্রথমত, আর্থিক বিন্যাসে তারা ছিল মধ্যবর্তী স্তরের পুঁজিপতি এবং মজুর শ্রেণির তুলনায় উন্নত। তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকত, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান ও আচার-ব্যবহার হতো একই ধরনের। দ্বিতীয়ত, তারা কতকগুলো উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুসারী ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে তাদের এ মূল্যবোধ প্রকাশ পেত। (আবদুল মওদুদ, ২০১১ : ৫৬)। ইংল্যান্ড বা পাশ্চাত্যের হিসেব যাই হোক পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের পিছনে রয়েছে কিছু ইতিহাস, তার মধ্যে প্রধানতম কারণ দেশভাগ, স্বাধিকার আন্দোলন ও নগরায়ণ প্রক্রিয়া। বাংলা ভাষায় 'মধ্যবিত্ত' শব্দের আবির্ভাব হয় উনিশ শতকের প্রারম্ভে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এটি বাংলার শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এটি তখন ভদ্রলোক শব্দের সমার্থক ছিল। (বিলকিস রহমান, ২০১৩ : ৭)

যে কোনো আধুনিক সমাজে মধ্যবিত্তকে মূলত চারটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায়–

ক. বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত
খ. শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত
গ. ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত
ঘ. পেশাজীবী মধ্যবিত্ত
(মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৫ : ৩)

মধ্যবিত্ত যত বেশি আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে ততবেশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকেছে এবং একসময় তাদের সহজাত আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে গদ্য বা কথাসাহিত্য। (মুহম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৮৫ : ৭১) বিভাগপূর্বকালে সমকালীন ছোটোগল্পে মধ্যশ্রেণির উপস্থিতি তেমন প্রকট আকারে না থাকলেও পঞ্চাশের দশক থেকে বিক্ষুব্ধ রাজনীতি থেকে সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজে বসবাসরত শাহরিক মধ্যবিত্তের জীবন ছোটোগল্পকারদের রচনায় প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বলা যায়, আধুনিক ছোটোগল্পের জগৎ নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর নানাবিধ টানাপড়েনের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ যখন নগর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নানামাত্রিক অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, সৈয়দ শামসুল হকই তখন প্রথমবারের মতো সেই নাগরিক মধ্যবিত্তের

সঙ্কট-সম্ভাবনা, হতাশা আকাঙ্ক্ষাকে সফলভাবে তাঁর গল্পের উপজীব্য করেছেন (আহমাদ মোস্তফা কামাল, ২০১৫ : ২৬৮) সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *তাস* (১৯৫৪)। প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকে শুরু করে *শীত বিকেল* (১৯৫৯), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭), *প্রাচীন বংশের নিষ্ণস্ব সন্তান* (১৯৮২), *জলেশ্বরীর গল্পগুলো*'য় (১৯৯০) মধ্যবিত্তের যে জীবন-সংকট তিনি এঁকেছেন তা গার্হস্থ্য জীবন, পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা অভাব-দারিদ্র্য, নৈঃসঙ্গতার কষ্ট, আত্মগত অন্তর্মুখিনতার সঙ্গে কখনো কখনো সামষ্টিক গভীর সামাজিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত। গল্পগুলোতে স্বাভাবিক জীবনের ছোটো-বড়ো সমস্যা ও সমাধানের আকাঙ্ক্ষা কখনো কাব্যের রোমান্টিক বোধে কখনো দার্শনিক জীবনবীক্ষায় প্রশ্ন আকারে উত্থাপিত হয়েছে। কোনো কোনো গল্পে মিশে আছে পূর্বপুরুষ হতে উঠে আসা শ্রেণিগত বন্ধন, কোনোটায় শ্রেণি উত্তরণের চেষ্টা আবার কোনোটায় হিংসা ও বিদ্বেষের ফলে সৃষ্ট মধবৃত্তীয় আবহমান সংকটময় সামাজিক বিভেদ। কোথাও হতাশা, কোথাও নৈরাশ্য। ব্যক্তির নঞর্থক চেতনার রূপায়ণে মধ্যবিত্তকে তিনি কখনো চিহ্নিত করেছেন পশ্চাদপদ হিসেবে। আবার কখনো তাদের ভেতরে দেখিয়েছেন নিজস্ব প্রেরণার সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। মধ্যবিত্তের শ্রেণিসংগ্রাম ও টিকে থাকার যুদ্ধকে লেখকের মনে হয়েছে এক ধরনের সাহস। সর্বোপরি একক বোধের বিচ্ছিন্নতা ও প্রেম সংক্রান্ত হতাশার স্বাভাবিক প্রবণতায় মধ্যবিত্তের জীবনলক্ষণ চিরন্তন সহজ রূপাঙ্কনে সৈয়দ শামসুল হকের দৃষ্টি সার্থক মনন অভীক্ষায় ঋদ্ধ।

বাঙালি মধ্যবিত্তদের ভেতরে ব্যক্তির ভালো থাকা, মন্দ থাকা নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের ভালো থাকা, মন্দ থাকার ওপর। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই আত্মাউন্নয়ন ব্যাপারটাকে পরিবারের উন্নয়ন হিসেবেই বিবেচনা করে। সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সংকট সকল কিছুই বিবেচিত হয় যৌথতার মিশ্র যাপনের অংশ হিসেবে। সৈয়দ শামসুল হকের গল্পের বড়ো একটা অংশ অধিকার করে আছে এই গার্হস্থ্য ও পারিবারিক সংকটে নিপতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। (মোস্তফা তারিকুল আহসান, ২০০৮, ৪০০) 'হিজল কাঠের নাও' গল্পের হামিদা বানুর সমস্ত চিন্তা তার কন্যা শফিনাজকে পাত্রস্থ করা নিয়ে। হামিদা বানুর সামর্থ্য নেই আত্মজাকে ভালো ঘরে বিয়ে দেবার। তবু মধ্যবিত্ত মায়ের সেই চিরন্তন প্রত্যাশা অনুযায়ী তারও প্রত্যাশা শফিনাজ যেন তার সচ্ছলতায় থাকে; দুধে ভাতে থাকে, ঘর আর বর নিয়ে সুখী হয়। কন্যার ভবিষ্যৎ কল্পনায় হামিদা বানু দেখতে পান—

> ওপাশের উনুনে নিমকি ভাজছে শফিনাজ নিজে। ওর হাতের ময়দা হামিদা বানুর চেয়েও ভালো হয়। এপাশে চায়ের পানিতে বলক উঠছে তাঁর সামনে। আর কি সরল ছেলে দেখো আখতার, প্যান্ট শার্ট সুদ্ধ এসে বসেছে রান্নাঘরের সামনে চৌকাঠের পাশেই। হয়ত বলবো : উঁহু, কেটলিতে আরো খানিকটা চা পাতা ঢালুন, খালা-আম্মা। লিকার একটু কড়া হলেই আমার পছন্দ। আখতারের খালা-আম্মা আরো খানিকটা পাতা ঢেলে দেবেন প্যাকেট থেকে। হাসবেন। আপনজনের মতো হাসবেন। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫২)।

কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই। এই যে সুন্দর সুপুরুষ, সম্ভ্রান্ত বংশীয় আখতারের আগমনে হামিদা বানুর মনোজগতে তৈরি হয়েছে তীব্র প্রত্যাশার ঘোর, তা তাকে অবারিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কায় মানবিক সংকটের দিকেও টেনে নিতে পারে, আবার কন্যার প্রত্যাশিত জীবন ছোঁয়ার আগ্রাসী ইচ্ছেয় দুর্নিবার ও অসংযমী করে তুলতে পারে যেকোন সময়; এখানে সবই সম্ভাব্য।

সৈয়দ শামসুল হকের 'সিঁড়ি' গল্পটি ভাবগত দিক থেকে 'হিজল কাঠের নাও' গল্পের ঠিক বিপরীত। পরিবারের মধ্যকার বহমান স্নেহ, প্রেম, মমতার আড়ালে যে অসহিষ্ণু অপ্রেম তা এই

গল্পের প্রেক্ষাপট। জাহানারা বাড়ির বড়ো মেয়ে, অবিবাহিত। গল্পে তার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। বিএ পরীক্ষার সময় তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সংসারের সমস্ত ভার তার ওপর চেপে বসে। তাদের সংসারে আছে ছোটো ভাই আসাদ, মা আর সে। অসুস্থ বাবাকে নিয়ে অভাবের সংসার টিকিয়ে রাখতে জাহানারাকে নামতে হয়েছে কঠোর সংগ্রামে। সংসারে চাকা সচল রাখতে স্কুলের চাকরিতে রাতদিন পরিশ্রম করে যায়। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন নিঃসঙ্গতার। স্বামী, সংসার, সন্তান কামনায় অস্থির হয়ে পড়লেও সংসারের দিকে তাকিয়ে কিছুই করার থাকে না। একসময় বান্ধবী রেশমির সাজানো গোছানো সংসার দেখে সে ভেতরে ভেতরে ঈর্ষাকতর হয়। তার মনোজগতে খেলা করে অদ্ভুত অস্থিরতা।

> বড় নিঃসঙ্গ বড় অসহায় মনে হয়। তার বুকের ভেতরটা যেন শুধু দীর্ঘশ্বাসেই তৈরি। রেশমির কথাগুলো কানে বাজে। একদিন এমন ছিল যেদিন ওরা দু-জনে ছিল দুজনের সহচরী। আর আজ সেই রেশমি? ওর স্বামী নিশ্চয়ই ফিরেছে কলেজ থেকে। সোহাগে রঙিন হয়ে উঠেছে এমন সন্ধ্যা। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫৮)

জীবনের প্রয়োজন অস্বীকার করতে না পারলেও নিজেকে আর লুকানো সম্ভব হয় না জাহানারার। তবু মন আর শরীরের প্রয়োজন উপেক্ষা করে তাকে তাৎক্ষণিক সারা দিতে হয় সংসারের প্রয়োজনে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনবরত অসুস্থ পিতা ডেকে যায় আর ক্লান্ত বিপর্যস্ত জাহানরা অলস পা ফেলে অতিক্রম করে ঘোরানো প্যাঁচানো সিঁড়ি। এই সিঁড়িটা যেন তার জীবনের পথ। জাহানারা হোঁচট খায়। কিন্তু পড়ে যায় না বা নুয়েও পড়ে না। কারণ সে জানে তাকে শক্ত থাকতেই হবে। বাবার ব্যথার ঔষধ কিনতে হবে। ডাকার সাথে সাথেই বলতে হবে 'আসছি'। নিরূপায় মধ্যবিত্তকে এভাবেই দিনশেষে শুধু বইতে হয় যাপিত জীবনের ভার ও অতৃপ্ততার গভীর কালো দীর্ঘশ্বাস।

মধ্যবিত্ত সমাজে নারীর সকলরকম যোগ্যতার মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্যকে বিশেষ বিবেচনায় দেখা হয়। বিশেষ করে নারী নিজেই যখন প্রথাগত সমাজকেন্দ্রিক নির্ধারিত সুন্দর-অসুন্দরের মীমাংসায় নিজের রূপজ অবস্থান নিয়ে থাকে তটস্থ, তখন তার পরিপার্শ্বও ধীরে ধীরে তার প্রতিকূল হয়ে ওঠে। সৈয়দ হকের 'রোকেয়ার মুখ' গল্পে আছে বসন্ত রোগে মুখাবয়ব নষ্ট হয়ে যাওয়া এক মধ্যবিত্ত রমণীর অস্তিত্বের সংকট। স্বামী সন্তান নিয়ে রোকেয়ার ভর-ভরান্তি সংসারে সুখের চেয়ে অসুখ বেশি। বসন্ত তার স্বাভাবিক জীবনের উচ্ছ্বাস কেড়ে নিয়েছে। তার কেবলি মনে হয় তার স্বামী হামিদ একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে অজান্তে। নির্বিকার সেই দিনযাপনের ভাষ্য লেখক তুলেছেন এভাবে–

> কিছুক্ষণ পর হামিদ এসেছিল শোবার ঘরে। চেয়ার টেনে বসেছিল, কিন্তু দীর্ঘ একটা ক্ষণ কিছুই সে বলে নি। তার এই নীরবতা রোকেয়াকে আরো একা করে দিয়েছিল।... মনে মনে রোকেয়া প্রার্থনা করেছিল, হামিদ একবার ডাকুক তার নাম ধরে।... কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ছিল চাপা রূঢ়তা। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০: ৪৩)

মধ্যবিত্তের ভেতরে সব থাকার পরও তুচ্ছ বিষয়ে হীনমন্যতার বোধ তাদেরকে নিঃসঙ্গ করে রাখে আপন গণ্ডিবদ্ধ জীবনের ভেতর ও বাইরে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে আছে বিচ্ছেদ হতাশা বা নিঃসঙ্গতার মতো একক কষ্ট। মধ্যবয়সে এসে স্বামী মারা গেলেও দৈনন্দিন গার্হস্থ্যে কারো কারো জীবন আটকে যেতে পারে স্মৃতিকাতরতা আর অপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। সৈয়দ শামসুল হকের 'তাস' (১৯৫৪) গল্পটিতে স্বামীহারা এক

বিধবা মায়ের স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ্য। একলা রমণীটি তার সংসারের সবটা জুড়ে থাকলেও স্বামীর অভাবে তার জীবন বন্ধন শিথিল, বিঘ্নিত ও বিধ্বস্ত (মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, ২০০৯ : ৩৩)। এই গল্পে বিধবা মা তার স্বামীর কালের পুরানো ঘড়ির উপস্থিতিটিকেই প্রাণস্পন্দন ভেবে নষ্টালজিক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়। মনোগত বিভ্রমে কখনো কখনো স্বামীর ছায়াশীতল স্পর্শও অনুভব করেন ফাঁকা শূন্য বৃত্তাবদ্ধ জীবনের অসম্পূর্ণতায়। এই গল্পের মা চরিত্রটির তার সন্তান সমেত যে বাড়িতে বসবাস তা নিম্ন মধ্যবিত্তের কোনোরকম মাথা গুঁজবার ঠাঁই–

> দু খানা দশ বারো হাত কামরার সামনে এক চিলতে বারান্দা আর বিশ্রী রকমের ছোট দরজা এক জানালা দিয়ে রান্নাঘর... বারান্দা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না... আশেপাশের আবহাওয়া এমনিতর যে, সব সময়ই মনে হয় বাসাটা যেন মুখ ভার করে রয়েছে। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫৯)

মধ্যবিত্তের প্রকৃত সুখ যেন স্বামী, সন্তান এবং ঘর। গল্পটিতে লেখক নারীটির অভাবতাড়িত জীবনে আবেগীয় অনুভূতি, দাম্পত্য নির্ভরতার হাহাকার ব্যক্তির পূর্বাপর জীবনের সাথে বর্তমানে সমান্তরালে তুলনা করে দেখিয়েছেন। গল্পে 'তাস' এক ভয়ংকর আশঙ্কার উপকরণ। তাসের প্রকোপে বাবার অনুপস্থিতে সন্তান বখে যেতে পারে এই বোধ মাকে নিরন্তর তাড়িত করে বেড়ায়, আবার সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে ঘুমন্ত মুখাবয়বে স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠাটা তাকে পৌঁছে দেয় নারীত্বের উৎকর্ষিক চমৎকারিত্বে। বস্তুত গার্হস্থ্য পারিবারিক গল্প রচনায় সৈয়দ হক মোটামুটি সফল কিন্তু তদাপেক্ষা অধিক সফল মধ্যবিত্ত জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র নির্মাণে।

সৈয়দ শামসুল হকের 'পূর্ণিমায় বেচাকেনা' গল্পটি এমন এক ধরনের গল্প যে গল্পে মধ্যবিত্তের বস্তুপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা প্রকট ও উদগ্র হয়ে ফুটেছে। পিতার উত্তরাধিকারে স্বপ্নপ্রাপ্ত অর্শরোগের ঔষধ বিক্রির দোকান খুলে বসেও অভাবের সাথে এক ব্যক্তির নিত্য বসবাস। এরপরও কোনো এক রহস্যময় ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় যন্ত্র কেনার পেছনে সর্বস্ব বিকিয়ে দিতেও তার দ্বিধা হয় না। সে জানে এই যন্ত্র বিক্রি করার জন্য সে আর নতুন কোনো ক্রেতা খুঁজে পাবে না, তবু সে কেনে। এমনকি লোকটা যন্ত্র নিয়ে এলে তাকে বাকিতে চা-ডালপুরিও খাওয়ায়, বিরতির জন্য যথেষ্ট উৎকণ্ঠাও দেখায়। লোকটিকে বারবার আসার অনুরোধের মধ্য দিয়ে সে তার অ-নিবৃত আকাঙ্ক্ষায় একটু একটু করে এগিয়ে যায় আরো বেশি নিঃস্ব হওয়ার পথে। আদতে যন্ত্রের প্রতি লোকটার এই উদ্বেলতা আমাদের সকলেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরা পুরোপুরি আধুনিক নাগরিক জীবন-যাপনের লক্ষ্যে নিজেদেরকে প্রায় যন্ত্রে পরিণত করেছি। এবং বুঝতেই পারি না যে আমাদের মানবিক জীবন তাতে কতটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। (আহমাদ মোস্তফা কামাল, ২০১৫ : ২৭৪)। নাগরিক জীবনে টিকে থাকতে গেলে মধ্যবিত্ত যেমন নিরন্তর কিনে যায় তেমনি নিম্ন মধ্যবিত্তদের কেউ কেউ নিরন্তর বেচেও যায়। বেচতে বেচতে সব শেষে ঘরের মানুষও বিক্রি করে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে তাদের কেউ। এ গল্পের রহস্যময় মানুষ এবং নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি দুজনই আমাদের যান্ত্রিক জীবনের অপরিনামদর্শিতার অনিবার্য পরিণতি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বৃহৎ অংশ পেশাজীবী শ্রেণির। বাংলা কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্তের অন্যান্য বিভাজন অপেক্ষা এই পেশাজীবী শ্রেণিই গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। 'গন্তব্য অশোক' গল্পের মূল চরিত্র সামাদ কালিগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক। মধ্যবিত্তের নিপাট ভালোমানুষি রূপ তার

বহিরঙ্গে। ভেতরে সে বিকৃত মানসিক বোধে আচ্ছন্ন। নিজের রুচির প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা থাকার দরুন অন্যের রুচি বা জীবনাচার কোনটাই তার পছন্দ হয় না–

> দিনের বেলায় যে মানুষটিকে মনে হয় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প, অধ্যাপনার দায়িত্বে একনিষ্ঠ, বইয়ের পাতায় তন্ময়, প্রকৃতির ঋতুবদলের উৎসাহী সংবাদ সংগ্রাহক, গ্রামে যে কোনো নতুন ঘটনায় কৌতূহলী, সেই মানুষটিকে লণ্ঠণ জ্বালা অন্ধকারে শেয়ালের যোজন পেরুনো অন্ধকারে মনে হয় একখণ্ড জ্বলন্ত সহিংস উলকার মতো ধাবমান পাথর।
> (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ২৬১)

গল্পে শিরিন সামাদের বৈধ নারী হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্তের চিরন্তন অহমবোধ সামাদকে সব সময় প্ররোচিত করে নিজ স্ত্রীর ওপর স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই, রাত বা দিন যেকোনো সময়েই তার ক্ষুধার্ত জান্তব আকাঙ্ক্ষা বিকৃত লালসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিবস্ত্র শিরিনের উপর। নারীর প্রতি পুরুষের এই মনোভাব, ভালোবাসাহীন দৈহিক সম্পর্ক, সন্দেহ– মধ্যবিত্তের এইসব মৌলিক প্রবণতা তৈরি হয়েছে সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকা একপেশে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে। পুরুষতন্ত্র মনে করে শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী সব সময়ই পুরুষের অধস্তন বা অপ্রধান স্থানে। নারী-পুরুষের ভূমিকা লিঙ্গীয় বিন্যাসের দ্বারা সামাজিকভাবে নির্ধারিত, গঠিত এবং আরোপিত (বিলকিস রহমান, ২০১৩ : ১৮) যেখানে সমস্ত মধ্যবিত্তের চার দেয়ালের অস্তিত্বই এমন ঘুণে ধরা, পলেস্তরা খসা, সেখানে সামাদ আর শিরিনের দাম্পত্য জীবন এর চেয়ে কী আর এমন ব্যতিক্রম হতে পারে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের উঠতি যুবকদের ইন্দ্রিয়জ সুখ-অসুখের গল্প 'পতন'। এই গল্পে সামাদ বেলাল, ফজলু ও বাদশার জীবনের কালো অন্ধকারকে লেখক বাইরে এনেছেন মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায়। পাপ আর পতনের পারস্পরিক সম্পর্কে তিনি চরিত্রের ভেতর থেকে টেনে এনেছেন অনুতাপ। বিবেকের দংশনে তারা নিজ নিজ সত্তার কাছে উন্মোচিত করেছে তাদের পাপের আমলনামা; বেশ্যাপল্লিতে গমন কিংবা সুযোগ পেয়ে রাতের অন্ধকারে অসহায় কোনো রমণীকে পুনঃপুন ধর্ষণে যে সুখপ্রাপ্তি তা আদতে অসুখ এই সত্য তারা অনুধাবন করে। তাদের এই নিরন্তর পাপের দিকে ধাবিত হওয়ার মধ্যে আছে এই পুঁজিবাদী সমাজের চরম অবক্ষয়ের কষাঘাত। চার যুবকই জীবন নিয়ে হতাশ এবং মনোবৈকল্যের সংকটে নিপতিত। তাদের অর্থহীন জীবনের পেছনে অনুসংঘটক হিসেবে কাজ করেছে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিপার্শ্বের পরিচর্যাহীনতা। তাই সময় সময় অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতর জেগে ওঠে আক্ষেপ–

> আমাদের চাকরি নাই, ব্যবসা নাই, টাকা নাই, দেশেও কোন শান্তি নাই, সুযোগ নাই, স্থিরতা নাই, জগৎ যেন এমন আমাদের জন্য সে আমাদের নয়, আর সকলের। আমরা গুড় দিয়ে রুটি খাচ্ছি, যেন লবণ জড়ানো আহার খাই, গুড়ের মধ্যে আরো কয়েকটা ডেয়ো পিঁপড়ে দেখা যায়। আমরা খুটে খুটে তুলি, যেন অনেক আগেই আমাদেরও কেউ খুটে খুটে এভাবে তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এই দেশ থেকে। আমরা মৃত চলৎশক্তিহীন পড়ে আছি মাটিতে, আর অচিরেই দ্যাখো লাল পিঁপড়ে উঠে আসছে, তারা কালো ডেয়োগুলোর চারদিকে দল বাঁধছে, গুড়ের লোভে নাকি মৃত ডেয়োগুলোর লোভে? তবে বুঝি পিঁপড়েই পিঁপড়ে খায়, মানুষ মানুষকে খায়। মানুষের স্বপ্ন মানুষেই এসে খেয়ে ফেলে। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৫৪৯)

পতন গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে নারীকে পাপের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করার প্রচলিত বিশ্বাস সংক্রান্ত সংকটের বিপরীতে লেখক তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছেন, নারী একাই

শুধু পাপের আঁধার নয় বরং পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী ও পুরুষ উভয়ই একই সাথে বহন করছে একই অন্ধকার-একে এড়ানোর বিকল্প কোন উপায় নেই।

মধ্যবিত্তের সুখ নির্ভর করে একটা গোছানো চাকুরির ওপর। কিন্তু এই চাকুরিপ্রাপ্তি ও চাকুরিচ্যুতি নিয়েও মধ্যবিত্ত জীবনে রয়েছে নানাবিধ সংকট। কর্মহীন বেকার যুবক আশরাফের মনোকষ্ট আর তার জীবনে ঘটে চলা নিদারুণ বাস্তবতা নিয়ে রচিত 'নাম' গল্প। বন্ধু হুরমত আলীর কাছ থেকে কোট ধার করে নিয়ে আশরাফ চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায়। হুরমতের কোট গায়ে দিয়ে নিজেকে সে মনে মনে হুরমতই মনে করে। কোটের উষ্ণতা তাকে জীবনের উষ্ণতা আর সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখায়। দিনের পর দিন টাকার জন্য দরখাস্ত পাঠাতে পাঠাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আশরাফ অনেকটাই হতবিহ্বল ছিল সেসময়। হুরমতের অফিসে গিয়ে, তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম দেখে, তার কথা শুনে হুরমতকে তার স্বপ্নের নায়ক বলে মনে হয়। স্বপ্নগ্রস্ত আশরাফ কোট গায়ে দেবার পরই ভাবতে থাকে–

> এবারে মাইনে পেয়েই এ রকম একটা কোট করতে সে দেবে। এতদিন যেন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে হুরমত আলীর সঙ্গে তার ব্যবধান শীতের সঙ্গে উষ্ণতা। আশরাফের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় উষ্ণতার জন্য। ধার করা উষ্ণতায় গা ডুবিয়ে সে স্বপ্নগ্রস্তের মতো পথ চলতে থাকে। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৭৩)।

আর্থিকভাবে পঙ্গু নিম্ন মধ্যবিত্তের এই ক্ষুদ্র স্বপ্নের অলৌকিক প্রত্যাশা সৈয়দ হক দেখেছেন দরদের চোখে।

'নাম' গল্পের মতোই সৈয়দ শামসুল হকের 'শীতবিকেল' গল্পেও আছে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট। এই গল্পের নায়ক আনু। তার বাবা-মা ও ভাই-বোনদের নিয়ে রচিত পারিবারিক সুখ দুঃখের গল্পে তার বাবাই নায়ক, যে পুলিশের দারোগা। এই চাকুরিতে সংসারে সচ্ছলতা নেই তার। সৎ লোক অন্যায় করতে পারেন না। বড়ো ছেলে পানুর রেলের চাকুরি হলে একদিন সব সংকট কেটে যাবে সেই আশাও নষ্ট হয়ে যায় পানুর রেলে কাটা পড়া দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। আনুর বোনেরা বড়ো হয়, বাবা ভালো বিয়ে দিতে পারে না তাদের। অভাবের জন্য পানুর বাবা ঘুষ নেন একদিন, এবং সেই অপরাধে তাকে জেলে যেতে হয়। আনুর ভাষ্যে–

> তারপর থেকে গোটা বাসা কেমন বদলে গেল। দেখেছি মাঝে মাঝেই মা একেলা এক কোণে বসে ভীষণভাবে কাঁদেন। কিন্তু বাবাকে আর কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি। আমার চোখেও এড়ায়নি যে, বাবার ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আর কোনোদিন ভোরে তাঁকে সেই হাসিভরা উজ্জ্বল মুখ নিয়ে শিউলিতলার পথে পায়চারি করতে দেখিনি। কতকাল ভোরে বাবার মিষ্টি গলার সুর শুনতে কান পেতেছি। কিন্তু শুনতে পাইনি। যাও শুনেছি, তা আমার কাছে এত করুণ আর কান্না কান্না ভেজা ঠেকেছে যে, আমি পালিয়ে বেঁচেছি। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০০১ : ২৬)।

মূলত মধ্যবিত্তের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেখানেই আনুর বাবার পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল কেননা একজন নির্বিত্ত মানুষকেও কেবল শিক্ষার জোরেই টানতে হয় মধ্যবিত্তের জীবন। সেখান থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই একক ব্যক্তিত্বের পতন এবং সামষ্টিক পরিবারেরও পতন।

মধ্যবিত্ত পরিবার ও সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা যূথবদ্ধ থেকেও অপরিসীম শূন্যতায় কাটিয়ে দেয় খরতপ্ত জীবন। বহির্জগতের পারিপার্শ্বিক হাওয়া যখন মধ্যবিত্তের অস্তিত্বে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে তখন তাদের ভেতরে কাজ করে বিচ্ছিন্নতা। প্রকৃতি

বিচ্ছিন্নতা, পরিবার বিচ্ছিন্নতা, প্রেম বিচ্ছিন্নতা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর বিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধ বিচ্ছিন্নতা, সত্তা বিচ্ছিন্নতা– বিচ্ছিন্নতার এরূপ রূপান্তর ব্যক্তিচৈতন্যে সৃষ্টি করে নৈঃসঙ্গের উপলব্ধি। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৭ : ২৯) সৈয়দ শামসুল হকের 'তৃষ্ণা' গল্পটিতে মধ্যবিত্তের আত্ম অবদমনজাত ক্রন্দন এতটাই তীব্র যে মূল চরিত্রের স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবনের কোথায় যেন জীবনের কোলাহলময় সুর-ছন্দের অভাবে হৃদয়ে জাগে হাহাকার। এই গল্পের নায়ক ইউসুফ। তার ভেতরে দ্বৈত সত্তা সর্বদাই ক্রিয়াশীল। প্রেমের ব্যর্থতা তার ভেতরে প্রতিশোধ বা ঈর্ষার জন্ম দেয়নি বরং দার্শনিক প্রশ্নে নিজের আত্মাকে করেছে বিক্ষুব্ধ। ইউসুফের দুঃসহ যন্ত্রণা যাকে ঘিরে, সেই অধরা প্রেম তাকে অনুভব করে না। দুজনের দূরত্ব চৈতন্যে। সম্ভাবনাময় চিত্রশিল্পী হয়ে যে প্রতিদিন আঁকেন প্রেমিকার মুখাবয়ব। পরদিন আবার স্প্যাচুলা দিয়ে ছেঁচে ফেলে সব। কী এক ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা শিল্পী ইউসুফের মনোজগতে। প্রেমিকার মাতৃত্বের সংবাদে তার ভেতরে যে শূন্যতা তৈরি করে তা তার চেতনায় দেয় সর্বস্ব হারানোর নির্মম কষ্ট–

> ফিস ফিস করে কে যেন তার কানে বলে ইফ আই ওয়ান টু পারসনস যদি আমি দুজন হতাম– এক আত্মা, এক অনুভূতি কেবল দুটো শরীর। ইফ আই ওয়ান টু পারসনস যদি আমি দুজন হতাম– এক আত্মা, একক অনুভূতি কেবল দুটো শরীর। ইফ আই ওয়ান– দুজন দুজন। আর কত বাকি এই পাহাড়ের ধূসরতাকে রক্তিম করে একটি চাঁদ উঠবার? একটি জন্ম! (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৫৭)

আদতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তীব্র প্রতিযোগিতা আধুনিক যুগে এসে মধ্যবিত্তের নিরবচ্ছিন্ন একা হয়ে উঠার পথ তৈরি করে দিয়েছে। বাহ্যিক দ্বন্দ্বের প্রভাব ব্যক্তির অন্তর্জগতে নানামুখী জটিল চিন্তাসূত্র ঈর্ষা, ক্রোধ ও হীনম্মন্যতা ইউসুফদের মতো মানুষকে করে দিয়েছে শেকড়চ্যুত অপুষ্ট মানুষ।

ব্যক্তিক অপ্রাপ্তি বা গার্হস্থ্য সুখ-দুঃখের বাইরে সমাজস্থ মধ্যবিত্তের সামগ্রিক সংকট সৈয়দ শামসুল হক অবলোকন করেছেন নিজ জীবন অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান রূপে। যাপিত জীবনের টুকরো টুকরো তৈরি হওয়া নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা তাঁর গল্পে প্রাণ পেয়েছে সহজ স্বাভাবিকতায়। মধ্যবিত্তের জীবনে বহমান এইসব সংকট শুধু ঘরের চারদেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাদের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক বোধের কারণে তারা তাদের বিচরণ ক্ষেত্রেও জন্ম দিয়ে চলে নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ে তারা নিয়তই হয়ে উঠে বিভ্রান্ত। এরূপ একটি গল্প 'পরাজয়ের পর'। একজন নামহীন মাতালের মুখে বর্ণিত হয়েছে গল্পটি। সে এমন একজন কে গল্পটা বলছে যাকে সে ভাইজান সম্বোধন করে। আগের রাতে প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গল্পের বর্ণনা করে। দুজন লোককে সে রাস্তায় মারামারি করতে দেখে। একজন সাদা জামা গায়ে, আরেকজন নীল জামা গায়ে। নীল জামার দুরবস্থা দেখে সে তার পক্ষ নেয় এবং সাদা জামা পরাস্ত হয়। পরে সেখানে জড়ো হওয়া লোকদের কাছে জানতে পারে। নীল জামাই অপরাধী। নিজেকে অপরাধী ভাবে। মাতাল হয়। সাদা জামার বোন কলেজে পড়ত। কলেজ থেকে বাড়ি আসার পথে নীল জামা তাকে ডাকে। সে অবস্থাপন্ন। গাড়ি আছে। নীল জামাকে মেয়েটা ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে ভাই ভেবেছিল। অথচ নীল জামা মেয়েটার সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল। সাদা জামা টের পেয়ে নীল জামার ওপর চড়াও হয়। এ সময় গল্পের প্রধান চরিত্রটি রক্ষা করে নীল জামাকে, আর শাস্তি দেয় সাদা জামাকে। প্রকৃত ঘটনা শোনার পর সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে, ভাবে নিজের মুখ কখনো কখনো হয়তো আয়না ছাড়াই দেখা যায়। সে তেমনি নিজেকে দিব্য চোখে দেখতে পায়। তার মুখ পাথরের মতো কঠিন। এবং বুঝতে পারে পার্লামেন্টে জিতে যাবার পরও মন্ত্রীদের

মুখ কেন জগদ্দলের পাথরের মতো দেখায়। তার ভাষ্যে– "চোরের মত এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলাম আমি। ভিড় থেকে বেরুলাম। কেউ আমাকে লক্ষ করল না? কারণ, তারা রসের সন্ধান পেয়েছে।" (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৮৯) এখানে মধ্যবিত্তের যে কাপুরুষতা, প্রকৃত সমস্যার স্বরূপ না জেনেও সংকট তৈরি করার প্রবণতা সে দিকটা লেখক দেখিয়েছেন সূক্ষ্ম বাস্তবতায়।

নাগরিক মধ্যবিত্তের এরূপ নানাবিধ উপলব্ধিজাত অনুভূতি নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'আনন্দের মৃত্যু'। এক পানশালায় দুই খদ্দের আনন্দ খুঁজতে যাওয়ার এক নাটকীয় আবহ উঠতি পুঁজিবাদী শ্রেণির ভেতরকার অন্তঃসার শূন্যতাকে প্রকাশ করে। প্রতিনিয়তই যেন মানুষ পুরোনো আনন্দ বাতিল করে নতুন আনন্দ তৈরিতে ছুটে চলছে দিগ্বিদিক। দুটো চরিত্র পরস্পর পরস্পরকে বন্ধু নামে সম্বোধন করে কিন্তু সেই বন্ধুত্ব রক্ষায় তাদের কোনো উৎসাহ নেই। সবকিছুতেই তাদের মতদ্বৈততা কেবল একটি বিষয়ে তারা এক 'যখন একজন আরেকজনকে বলে– 'না জীবনে আর স্ফূর্তি নেই'। কেবল তখনই আরেকজন প্রতিবাদ করে না, মেনে নেয় সত্যিটা। একটি নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে। প্রতিধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর করে বলে না জীবনে আর স্ফূর্তি নাই।' (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ১৭৫) তীব্র গতানুগতিকতা, পুনরাবৃত্তির জীবনে আনন্দ আনতে তারা পানশালায় আসে, মদ খায়, মাতাল হয় কিন্তু আনন্দ আসে না। আসলে নাগরিক জীবন এমনই। এর উপরিতল যাই হোক বহিঃস্থে সে জীবন ফাঁকা, শূন্য।

দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় মানুষ যতই বাড়ছে ততই তাদের টিকে থাকার সংগ্রাম হয়ে উঠেছে কঠিন থেকে কঠিনতর। সঙ্গে আছে নৈতিকতার স্খলন। ঢাকা শহরে নিম্ন মধ্যবিত্তদের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি মধ্যবিত্তের সুপ্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা চর্চার ইতিবাচক স্বভাবকে কখনো কখনো ফেলে দিয়েছে ঝুঁকির মধ্যে। আবার চরম ক্ষয়ে যাওয়া বিবেকেও কখনো কখনো হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছে কর্তব্যের বোধ। এরূপ একটি গল্পের উদাহরণ 'যদি জানতে চান' গল্পটি। গল্পের নায়ক একজন চোর দাগি আসামি, গুণ্ডা, পকেটমার, মাতাল, লম্পট, সব রকম বিশেষণে বিশেষিত। লোকটির বহুরূপ পরিচয় এবং কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই গল্পের প্লট।

লোকটার বাড়ির পাশে সুন্দরী ছোটো বউ তার হার ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ করে। জুয়া খেলে ছোটো বউয়ের স্বামী হারটি হেরে এসেছে। অলংকারের জন্য জন্য ছোটো বউ এসেছে লোকটার কাছে। অপূর্ব সুন্দরী ছোটো বউকে দেখে লোভে তার জিভ চকচক করে ওঠে। সে তার চোর ওস্তাদের কাছ থেকে একটা হার এনে ছোটো বউকে একটা গোপন জায়গায় ডেকে নিয়ে ভোগ করতে চায়। নানা অজুহাত দেখিয়ে ছোটো বউকে সেখানে নিয়ে যায়, এ প্রসঙ্গে এ গল্পের কিছু অংশ উল্লেখ করা যায়–

> ওকে দেখানোর জন্যই, যেন বাড়ি যাচ্ছি এমন ভান করে, বড় রাস্তা পর্যন্ত গেলাম তারপর চোরা চোখে দেখলাম, হামিদটা ইন। তখন অন্ধকারে মিশে জজের মায়ের ছাপড়ার পাশে এসে দাঁড়ালাম।
>
> এতক্ষণ কি করছে ছোট বউ? ভয়ে বোধ হয় হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। তা যদি যায়, তো চমৎকার। বেশি লড়াই করতে হবে না। (সৈয়দ শামসুল হক ২০১০ : ২০৩)

তবে শেষ পর্যন্ত সে কিছুই করতে পারে না। কারণ এই প্রথম কেউ তাকে ভরসা করে কোনো কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছে। গল্পটি মূলত মধ্যবিত্তের বিবেকের ভেতর যে চিরন্তন সত্য-

অসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ক্রিয়াশীল থাকে তার দার্শনিক রূপায়ণ। আদতে সৈয়দ শামসুল হকের গল্পের প্রধান আশ্রয় ভগ্নপ্রায় মধ্যবিত্ত, যারা না মধ্যবিত্ত না নির্বিত্ত। তারা সকলেই অসম সামাজিক বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত। যাদের সামাজিক সংকট ব্যক্তি মানসে তীক্ষ্ণ সংকট হিসেবে প্রকাশিত। (মোস্তফা তারিকুল আহসান, ২০০৮ : ৪০২)

নাগরিক মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদের গল্প 'অভিনেতা রূপে আবদুল খালেক'। এই গল্পের খালেক উঠতি পুঁজিপতিদের একজন যে খুব ভালোভাবে জানে মধ্যবিত্তের প্রকৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা উপরে উপরে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করলেও ভেতরটা তাদের আত্মস্বার্থ সর্বস্বতায় টনটনে। ঢাকার গ্রুপ থিয়েটার 'নাট্যশালা' এবং তাদের ভেতরগত কোন্দলে সৈয়দ শামসুল হক দেখাতে চেয়েছেন এই শিল্প করা শিল্পীরা স্বার্থের কাছে কতটা মূল্যবোধহীন। কিন্তু নাটক ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে কেমন গুরুত্বপূর্ণ তা আবদুল খালেক ও তার সাংবাদিক বন্ধুর কথোপকথনের মধ্য কিছুটা আভাস তুলে দিয়েছেন—

> নাটকে নামছ? নাটকে অভিনয় করছ তুমি?
>
> আবদুল খালেক বাঁকা চোখে আমাকে একনজর দেখে বলল, মনে হয়, অভিনয় তুমি খাটো চোখে দেখো মিঞা?
>
> অভিনয় আমি খাটো চোখে দেখব কেন? ইয়োরোপ আমেরিকার কথা ছেড়ে দাও, আমাদের এই বাংলাদেশে, এই ঢাকাতে নাটকের চর্চা, নাটকে অভিনয়, এসব সিরিয়াস কাজ, প্রয়োজনীয় কাজ, শিল্পের কাজ, সম্মানের কাজ বলে আমরা মনে করি। (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ৪০৩)

তথাপি আবদুল খালেক ঢাকার বুকে নাটক করে বেড়ানো ভানসর্বস্ব নাট্য সংগঠকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছেন বলে অর্থের প্রতাপে নিজে হয়ে ওঠে এই ভাঙাচোরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হওয়া দলের প্রধান অভিনেতা। এমনকি দলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে যায় তার। তিনি জানেন তাকে শুষে নেয়ার জন্যই দলের ভেতর তার এত কদর। শিল্পের জন্য নয় যেন শিল্পপতি হওয়াটাই তার যোগ্যতা। অবশেষে আবদুল খালেক নাট্যশালা গ্রুপ থিয়েটারকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু গল্পের পরিসমাপ্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মাঠে যে বহুদলীয় কোন্দল তাকে শিক্ষা দেবে কে এই প্রশ্নের অমীমাংসিত সংকট উত্থাপন করেই গল্পের ইতি টানেন। আসলে মধ্যবিত্তের মানস প্রবণতায় যে কয়টি ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনৈতিক সামাজিক সংকট তৈরি করে তার মধ্যে স্বার্থ ও সুবিদাবাদ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আমরা শুধু স্বার্থ, সুবিধা, হতাশা, ক্লান্তি বা নৈতিক অধঃপতনই খুঁজে পাই তা নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে নিজের অংশগ্রহণের সক্রিয়তাও লক্ষ করি। তবে এই সক্রিয়তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংকটাপন্ন জীবনকে আরো সংকটের দিকে নিপতিত করে। 'সম্রাট' গল্পে জহির সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পারিবারিক অবস্থার বর্ণনা থেকে মধ্যবিত্তের এক চিরন্তন রূপ ধরা পড়ে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে জহির সাহেবের সংসার। পারিবারিক জীবনে তাঁর সুখী হবার কথা। কিন্তু দু'বছর আগে দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাবার পর সংসারের লাগাম যেন তাঁর হাত থেকে ছিটকে যায়। মেজাজি জহির সাহেবকে ছেলে-মেয়েরা ভয় পায়, তবে তারা তাঁর আড়ালে অন্যভাবে বেড়ে ওঠে। বড় ছেলে শাহেদকে নিয়ে তাঁর সংশয় শেষ পর্যন্ত সত্যি প্রমাণিত হয়। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে সে রাজনীতিতে জড়িত হয় এবং বাড়িতে একদিন পুলিশ এলে তিনি নিজে ছেলেকে ধরিয়ে দেন পুলিশের হাতে। নিজের পঙ্গু হবার কষ্টের চেয়ে এই কষ্ট আরো বড়। পঞ্চাশ দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির পারিবারিক জীবনের এই গল্প আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করলেও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা মধ্যবিত্ত

শ্রেণির দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনে ফাটল তৈরি করে, যার ফলে জহির সাহেবের মধ্যে শুরু হয় আত্মিক সংকট। এই গল্পে শাহেদ, স্ত্রী মরিয়ম এবং অন্যরা জহির সাহেবের মানসিক সংকটকে পারিবারিক সংকটে রূপান্তরিত করেছেন। জহির সাহেবের শারীরিক পঙ্গুত্বকে মানসিক পঙ্গুত্বের প্রতীকে দেখিয়েছেন লেখক। তাঁর ব্যক্তিজীবনের অসহায়ত্ব লেখকের বর্ণনায়–

> শাহেদের দৃষ্টিতে কী ছিল? ভয় না ঘৃণা? জহির সাহেব আর ভাবতে পারেন না। টলতে গিয়ে আরাম চেয়ারে বসেন। ঘৃণা? ওর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল তিনি যেন লকলকে আগুনের অতি কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, গায়ে আঁচ লাগছে তার। মনে হয়েছিল ভাবতে ভয় করে। সব তালগোল পাকিয়ে আসে! (সৈয়দ শামসুল হক, ২০১০ : ২০)

আদতে বিভাগোত্তর ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে রূপ আমরা পাই তাতে তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জায়গাটিকে যেমন দৃঢ় করেছে তেমনি ব্যক্তিগত জীবনকে করে তুলেছে সংকটাপন্ন। তারপরও যে শ্রেণি সময়ের বৈরিতাকে সব সময় অতিক্রম করতে চায় বলেই তারা মধ্যবিত্ত। সৈয়দ শামসুল হকের ছোটোগল্প বুকের ভেতর আশাবৃক্ষ তেমন। এ গল্পের দর্শন–

> রাজনৈতিক টানাপড়েন, বেকার সমস্যা, চাকুরির সংকট, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি ছিল লেখকের প্রধান লক্ষ্য। অনন্ত জীবনপ্রবাহে কোথাও ক্ষত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। জীবন তো স্থবির না। গভীর অন্ধকারেও মানুষ আলোর আকাঙ্ক্ষায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে। (অনিরুদ্ধ কাহালি, ২০১৫ : ১৬)

অর্থাৎ লেখকের অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম আর পর্যবেক্ষণ আমাদের বহমান জীবনের সহস্র ধারার সংকটের মধ্য থেকে মধ্যশ্রেণির সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বাস্তবতা হতে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা সময়ের বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনে পাঠক হৃদয়ে সত্য অনুভূতির অনুরণন তুলতে সক্ষম হয়েছে।

মোটের ওপর সৈয়দ শামসুল হক মধ্যবিত্তের জীবনকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে কখনো সে জীবন উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা পীড়িত, কখনো স্বার্থপরতায় সংকীর্ণ আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার প্রতিরোধহীন মনোবিকৃতির চাপে কখনো সে জীবন হয়েছে আচ্ছন্ন এবং পতিত। নাগরিক বিলাস বিভ্রমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পেরে যে জীবন হতাশায় পর্যবসিত, কিংবা অসম যৌন-বিকৃতি দ্বারা যে জীবন আক্রান্ত সে জীবনের গ্লানির দহনে সন্তপ্ত অনুভব তাঁর ছোটোগল্পে প্রণিধান। তাই তাঁর ছোটোগল্পের সংকটাবর্তে নিপতিত মধ্যবিত্ত জীবন পর্যবেক্ষণ সহজ এবং স্বাভাবিক।

সহায়কপঞ্জি

অনিরুদ্ধ কাহালি (২০১৫)। 'সৈয়দ শামসুল হকের গল্প বুকের মধ্যে আশাবৃক্ষ', (সম্পাদক : আহমেদ বাসার)। *অক্ষৌহিণী*, ঢাকা।

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৭)। 'মধ্যবিত্ত বাঙালির স্ফুরণ ও বাংলা চলচ্চিত্রে তার প্রতিরূপ', *মধ্যবিত্ত বাঙালি অন্তরমহল*, (সম্পাদনা : খোকন কুমার বাগ ও রঙ্গনকান্তি জানা)। রক্তকরবী, কলিকাতা।

আবদুল মওদুদ (২০১১)। *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সাংস্কৃতিক রূপান্তর*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমাদ মোস্তফা কামাল (২০১৫)। 'সৈয়দ হকের গল্প : জীবন ও পৃথিবীর চেনা-অচেনা কোণে বহুবর্ণিল আলো'। *জলেশ্বরীর জাদুকর*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

খালেদ হোসাইন (২০১৯)। 'সৈয়দ শামসুল হক : শ্রদ্ধাঞ্জলি'। *ভাষা-সাহিত্যপত্র*, ৪৫তম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জিনাত আরা হক (২০১৪)। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা* (সম্পাদক : শামসুজামান খান)। ৫৮ বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (২০০৩)। *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৮৮। *বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি*। পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ (২০১৬)। *বাংলার নবজাগৃতি*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

বিলকিস রহমান (২০১৩)। *উনিশ শতকে বাংলায় নারী পুরুষ সম্পক*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭)। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্য চেতনার রূপায়ণ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোস্তফা তরিকুল আহসান (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান (২০০৯)। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত (১৯৯০)। *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

সেলিনা হোসেন (২০১৫)। 'কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক', *জলেশ্বরীর জাদুকর*, (সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য)। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০১০), *গল্পসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা।

Karl Marx & Friedrich Engles (2018). *The Communist Manifesto*. Vintage, London.

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বরূপ : একটি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

শুভেন্দু সাহা* ও তিথি দেবনাথ†

[সারসংক্ষেপ : আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজব্যবস্থায় আন্তর্জালকে (Internet) কেন্দ্র করে সামাজিক বন্ধনের একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের হাত ধরে। পারস্পরিক তথ্য আদানপ্রদানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে গুরুত্ব তা ফুটে ওঠে ব্যবহারকারীর ভাষিক প্রকাশের দ্বারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও সমৃদ্ধ ভাষা বাংলার যে বহুমাত্রিক ব্যবহার হয়ে থাকে তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা সংকোচনের মাত্রা নির্ণয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের নানান অনুষঙ্গের স্বরূপ কেমন, সেই প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। সংখ্যা ও গুণগত পদ্ধতির মিশ্রণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মতো ইন্টারনেটের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীরা ভাষার যে প্রকাশ ও প্রয়োগ করেন তার যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়— সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষায় কোড মিশ্রণ, রেজিস্টার, অপভাষা, আন্তর্ভাষিক অনুবাদ, উপভাষার ব্যবহার, অর্থ পরিবর্তন ও ভাষাবিকৃতিও হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহারের বহুমাত্রিকতার সাথে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় করে গবেষণাকর্ম অব্যাহত থাকলে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ নিরূপণ করা আরও সহজ হবে।]

সমাজ ও ভাষার যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে বিশ্লেষণ করতে গেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Networking Site) এবং সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ধারণাটি তুলনামূলক নতুন হলেও দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রূপ পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যার বিচারে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে যোগাযোগের উৎকর্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহারও হচ্ছে বহু আঙ্গিকে এবং সেটি যে সময়ের পরিক্রমায় একটি বৃহৎ পরিসর লাভ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারে স্বরূপ উন্মোচন করা এবং আগামী সময়ে বাংলা ভাষার বিচিত্ররূপকে তুলে ধরার প্রয়াসে এই গবেষণার যৌক্তিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ফলে ভাষার অব্যবহিত পরিবর্তন, প্রতিবর্ণীকরণ, অপভাষার ব্যবহার, নতুন শব্দ গঠন, অর্থের প্রসারণ ও সংকোচন, উপভাষার ব্যবহার, রেজিস্টার, কোড মিশ্রণ, ভাষাবিকৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
† প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা পদ্ধতি

কোনো গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহের ধরন ও উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে গবেষণার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এই গবেষণাকর্মেও ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহে গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Method) ও সংখ্যাগত পদ্ধতির (Quantitative Method) মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। সমাজে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয় যেগুলো শুধু সংখ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষেত্রে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান গবেষণাটিতেও সংখ্যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। তাই গবেষণাটিতে মিশ্র পদ্ধতির (Mixed Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণাটির উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজে বিভিন্ন স্তরের বাংলাভাষী ১০০ জন অংশগ্রহণকারী থেকে সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উপাত্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, জার্নালে প্রকাশিত লেখা, আন্তর্জাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে উপাত্ত বিশ্লেষণে গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক যুগের একটি নতুন বিষয় হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মানবীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ মাধ্যমটি আন্তর্জালিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক দূরত্ব ঘুচিয়ে মানবীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল এবং তুলনামূলক সহজ করেছে। অর্থাৎ ঘরে বসেই আমরা ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারছি এর মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগ বলতে নির্দিষ্ট সমাজে মানুষের সাথে পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান বা সামাজিকতা বজায় রাখাকেই নির্দেশ করা হয়। আর এক্ষেত্রে যেসব মাধ্যম আমাদের সহায়তা করে সেগুলোকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলা যায়। পূর্বে টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর থেকে এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে যোগাযোগের নবতর সংযোজন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Networking Site), যাকে অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া (Social Media) বলেও আখ্যায়িত করে থাকে।

মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েব ২.০ (Web 2.0) অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন যেখানে মানুষ ব্যক্তিক পর্যায়ে বা সমষ্টিগত উপায়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ভার্চুয়াল সমাজ গঠন করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ যে শুধু মনের ভাব প্রকাশ করে তা নয় বরং শিক্ষা, বিজ্ঞান, ধর্ম, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, ফ্যাশন, বিনোদন, সংবাদ প্রচার, সামাজিক বন্ধন তৈরি করা, বেকারত্ব দূরীকরণসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। এখানে ব্যক্তি তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আগ্রহের প্রকাশ ঘটায়। বর্তমানে শুধু লিখিত বার্তাই নয় বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ স্থিরচিত্র, চিত্রকর্ম, বক্তব্য উপস্থাপন (Audial Presentation) এবং তার চিত্ররূপের উপস্থাপন (Vedio) এর মাধ্যমেও একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ফলে টেলিফোন বা ফ্যাক্স কেন্দ্রিক যোগাযোগের যে সীমাবদ্ধতা সেটি অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কারণে। যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমের বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে সেহেতু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মানুষ সামাজিক উপাত্তগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে প্রাত্যহিক আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা বা নিজ নিজ কর্মস্থলের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ভাষা ও সমাজের সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা নিরূপণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। বর্তমানে পৃথিবীতে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে– ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুক মেসেঞ্জার, উইচ্যাট, হোয়াটস্অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, কিউ কিউ, কিউ জোন, স্ন্যাপচ্যাট ইত্যাদি। ব্যবহারকারী সংখ্যার বিচারে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় ফেসবুক।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম	ইংরেজি নাম	ব্যবহারকারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)
ফেসবুক	Facebook	২৪৯৮
ইউটিউব	YouTube	২০০০
হোয়াটস্অ্যাপ	WhatsApp	২০০০
ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার	Facebook Messenger	১৩০০
উইচ্যাট	WeChat	১১৬৫
ইনস্টাগ্রাম	Instagram	১০০০
টিকটক	TikTok	৮০০
কিউ কিউ	QQ	৭৩১
কিউ জোন	QZone	৫১৭
সিনা উইবো	Sinaweibo	৫১৬
রেডিডট	Reddit	৪৩০
কুয়াইশু	kuaishou	৪০০
স্ন্যাপচ্যাট	Snapchat	৩৯৮
টুইটার	Twitter	৩৮৬
পিনটারেস্ট	Pinterest	৩৬৬
ডাওবান	Douban	৩২০
লিঙ্কডিন	LinkedIn	৩১০

সারণি-০১ : জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারকারীর বিচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ (সূত্র : Most famous social network sites worldwide as of April 2020, ranked by number of active users (in millions). Statista. Archived *from the original on September 17, 2019*. Retrieved February 25, 2018)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বাংলা ভাষিক সমাজে এর অবস্থানের চিত্রপট

স্নায়ুযুদ্ধকালে আমেরিকা বহির্বিশ্বে তাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ফ্যাক্স, টেলিফোন/টেলিগ্রাফের বাইরে নতুন একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালায়। তার প্রেক্ষিতেই ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট প্রযুক্তিটি উদ্ভাবিত হয়েছে। ধীরে ধীরে

ইউরোপিয়ান দেশগুলো এবং এশিয়ার ধনী রাষ্ট্রগুলো ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর এ সুযোগ পেতে বেশ কিছু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায় ১৯৯৬ সালের জুন মাসে। বাংলাদেশের যেসব মানুষ বিদেশে অবস্থানরত ছিল তারা এটিকে সাদরে গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে ইন্টারনেটের নানাবিধ ব্যবহার সূচিত হয় এ দেশের মানুষের কাছে।

২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশনকৃত জনগোষ্ঠী ছিল ৬,১৭,৩০০ জন (Internet users, World Bank, accessed 27 September 2011)। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে বিশাল জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করার মতো বিষয় যে– বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ইন্টারনেটের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। আর এক্ষেত্রে এককভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহৃত মাধ্যমটি হচ্ছে ফেসবুক। ফেসবুক ২০০৪ সাল থেকে ব্যবহার শুরু হলেও বাংলাদেশে এটি চালু হয় ২০০৬ সালে। ২০১০ সালে মাত্র ৬ বছর পর বিশ্বে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০ মিলিয়ন। বাংলাদেশের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রায় ৮৪% সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। তবে ফেসবুক ছাড়াও ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুক মেসেঞ্জার, উইচ্যাট, হোয়াটস্এ্যাপ, টিকটক, ইনস্টাগ্রামসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও বাংলা ভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রায় সবকটিতেই বাংলা ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। Globalstate counter এর মতে বাংলাদেশে ব্যবহারে দিক থেকে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো হলো–

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম	ইংরেজি নাম	ব্যবহারকারী (শতাংশ)
ফেসবুক	Facebook	৮৪.৬৩
ইউটিউব	YouTube	১০.৩
পিনটারেস্ট	Pinterest	২.৭২
টুইটার	Twitter	১.১৮
লিঙ্কডিন	LinkedIn	০.৪৬
ইন্সটাগ্রাম	Instagram	০.৩৭

সারণি-০২ : Globalstate counter এর মতে বাংলাদেশে ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত ব্যবহারের দিক থেকে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

অন্যদিকে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি একটি দেশের পরিচয়, আর্দশ ও সংস্কৃতিকে বহন করে। বলা হয়ে থাকে 'Language shapes & developes a culture.' (Hasan, 2009)। বাংলা বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষা। এদেশের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষাটি ব্যবহৃত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ১৯৮৭ সালে এ বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা আইনের প্রচলন করা হয়। (বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সংগ্রহের তারিখ– ০১/০৬/২০২০।) সুতরাং বাংলা ভাষার ব্যবহারে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যবস্থাদি যেমন রয়েছে

ঠিক তেমনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে ভাষা ব্যবহারে আবেগের বিষয়টিও সামনে আসে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলাভাষীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে বাংলার প্রয়োগ করেন তাতে অনেকসময় ভাষার নতুন কাঠামো যেমন তৈরি হয় ঠিক তেমনি ভাষা বিকৃতিরও নতুন পথ উন্মোচিত হয়।

সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা পরিস্থিতি নির্ণয়

ভাষাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক জ্ঞানক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য আলোচিত বিষয় সমাজভাষাবিজ্ঞান, যেখানে সমাজ গঠনের অন্যতম উপাত্ত ভাষাকে সামাজিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করে ভাষার বহুমুখী ব্যবহারের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেহেতু মানুষের মধ্যে যোগাযোগের একটি সামাজিক বলয় তৈরি করে আর তার বাহন হিসেবে কাজ করে ভাষা সেহেতু সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভার্চুয়াল সমাজ ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা প্রাসঙ্গিক। সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা পরিস্থিতির স্বরূপ উন্মোচন করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

আন্তঃভাষিক অনুবাদ ও প্রতিবর্ণীকরণ

অনুবাদশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রাথমিকভাবে তিন প্রকারের অনুবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এক. আন্তঃভাষিক অনুবাদ (Inter Lingual Translation); দুই. অন্তঃভাষিক অনুবাদ (Intra Lingual Translation); তিন. প্রতিবর্ণীকরণ (Transliteration)। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষার লিখিত রূপ ব্যবহার হয় সেহেতু অনুবাদের বিষয়টিও উঠে আসে। সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের চিত্ররূপ তুলে ধরতে গেলে দুইপ্রকার অনুবাদ পাওয়া যায়। যথা : আন্তঃভাষিক অনুবাদ এবং প্রতিবর্ণীকরণ। সাধারণত মাতৃভাষা বাংলা এমন কোনো বহুভাষিক ব্যক্তি যদি ইংরেজি বা আরবি বা অন্যকোনো ভাষায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার অবস্থা বা অবস্থান তুলে ধরেন তখন তিনি এর বাংলা অনুবাদ করেও দেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তঃভাষিক অনুবাদের উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় ব্যক্তি গুগল ট্রান্সলেটরের (Google Translator) মাধ্যমেও ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। যদিও এইক্ষেত্রে অনেকসময় ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদে শব্দের যথাযথ অর্থ যেমন পাওয়া যায় না ঠিক তেমনি বাক্যগঠনও পুরোপুরি সঠিক হয় না। অন্যদিকে বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু হওয়ার পর থেকেই রোমান (ইংরেজি) হরফে বাংলা লেখার প্রচলন থাকায় প্রতিবর্ণীকরণের বিষয়টিও ছিল। প্রতিবর্ণীকরণ বলতে মূলত যে বিষয়টি বোঝায় তা হলো– কোনো ভাষার হরফ থাকা সত্ত্বেও যদি অন্য কোনো ভাষায় সংশ্লিষ্ট ভাষায় লেখা (শব্দ/বাক্য) হয় তবে তাকে প্রতিবর্ণীকরণ বলে। তার পিছনে রয়েছে দুটি কারণ। ১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা আন্তর্জালে (Internet) বাংলা হরফ লেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং ২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিকাশের প্রাক্কালে বাংলা হরফ না থাকার ফলে ইংরেজি হরফে

বাংলা লেখার অভ্যাস গড়ে ওঠা। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাটিয়ে উঠে ইউনিকোডের মাধ্যমে আন্তর্জালিক পর্যায়ে বাংলা হরফের প্রচলন সম্ভব হলেও এখনো ইংরেজি হরফে বাংলা লেখা হয়ে থাকে। এই প্রতিবর্ণীকরণ করতে গিয়ে অনেক বাংলাভাষীই যথাযথ বর্ণের ব্যবহার করেন না। ফলে একধরনের উচ্চারণ বিকৃতির মুখে পরতে হয় অন্য ব্যবহারকারীদের। যেমন–

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেভাবে লেখা হয়	মূল শব্দ	ইংরেজিতে লিখলেও যেভাবে লেখা উচিত
murad	মুরোদ	murod
takla	থাকলে	thakle
pasa	পাশে	pashe
vula	ভোলা	bhola

এরকম আরও অনেক শব্দের ক্ষেত্রে এমন ব্যবহার দেখা যায় যা প্রকারান্তরে বাংলা ভাষার বিকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোড মিশ্রণ

সাধারণত দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে কোডের সহাবস্থান দেখা যায়। অর্থাৎ বাক্যালাপ, বক্তব্য প্রদান বা লিখিত কোনো কিছু উপস্থাপনের সময় এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন স্তরে যে সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ ঘটে তাকে কোড মিশ্রণ বলা হয়। পৃথিবীর সকল ভাষায় কমবেশি কোড মিশ্রণ দেখা যায়। কোড মিশ্রণ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী কাছারু বলেন–

> Code mixing is the use of one or more languages for consistent transfer of one or more linguistic units from one language into another, and by such a language mixture developing a restricted or not-so-restricted code of linguistic interaction. (Kasaru, 1978).

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ উপজীব্য বিষয় উপস্থাপনের সময় কখনো কখনো সচেতনভাবে বা কখনো কখনো অসচেতনতার কারণে কোড মিশ্রণের ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। 'দ্বিভাষিক এবং বহুভাষিক রাষ্ট্রগুলোতে কোড পরিবর্তন (Code switching), কোড মিশ্রণ (Code mixing) স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। কারণ এক ভাষার সাথে অন্য ভাষার সংযোগে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়' (মৃণাল নাথ, ১৯৯৯)। কিন্তু বাংলাদেশের ভাষিক সম্প্রদায় একভাষী হওয়ায় এ ধরনের পরিস্থিতি বাংলা ভাষার জন্য উদ্বেগজনক। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষায় কোড পরিবর্তন, কোড মিশ্রণ এবং প্রমিত ভাষার বিকৃতি দেখা যাচ্ছে। আর এগুলো মানুষের মৌখিক ভাষাকে ছাড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভাষায়ও প্রভাব ফেলছে। বাংলা ভাষিক সমাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা সাধারণত বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় তার সাথে সংগতভাবে বা অসংগতভাবে ইংরেজি ভাষা জুড়ে দেয়। কখনোবা হিন্দি ও আরবি শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। মূলত বাংলা ভাষার সংশ্লিষ্ট বিদেশি শব্দের সমার্থক শব্দ থাকার পরেও ব্যবহারকারীরা কোড মিশ্রণ করে থাকেন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১০০ জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর মধ্যে ৭৭ জন মনে করেন

মানুষ তার নিজস্ব ধ্যানধারণাগত এবং সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, পেশা, শব্দভান্ডারের অপ্রতুলতা এবং অসচেতনতার কারণে বাংলার সাথে অন্যভাষা মিশিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোড মিশ্রণ করে থাকে। উদাহরণ :

-তুই কি সালমান খানের লাস্ট ফিল্মটা দেখেছিলি? সিমপ্লি অউসাম। মাই গ্যড, আই জাস্ট কাআন্ট বিলিভ মানুষ কীভাবে এতো শক্তিধর হতে পারে। টউটালি আনবিলিভেবল!
-রিয়েলি? ওহ্ আই মিসড দ্যাট ফিল্ম। এনি ওয়ে, তুই কখন এলি? লান্চ করেছিস?.... ওকে, নো প্রব, লেটস হেভ লান্চ টুগেদার।

উপরিউক্ত উদাহরণে বাংলা ভাষার সাথে যে ইংরেজি শব্দ বা বাক্যের (ফিল্ম, সিমপ্লি, অউসাম, মাই গড, আই জাস্ট কান্ট বিলিভ, টউটালি আনবিলিভেবল, রিয়েলি, ওহ আই মিসড দ্যাট ফিল্ম, এনি ওয়ে, লাঞ্চ, নো প্রবলেম, লেটস হেভ লাঞ্চ টুগেদার) ব্যবহার হয়েছে তার প্রতিটিরই বাংলা শব্দ থাকার পরেও কোডমিশ্রণ করা হয়েছে। এই কোড মিশ্রণ সর্বদা বাংলা ভাষার জন্য সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসে না, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সচেতনভাবে বাংলা ভাষার সাথে অন্য ভাষার মিশ্রণ করে কোড মিশ্রণ করার প্রবণতা বেশি থাকে, তবে তাদের মধ্যে শতকরা ৮৭ শতাংশ মানুষের কোডমিশ্রণ নামক সমাজভাষাবিজ্ঞানের এই বিষয়টির সাথে পরিচয় নেই। আরও একটি বিষয় যে– শুধু বাংলা ভাষার সাথে অন্য ভাষারই যে মিশ্রণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয় তা নয় বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকেই প্রমিত বাংলার সাথে উপভাষার মিশ্রণ করেন আবার চলিত ভাষার সাথে সাধু ভাষার মিশ্রণ করেন।

অপভাষার ব্যবহার

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত অপভাষা বা (Slang) ব্যবহার করে। অপভাষা বলতে আমরা যা বুঝি– যে ভাষার ব্যবহার মানুষের নেতিবাচক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। ভাষাবিজ্ঞানীরাও এর সংজ্ঞায়ন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত থেকেছেন সবসময়।

> Linguists have no simple and clear definition of slang, but agree that it is a constantly changing linguistic phenomenon present in every subculture worldwide. Some argue that slang exists because we must come up with ways to define new experiences that have surfaced with time and modernity. *(Dumas Bethany K. & Lighter Jonathan, 1978)*

অপভাষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাদান করা কঠিন কারণ অপভাষা এবং অপভাষার ধারণা প্রতিনিয়ত খুব দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে– অপভাষা দেশ, কাল, স্থান বা সমাজভেদে একইরূপ বা তাৎপর্য বহন করে না। ফলে

অপভাষা শুধু ভাষার নেতিবাচক দিক তুলে ধরে বিষয়টি এমন নয় বরং ভাষার ব্যবহারকারীদের কাছে এটি নতুন অভিজ্ঞতারও জন্ম দেয়। বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় এটি রূঢ় বাস্তবতা হলেও সত্য যে অপভাষার ব্যবহার বেশি। ভিন্ন ভিন্ন নামে অপভাষা প্রচলিত হলেও অনেকে একে সুভাষণের বিপরীত বলে মনে করেন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১০০ জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২৬ জন মনে করেন মানুষ তার নিজস্ব ধ্যানধারণাগত এবং সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, শব্দভান্ডারের অপ্রতুলতা এবং অসচেতনতার কারণে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে অপভাষার প্রয়োগ করেন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬৪ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই মানুষ অপভাষার প্রয়োগ করেন। অপভাষা যে সর্বদা অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় তা নয়। অনেকসময় নিছকই মজার ছলেও কোনো কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী বাংলা অপভাষা ব্যবহার করে থাকেন। আবার অনেকে সচেতনভাবে বাংলা অপভাষা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শব্দে প্রথম অক্ষর লিখে শেষের অক্ষরগুলোর স্থলে বা শেষের অক্ষর লিখে প্রথম অক্ষরের স্থলে বা প্রথম এবং শেষের অক্ষর লিখে মাঝের অক্ষরের স্থলে তারকা চিহ্ন (***) ব্যবহার করেন। সচেতনভাবে এমন তারকা চিহ্নের ব্যবহার করলেও অনেকেই অপভাষা ব্যবহারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

রেজিস্টার এর ব্যবহার

সমাজভাষাবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রেজিস্টার বা পেশাগত বুলি। মানুষ তার দৈনন্দিন অথবা ব্যক্তিগত জীবনে যেসকল শব্দ বা বাক্যিক কাঠামো অনুসরণ করে কর্মক্ষেত্রে সেটা করে না। আবার কর্মক্ষেত্রের শব্দভাণ্ডার সে তার ব্যক্তিগত জীবনে চর্চা করে না। পেশাগত জীবনে ব্যবহৃত এ সকল বুলিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে রেজিস্টার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। William Labov সহ আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানীরা একে 'Functional varieties of a language' বলে আখ্যায়িত করেছেন (মৃণাল নাথ, ১৯৯৯)। যদিও ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে বিভিন্ন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে তাকে রেজিস্টার হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে– 'The name given to a variety of a language distinguished according to use is Register.' (Halliday, 1964)। বাংলা ভাষিক অঞ্চলে রেজিস্টারবিষয়ক ধারণা না থাকার পরেও গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শতভাগ মানুষই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পেশাগত শব্দের প্রয়োগ করেন বলে মত দেন। তবে প্রকৃত অর্থে এটি পুরোপুরি সত্য নয়। কেননা অনেক বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ছবি আদানপ্রদানের উপলক্ষ্য মনে করেন।

উদাহরণ : আপাতত ইমারজেন্সি রোগী ছাড়া অন্য রোগী চেম্বারে দেখা বন্ধ।

সবাই নিরাপদে থাকুন।
ঈশ্বর সবাইকে রক্ষা করুন।

উপরিউক্ত উদাহরণটি একজন চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া তার একটি অনুভূতি থেকে নেওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি তার পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট– ইমারজেন্সি, রোগী, চেম্বার শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

নারী-পুরুষ ভেদে ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য

ভাষা ব্যবহারে পার্থক্যের মাত্রা নির্ণয় করতে করতে গেলে যে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে তার মধ্যে অন্যতম হলো লিঙ্গ (Gender)। সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমাজের ভাষা ব্যবহারে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এমনকি বাসস্থান বা কর্মস্থল ভেদেও নারী পুরুষের ভাষার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত নারীদের মধ্যে ভাষার প্রমিতরূপ ব্যবহারের প্রবণতা বেশি যেটা পুরুষের মধ্যে তুলনামূলক কম। এছাড়া সামাজিক নানারকম বিধিনিষেধের কারণে নারী পুরুষের তুলনায় সুভাষণের ব্যবহার বেশি করে। এছাড়াও অপভাষা ব্যবহার নারীর তুলনায় পুরুষ স্বভাবজাতভাবেই বেশি করে। বাংলা ভাষা ব্যবহার হওয়া সমাজব্যবস্থায়ও নারী-পুরুষের ভাষায় এমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন এমন ১০০ জনের মধ্যে ৪৯ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়। ১০০ জনের মধ্যে ৬৭ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীদের ভাষায় প্রমিতকরণের মাত্রা পুরুষের তুলনায় বেশি। এছাড়া বাঙালি নারীরা সমাজব্যবস্থায় রক্ষণশীল হওয়ার কারণে তাদের ভাষায় পুরুষের তুলনায় অপভাষার ব্যবহার কম এবং সুভাষণের প্রয়োগ বেশি হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

উপভাষার ব্যবহার

উপভাষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Dialect' প্রথম ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয় ষোড়শ শতকে। শব্দটি প্রথমে গ্রীক ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং পরে ল্যাটিন ও ফরাসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে আসে। গ্রিকে উপভাষার অর্থ ছিল– কথা বলার প্রকৃতি। প্রাচীন ইংরেজিতে উপভাষার অর্থ ছিল– কোনো বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা অনুসৃত ভাষারূপ। উপভাষা সাধারণত সংস্কৃতি ও অঞ্চল নির্ভর হয়। উপভাষা যেমন সমাজ ভেদে ভিন্ন হয়, ঠিক তেমনি অঞ্চল ভেদেও ভিন্ন হয়, আবার সামাজিক শ্রেণি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিভেদেও ভিন্ন হয়। যার প্রমাণ উঠে আসে–

> A dialect that is associated with a particular social class can be termed a sociolect, a dialect that is associated with a particular ethnic group can be termed an ethnolect, and a geographical/regional dialect may be termed as regiolect. (Wolfram, Walt and Schilling, Natalie, 2016).

গবেষণায় অংশ নেওয়া ১০০ জনের মধ্যে ৫২ জন উপভাষা ব্যবহার করেন বলে মত দেন যাদের মধ্যে অনেকেই প্রমিতভাষা ও উপভাষার মিশ্রণের ব্যবহার করেন। বাকিরা প্রমিতভাষা ব্যবহার করেন।

উদাহরণ :

> '*কাইলকা পরীক্ষা*, কিছুই *পড়িনাইক্যা*। হে আল্লাহ আমাকে *তুইল্যা* নাও, নয়তো *উপ্রে থেইক্যা* দড়ি ফেলাও আমি *উইঠ্যা* যাই।' পরীক্ষার আগের রাতে এই ছিল রনির (ছদ্মনাম) স্ট্যাটাস।

উপরিউক্ত উদাহরণে দৃষ্টি দিলে যেকোনো বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী বুঝতে পারবে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত পুরাতন ঢাকার আঞ্চলিক ভাষার উদাহরণ। এরকম ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহারের ফলে একটি বহুমাত্রিক উপভাষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

অর্থের পরিবর্তন (প্রসারণ ও সংকোচন)

ভাষার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে তার বাইরের প্রকাশরূপ (expression aspect), আরেকটি হচ্ছে ভেতরের ভাব বা অর্থ (content aspect) (রামেশ্বর শ', ১৯৯৬)। অর্থকে বলা হয়ে থাকে ভাষার প্রাণ। সময়ের পরিক্রমায় ভাষার বহিঃস্থ কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি এর অন্তঃস্থ কাঠামোরও পরিবর্তন হয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যবহৃত বাংলা ভাষারও অর্থের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন ধারায় অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন– অর্থের প্রসারণ, অর্থের সংকোচন ইত্যাদি (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৯)। অর্থের সংকোচন– যখন কোনো শব্দের অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবকে বোঝাতো এবং পরবর্তীকালে তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ভাবকে না বুঝিয়ে একটি ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থ সংকোচন বলে। যেমন– 'ধইঞ্চা' শব্দটির মূল অর্থ ছিল এক ধরনের সবজি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর পরিবর্তিত অর্থ হয়েছে– মূর্খ, বোকা বা সহজ সরল ব্যক্তি।

অর্থ প্রসারণ বলতে কোনো শব্দ যখন কোনো সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং পরবর্তীকালে অর্থ পরিবর্তন হয়ে ব্যাপক ভাব বা একাধিক বস্তুকে বোঝায় তাহলে সে প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে অর্থ প্রসারণ। সাধারণত রূপক বা অতিশয়োক্তির কারণে অর্থের এরকম প্রসারণ ঘটে (রামেশ্বর শ', ১৯৯৬)।

যেমন– বাংলায় 'জটিল' শব্দটি দুরূহ, কুটিল বোঝাতো কিন্তু বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শব্দটি সুন্দর, ভালো অর্থাৎ কোনো ভাব বা বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার হয়। এরকম আরও কিছু শব্দ হলো– 'অস্থির' যার মূল অর্থ চঞ্চল বা স্থির নয় এমন অথচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে– এমন কিছু যা খুবই সুন্দর বা আশাপ্রদ।

গবেষণায় অংশ নেওয়া ১০০ জনের মধ্যে ৬৮ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার অর্থ পরিবর্তিত হচ্ছে। যার মধ্যে অনেকেই এই পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও কেউ কেউ একে অর্থ বিকৃতির কারণও বলে অভিহিত করেছেন। অনেকের ক্ষেত্রে বানান ব্যবহারে অসতর্কতা, সঠিক বানান না জানার কারণে উচ্চারণের বেলায় ধ্বনিগত পরিবর্তন হওয়ায় অর্থেরও পরিবর্তনও ঘটছে। কোনো কোনো সময় প্রচলিত শব্দের ব্যবহারের বদলে তুলনামূলক সহজ শব্দ ব্যবহার করেও সংশ্লিষ্ট অর্থ নির্দেশ করতে গিয়েও অর্থের পরিবর্তন হচ্ছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৫০ শতাংশ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচলিত শব্দের বদলে একই অর্থ নির্দেশকারী বা কিঞ্চিৎ অর্থ পরিবর্তন হয়েছে এমন

শব্দ ব্যবহার করতেও অসুবিধা বোধ করেন না। এই পরিবর্তনের ফলে অর্থের যেমন সম্প্রসারণ ঘটছে ঠিক তেমনি অর্থ সংকোচনের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

শব্দসংক্ষেপণ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা শব্দ সংক্ষেপ বা অ্যাক্রোনিমের ব্যবহার করলেও বাংলা ভাষায় এর উদাহরণ খুব বেশি নয়। তবে ইংরেজি ভাষায় এর উদাহরণের সংখ্যা প্রচুর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ফলেও আমরা বাংলাতেও এমন অনেক শব্দসংক্ষেপ বা অ্যাক্রোনিমের ব্যবহার লক্ষ করে থাকি। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৩৭ শতাংশ মানুষ মনে করেন বাংলা ভাষাতেও এমন শব্দ সংক্ষেপ তৈরি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দকে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যবহারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকসময় বর্ণের সাথে সংখ্যার ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি বা বাংলা বর্ণের সাথে বাংলা বর্ণ, সংখ্যা বা ইংরেজি বর্ণ সংখ্যা বসিয়েও অনেক সময় শব্দ সংক্ষেপ করা হয়। যেমন : on১ (অনেক); এখানে ইংরেজি অন on এর সাথে বাংলা সংখ্যা ১ বসিয়ে অনেক শব্দটিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এরকম আরও যেমন : ১টু (একটু), kmon (কেমন), jmon (যেমন) ইত্যাদি।

আবার অনেকসময় দেখা যায় ধ্বনি পরিবর্তনের মতো লেখার ক্ষেত্রে বর্ণের পরিবর্তন করতেও দেখা যায়। যেমন : মনে চায়>মুঞ্চায়। এখানে 'অ' কার 'উ' কারে যেমন পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক তেমনি 'এ' কার 'আ' কারের প্রভাবে 'আ' কারে পরিণত হয়েছে। আবার 'ন' এবং 'চ' আলাদা ভাবে না বসে যুক্ত অবস্থা লাভ করে 'ঞ্চ' হয়ে গেছে। এরকম আরও যেমন : কীএক্টাবস্তা> কী একটা অবস্থা; এগ্লা> এগুলা> এগুলো।

অনেকসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মনের ভাব সরাসরি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ না করে চিহ্ন বা চিত্রের মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে ইমোজি বা ইমোটিকনের (অনুভূতি প্রকাশক চিহ্ন) মাধ্যমেও বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীরা তাদের আবেগ, হাসি, কান্না, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

সাহিত্যচর্চা ও বিশ্লেষণ

বাংলা ভাষিক সমাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে অনেকেই মনের ভাব প্রকাশের একটি ভার্চুয়াল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, অনেকে একে সংবাদ প্রচারের মাধ্যম বা আধুনিক যুগের সাহিত্যচর্চা করারও একটা অন্যতম ক্ষেত্র বলে মনে করেন। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৯০ শতাংশ মানুষ একে সাহিত্য ও সংবাদ প্রকাশের মাধ্যম মনে করেন। আরও একটি বিষয় এর সাথে যোগ করা প্রয়োজন যে– শুধু সাহিত্য বা সংবাদ প্রচার নয় এর যথাযথ বিশ্লেষণ ও সমালোচনারও একটি ক্ষেত্র হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কাজ করে।

বাংলা ভাষার বিকৃতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো তৈরি করেছে একধরনের ভার্চুয়াল সামাজিক বাস্তবতা, যার প্রভাব পড়ছে মানবীয় সম্পর্কগুলোতেও। আর এই পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবক হচ্ছে ভাষা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন সারা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারকে নানাভাবে

প্রভাবিত করছে। বাংলা ভাষাও এর বাইরে নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বাংলার পাশাপাশি প্রায়শই ইংরেজি এবং বিভিন্ন বিদেশি শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষার ব্যবহারও যথাযথ প্রক্রিয়ায় না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হচ্ছে। যেমন : বেসম্ভব (শুদ্ধরূপ– অসম্ভব), দ্যাশ (শুদ্ধরূপ– দেশ), কিন্যা (শুদ্ধরূপ– কিনে)। মাধ্যমগুলোতে শুধুমাত্র বাংলা ভাষার কথ্য রূপই নয় অনেকসময় আঞ্চলিক রূপও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সর্বদার জন্য ভাষার শুদ্ধরূপের বিকাশে হচ্ছে না। অধিকাংশ সময়ে এটি বাংলা ভাষার বিকৃতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। 'বাংলা ভাষা যদি প্রতিনিয়ত এমনভাবে বিকৃত হতে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার শুদ্ধ রূপ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে। বাংলা ভাষা দূষণ রোধে ও বেতার, দূরদর্শনে উচ্চারণ বিকৃতি রোধে হাইকোর্টের রুল ও নির্দেশনা রয়েছে।' (মহিউদ্দিন ফারুক, প্রথম আলো, ২০১৪)। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাংলা ভাষার যে দূষণ পরিলক্ষিত হয় তা আইন করে রোধ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সচেতনতাই ভাষার এ দূষণ রোধ করতে পারে।

উপসংহার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়। ভার্চুয়াল এই সমাজব্যবস্থায় ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ আপন মনের যাবতীয় বিষয়ের পাশাপাশি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র, অবস্থা এবং অবস্থান, সময়, পরিবেশ, শিক্ষা, জীবনদর্শন, বাণিজ্য ও বিনোদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে থাকে। এই বৃহৎ এবং দ্রুত পরিবর্তশীল ওয়েব মাধ্যমের মতো এখানে ভাষাও পরিবর্তন হয় মানুষেরই পুনঃপুন ব্যবহারে। ভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিকও বটে। বাংলা ভাষা এর আওতামুক্ত নয়। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাংলা ভাষার পরিবর্তন ঘটে। কখনো নতুন শব্দের তৈরি হয়, কখনো অর্থের নতুন সম্প্রসারণ ঘটে, কখনো সাহিত্যের অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়, কখনো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের কারণে একে অন্যের কর্মজগতের ভাষা বা ভিন্ন ভিন্ন এলাকার উপভাষাও জানতে পারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিন্তু এতসব ইতিবাচকতার মধ্যেও দুঃখজনক যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে বাংলা ভাষার বিকৃতির মাত্রাও কম নয়। ফলে এক প্রজন্মের কাছে অন্য প্রজন্মের ব্যবহৃত বাংলাকে অনেকসময় বিদঘুটে মনে হয়। কালের স্রোতের মতো ভাষার অব্যবহিত পরিবর্তনকেও রোধ করা সম্ভব নয়, তবে সচেতনভাবে ভাষার ব্যবহার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। এর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে আরও সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে বাংলা ভাষিক সমাজে ভাষা প্রযুক্তি (Language Technology) নিয়ে কাজ করারও এখনই উপযুক্ত সময়। কেননা বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আন্তর্জালীয় যেকোনো মাধ্যমে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তিগত জায়গায় বাংলা ভাষা ব্যবহারে সহজবোধ্যতা সৃষ্টি ও যথাযথ প্রয়োগের বিকল্প নেই।

সহায়কপঞ্জি

মহিউদ্দিন ফারুক (২০১৪)। 'আইন আছে প্রয়োগ নেই'। *দৈনিক প্রথম আলো* ,ঢাকা।
মুহম্মদ আসাদুজ্জামান (২০১২)। *অনুবাদের ইতিবৃত্ত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
মৃণাল নাথ (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা।
রাজীব হুমায়ুন (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রামেশ্বর শ' (১৯৯৬)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, কলকাতা।
হুমায়ুন আজাদ (২০০৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
BB. Kachru, (1978). *Towards structuring Code-Mixing : An Indian Perspective*, International Journal of sociology and Language.
Bethany K. Dumas; Jonathan Lighter (1978). Is Slang a Word for Linguists? American Speech. 53 (5).
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/bangladesh
J. P Blom. & J. J. Gumperz (1972). *Social Meaning in Linguistic Structures: Code-switching in Norway.* In J. J. Gumperz, & D. Hymes (Eds.), *Directions in sociolinguistics* (pp. 409-434). New York: Holt, Rinehart, and Winston.
M.A.K Halliday, A. McIntosh and P. Strevens (1964). *Linguistic science and Language Teaching.* Longman, London.
Mamun Rashid (2013). *Social network driven changes in Bangladesh*. The Financial Express.
Most famous social network sites worldwide as of April 2020, ranked by number of active users (in millions). Statista. Archived *from the original on September 17, 2019*. Retrieved February 25, 2018
S. M. Hasan (2009). *Kaiser Haq: A post colonial poet writing from Bangladesh. Crossing*. ULAB journal of English studies, 2(1).
William Labov (1972b). *Sociolinguistics Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ : প্রসঙ্গ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

মো. আজিম উদ্দিন*

[সারসংক্ষেপ : মানুষের জীবনযাত্রার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত অথবা আলোড়িত নয়। বিশ্বায়ন মানবীয় সমস্ত বিষয়কে প্রভাবিত করতে পেরেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্থাৎ এমন একটি বিষয়ও নেই যে বিষয়টি বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বিশ্বায়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদ তার শোষণের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের সুগভীর প্রভাব লক্ষণীয়। বিশ্বায়নের পথ ধরেই বাংলাদেশে একে একে প্রবেশ করছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নানা উপাদান-অনুষঙ্গ আর অপ্রতিভ করে তুলছে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পথ ধরে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ কীভাবে বাঙালি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস থাকবে বর্তমান প্রবন্ধে।]

বিশ্বায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয়। সাম্প্রতিককালের এক প্রবল ও বহুল উচ্চারিত শব্দ হলো বিশ্বায়ন। এর নির্মাতা ও প্রবক্তাদের প্রচারগুণে এটা একালের এক নির্দোষ, নির্বিরোধী ও সর্বকল্যাণকর বিশ্ববিধানের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্বায়নের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বিশ্বায়ন উপহার দিয়েছে এক নতুন সভ্যতা যা পৃথিবী নামক গ্রহে এনে দিয়েছে এক প্রগাঢ় গুণগত পরিবর্তন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল ফিলিপস হান্টিংটন (১৯২৭-২০০৮) যাকে মন্তব্য করেছেন 'সভ্যতার সংঘাত' (The Clash of Civilizations) হিসেবে, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন 'ইতিহাসের সমাপ্তি' (The End of History) বলে, আবার করবিন একে ইঙ্গিত করেছেন 'মধ্যযুগের প্রত্যাবর্তন' বলে। বিগত দুই দশক ধরে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি বিশ্ব সমাজের অন্তর্গত ধনী-দরিদ্র, সুবিধাভোগী-সুবিধাহীন সব শ্রেণির মানুষকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে চলেছে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অর্থনীতি ও অর্থনীতি বহির্ভূত নানাবিধ স্বার্থ ও সম্পর্কের ঐক্য, সর্বজনীনতা ও সমরূপতা ইত্যাদি নির্দেশ করে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ। যেখানে বিশ্বায়নের ধারণাটি লক্ষ করা যায়। বিশ্বায়নে সংস্কৃতির প্রবাহ যেন একমুখী, সর্বজনীন এবং অভিন্ন। এতে সংস্কৃতির বৈচিত্র্যহীনতা একক সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এর পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ। বিশ্বায়নের কেন্দ্রে যারা অবস্থান করে তাদের সংস্কৃতি সর্বদাই আধিপত্য বিস্তার করে সম্মতি, আপস অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। বিশ্বায়নের ফলে ক্রমবিকাশমান তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আজ সর্বত্র বিরাজমান। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তরুণ সমাজ আজ নৈতিকভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি হুমকির সম্মুখীন– যা আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

* প্রভাষক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার দুটি উদ্দেশ্য : ১. বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও সংজ্ঞার্থ নিরূপণ এবং ২. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রভাব ও স্বরূপ অনুসন্ধান। গবেষণাকর্মে বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Narrative Manner) অনুসৃত হয়েছে। গবেষণাটি মূলত দ্বৈতীয়িক উৎস নির্ভর। দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে– বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা, প্রতিবেদন, দৈনিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, অনলাইন ওয়েবসাইট প্রভৃতি।

বিশ্বায়ন

'বিশ্বায়ন' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Globalization' এবং আরবি প্রতিশব্দ 'আল-আওলামাহ'। এর অর্থ কোনো বিষয়কে ব্যাপক করা এবং তার সীমারেখা বিস্তৃত করা। Webster's New Collegiate Dictionary-তে 'Globalization' এর অর্থ এভাবে দেওয়া আছে– কোনো বিষয়কে আন্তর্জাতিকতার পোশাক পরানো, কোনো বস্তুর সীমারেখা আন্তর্জাতিক বানানো। ফরাসি ভাষায় এটিকে 'Mondialization' বলে, যার অর্থ কোন বস্তুকে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে বানানো (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ৪৯ ও ৬০)। বিশ্বায়ন এক জটিল ও ব্যাপক প্রক্রিয়ার নাম। বিশ্বায়ন প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের বৈশ্বিক ভিত্তিতে অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের সাথে একীভূত করার প্রক্রিয়া। বহুমুখী এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামাজিক ও কৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রাবলি। ফলে প্রচলিত এ শব্দটিকে অবশ্য বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোল্যান্ড রবার্টসনই (Roland Robertson) 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির প্রবর্তক। তিনিই প্রথম একে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন ও সংজ্ঞায়িত করেন। রবার্টসনের মতে– "একটি ধারণা হিসেবে বিশ্বায়ন একদিকে যেমন বিশ্বের সংকুচীকরণ বোঝায়, অপরদিকে তেমনি বিশ্বে একত্রীকরণের ধারণারও সৃজন করে" (উদ্ধৃত : রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী, ২০১৫ : ১২৩)।

নোয়াম চমস্কি বিশ্বায়নের একটি ইতিবাচক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে : "বিশ্বায়ন হল একটি আন্তর্জাতিক সংহতিকরণ প্রক্রিয়া" (উদ্ধৃত : প্রাণগোবিন্দ দাশ, ২০১৩ : ২১৭)। পল হাস্ট ও গ্রাহাম থমসন তাঁদের *'Globalisation in Questions'* নামক বইটিতে বিশ্বায়নকে বর্ণনা করেন এভাবে :

> Globalisation has become a fashionable concept in the social sciences, a core dictum in the prescriptions of management gurus, and a catch phrase for journalist and politicians of every stripe. (উদ্ধৃত : মোঃ আকবর হোসেন, ২০০৯ : ৪)

বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা WTO তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংজ্ঞাটি লক্ষ করা যাক–

> বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল দেশের মাঝে সেই অর্থনৈতিক সহযোগিতার নাম, যা প্রোডাক্ট ও সার্ভিসেস (পণ্য ও সেবা)-এর বিনিময় বৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে সে সকল দেশের পুঁজি ও মূলধনেও প্রবৃদ্ধি হয়। সেই সাথে বিশ্বের প্রতিটি কোণে অতিদ্রুত টেকনোলজির বিকাশ হয়। এটি এমনিই এক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য কাস্টম ও ভৌগোলিক সীমারেখা তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে এক ও অভিন্ন বাজারে পরিণত করা। (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ৬২)

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো (১৯২৬-২০১৬) বলেন :

> বিশ্বায়ন হলো এক বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা যেটি ধারণ করে আছে এই সত্যটিকে যে আমরা সকলে একই জাহাজের যাত্রী, অর্থাৎ, একই গ্রহ যেখানে আমরা সকলে বাস করি। কিন্তু এই জাহাজের যাত্রীরা ভ্রমণ করছেন অত্যন্ত অসামঞ্জস্য অবস্থায়। সামান্য সংখ্যালঘুরা ভ্রমণ করছেন ইন্টারনেট, সেলুলার ফোন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সংবলিত বিলাসবহুল ক্যাবিনগুলিতে। তারা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ পুষ্টিসমৃদ্ধ, অঢেল এবং ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য উপভোগ করে থাকেন। তাদের রয়েছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা এবং সাংস্কৃতিক অভিগম্যতা। ভারাবনত ও ব্যথিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভ্রমণ করছেন এমন সব অবস্থায় যেগুলি আমাদের ঔপনিবেশিক অতীতে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় ভয়ঙ্কর দাস ব্যবসার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ এই জাহাজের যাত্রীদের ৮৫ শতাংশ এরই নোংরা খোলের ভিতর ঠাসাঠাসি করে রয়েছে ক্ষুধা, রোগ-শোক এবং অসহায়ত্বের দুর্গতির মধ্যে। পরিষ্কারভাবে, ভাসমান থাকার পক্ষে এই জাহাজ খুব বেশি পরিমাণ অবিচারে পূর্ণ এবং এটি এমন অযৌক্তিক ও নির্বোধ পথে নিজেকে চালিত করছে যে কোন নিরাপদ বন্দরেই এর পক্ষে ভিড়া সম্ভব নয়। (হাসানুজ্জামান চৌধুরী, ২০১৩ : ১৬৭)

বিশ্বায়নকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। কেননা বিশ্বায়ন নানা অর্থে নানা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। মূলত, বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষকে একই ছাতার নিচে সমবেত করার একটি প্রক্রিয়া। এর ফলে বিভিন্ন দেশের পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ সংঘঠিত হয়। বিশ্বায়ন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আদান-প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। একটি সুসংহত বিশ্ব অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশ্বায়ন বদ্ধ পরিকর। বিশ্বায়নের ফলে তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে সমগ্র বিশ্বের মানুষ একে অপরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করে। বিশ্বায়ন মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে।

বিশ্বায়ন : উদ্ভব ও বিকাশ

যদিও 'বিশ্ব' এই শব্দটি বহু প্রাচীন তবু এর থেকে উদ্ভূত 'বিশ্বায়ন' বা 'বিশ্বীকরণ' ইত্যাদি ধারণাগুলির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬০ সাল নাগাদ (রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী, ২০১৫ : ১২৩)। গত শতাব্দীর ৬০'র দশকের শেষের দিকে 'ক্লাব অব রোম' অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে পাশ্চাত্য মডেলের সীমাহীন প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কথা ঘোষণা করে সেখান থেকেই মূলত বিশ্বায়ন কথাটির উদ্ভব (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২২৯)। বিশ্বায়নের প্রবর্তক পুঁজিবাদী বিশ্ব। গত শতাব্দীর ৯০'র দশকে এই রীতি সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'Global' থেকে 'Globalization' এর উৎপত্তি। 'বিবিসি' এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা' বিশ্বায়নের ধারণা বিস্তার করে। বিশ্বায়ন এভাবে নামহীন, পরিচয়হীন হয়ে যাত্রা শুরু করলেও ১৯৭০'র দশকে তা পূর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার লীলাভূমিতে পরিণত হয়। রিচার্ড কিলমিস্টিরের মতে, 'বিশ্বায়ন' শব্দটি সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয় ১৯৬২ সালে ওয়েবস্টার ডিকশনারির সংস্করণে। তবে 'বিশ্বায়ন' প্রত্যয়টি ১৯৬২ সালে ওয়েবস্টার অভিধানে সংযোজিত হলেও তা মূলত অর্থনীতির আবরণে বিকাশ লাভ করতে থাকে ১৯৮৫ সালের দিকে। অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে বিশ্বায়নকে প্রথম ব্যবহার করেন থিওডোর লেভিট তাঁর '*The Globalisation of Markets*' বইটিতে ১৯৮৫ সালে। এ বইটিতে বিশ্বায়ন বলতে একটি সীমানাবিহীন ও অভিন্ন বৈশ্বিক অর্থনীতির কথা বোঝানো হয়। পরবর্তীতে OECD এর '*The Myths of Globalisation*' প্রকাশিত হওয়ার পর এটি একটি হটকেকে পরিণত হয় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স হিসেবে পরিগণিত (মোঃ আকবর হোসেন, ২০০৯ : ৩-৪)। এককথায় বলা যেতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত পরিস্থিতি বিশ্বায়নের অনুকূলে যাওয়ায় এর আবির্ভাব ঘটেছে। পুঁজিবাদ ও উদারনীতিবাদের পরিবর্তিত রূপ দেখল যে সর্বত্র সংস্কার জয়ী হচ্ছে এবং পরিবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছে। সুতরাং তাকেও অতীতের খোলস ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। বিশ্বায়নকে উদারনীতিবাদ, পুঁজিবাদ ও বিকাশের মিলনক্ষেত্র বলা যেতে পারে (প্রাণগোবিন্দ দাশ, ২০১৩ : ২১৭)।

বর্তমান বিশ্বায়ন বিকশিত হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কারবাদী নেতা মিখাইল গর্বাচেভের 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রইকা' নীতি থেকে। সেখানে গর্বাচেভ চেয়েছিলেন বিশ্ব ব্যবস্থার পুনঃসংস্করণ, উদারনীতি, নতুনভাবে বিশ্বচিন্তা, সবার জন্য শান্তি, বৃহৎ শক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তি। গর্বাচেভের এ নীতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকিয়ে রাখা। যদিও সফল হয়নি বরং হিতে বিপরীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সিনিয়র জর্জ ডব্লিউ বুশ (১৯২৪-২০১৮) 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির বহু প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করেন (শাহ মোঃ আব্দুল হাই, ২০১৮ : ১৪৮)। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের দ্রুতগতিতে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য GATT বিলুপ্তির মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে WTO-এর চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৪ সালের WTO-এর চুক্তি বাস্তবায়নের পরে ১৯৯৫ সালে WTO (World Trade Organization) নামে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' বা 'প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ববাজার গড়ে তোলার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৫-২০০৪ সাল এ ১০ বছর সময়কে 'বিশ্বায়নের দশক' বলা হয়। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই মূলত বিশ্বায়নের সূচনা করে এবং বিকশিত করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে WB, IMF এবং WTO প্রভৃতি সংস্থাগুলো বিশ্বায়নের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে উন্নত দেশের স্বার্থরক্ষার্থে কাজ করে চলেছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২২৯)। বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বিকাশ বিশ্বব্যবস্থায় সূচনা করেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

বিশ্বায়নের চরম ও পরম অবস্থান আজ বিশ্বের সকল দেশের জন্য এক কঠিন সত্য। বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান পর্যায়ের সাথে যুক্ত হয় ৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। উক্ত দশকে বাংলাদেশ ক্রমশ পরিণত হয়েছে বিশ্বায়নের বর্তমান অভিভাবকদের অবাধ 'পলিসি এক্সপেরিমেন্ট' এর লীলাভূমিতে। এরশাদের সামরিক শাসনকালে (১৯৮২-১৯৯০) বাংলাদেশ পুরোপুরি মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে যার মূল বিষয় ছিল– প্রথমত, বিরাষ্ট্রীয়করণ, অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ক্রমাগত সংকুচিত করা এবং বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করা; দ্বিতীয়ত, উদারীকরণ, যার মাধ্যমে বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া; তৃতীয়ত, সরকারি আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান– যার মূল দিকগুলো ছিল ভর্তুকি প্রত্যাহার, উন্নয়ন ব্যয় কমানো এবং সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচন করা। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের গড় আমদানি শুল্ক ছিল ৫৭.৩ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে সেই আমদানি শুল্ক হার কমিয়ে ৩৬ শতাংশ করা হয়। এভাবে বাংলাদেশের বাজার বিশ্বের জন্য রাতারাতি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে দেশীয় শিল্পগুলো তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, ফলে বিপুল সংখ্যক শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং বন্ধ হয়ে যায় (বাংলাদেশ স্টাডিজ : ২১৯)। বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে

জড়িত। বিশ্বায়ন বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ সবকিছুতেই বিশ্বায়নের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায় দেশীয় সংস্কৃতিতে দেখে দিয়েছে মারাত্মক আগ্রাসন। এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়া বাংলাদেশের পক্ষে খুব কঠিন।

সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানে বহুলভাবে ব্যবহৃত একটি ধারণা। সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ একটি উপাদান। সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতি হলো মানুষের একক বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে মানুষ জীবজগতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় সমাসীন হয়েছে। ইংরেজি 'Culture' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো নিরন্তর সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানব গুণ। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ইত্যাদির মার্জিত রূপকেই সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, সংস্কৃতি হলো অশিক্ষা, অশিষ্টতা ও রুক্ষতা ইত্যাদির বিপরীত বিষয়। সাধারণত, সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের সুশিক্ষা, সুনীতি, সুআচার, সুরুচি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য, যে-সব ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। বস্তুত, মানুষ যখন স্থূল ও অপক্ব ধ্যান-ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে মার্জিত হতে পারে তখনই কেবল সে সংস্কৃতিবান হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় (রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, ২০০৫ : ১৬৩-১৬৪)। প্রখ্যাত বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী টেইলর তাঁর *'Primitive Culture'* গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে :

> Culture is that complex-whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. (উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ২০০২ : ৪৫-৪৬)।

নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি বলেন : "Culture is the handiwork of man and the medium through which he achieves his end" (উদ্ধৃত : মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ. কে. এম শওকত আলী খান, ২০১৭ : ১৫১-১৫২)। জোন্স তাঁর *'Basic Principles of Sociology'* গ্রন্থে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : "Culture is the sum of man's creations" (উদ্ধৃত : মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ. কে. এম শওকত আলী খান, ২০১৭ : ১৫১-১৫২)।

এককথায়, সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনযাপন প্রণালী। এটি বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় বরং সমাজ ও সভ্যতার মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। বাঙালি সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বাঙালি সমাজের নানা উপাদান যেমন– খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ও ভাষাব্যবহার, পোশাক, ধর্মীয় আচার মান্য করার রীতি, পারস্পরিক ব্যবহারের রীতি, নীতি ও মূল্যবোধ, আনন্দ-বেদনা-উদ্‌যাপন-এর প্রকাশ, উৎসব ও আচারাদি, খেলাধুলা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পরম্পরায় অর্জিত কীর্তি প্রভৃতি। যেহেতু সব সংস্কৃতিই উৎস, বিকাশ, মূল্যবোধ এবং সংগঠনের দিক দিয়ে বিশিষ্ট, তাই বাহ্যিক রূপরেখা, তার বিবিধ প্রকাশ এবং নির্যাসে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ট পৃথক। হাজার হাজার বছর ধরে নানা নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শাখা-গোষ্ঠী, নানা শ্রেণির মিলন, পারস্পরিক প্রভাব এবং সমন্বয়ের ফলে

গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় সংস্কৃতি। বহু শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির বিভিন্ন, এমনকি পরস্পরবিরোধী উপাদানের সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের ফলে বঙ্গীয় অঞ্চলে বাঙালিত্বের এমন এক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে যাকে বলা যায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি এবং এক কথায় বলা যায় বঙ্গদেশ ও বাংলাভাষীদের সংস্কৃতি (সিরাজুল ইসলাম, ২০০৩ : ১৯১)।

বাঙালি সংস্কৃতি মূলত সমন্বয়বাদী। এটি কোনো অখণ্ড অথবা অভিন্ন সংস্কৃতি নয়। এ সমাজ যেমন বহু ভাগে বিভক্ত, এ সংস্কৃতি তেমনি বহু রঙে রাঙানো। বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলমান, উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, আশরাফ, আতরাফ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান– সবার সংস্কৃতি। শহরের, গ্রামের, ধনীর, গরিবের– তাবৎ মানুষের সংস্কৃতি। এবং সে কারণে এ সংস্কৃতির অবয়ব আদৌ শাদামাটা অথবা একমাত্রিক নয় (গোলাম মুরশিদ, ২০০৬ : ১৪-১৫)। প্রকৃতই বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত বর্ণিল, বিচিত্র এবং একইসঙ্গে স্বকীয়তাসম্পন্ন। এই স্বকীয়তা বা নিজস্বতা প্রতিটি সংস্কৃতির শক্তি।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে সাধারণত অপসংস্কৃতির ভয়ানক অনুপ্রবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইংরেজি 'Aggression' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো আগ্রাসন। একটি দেশের একক সংস্কৃতি যখন অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এবং অন্য সংস্কৃতির স্থান যখন সেই সংস্কৃতি নিয়ে নেয় তখন তাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলে (*দৈনিক যায়যায়দিন*, ২৪.১১.২০১৯)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' নামেও পরিচিত। নয়া উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের বিভিন্ন দিকের অন্যতম হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যখন একের পর এক সাবেক উপনিবেশসমূহ স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে, তখন নয়া উপনিবেশবাদীরা তাদের প্রভাব ও বাজার বজায় রাখার অন্যতম কৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন-এর নীতি গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনবাদীরা মনে করে যে, কোনো জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করলে সে জাতির প্রতিরোধক্ষমতাও নষ্ট হতে বাধ্য (হারুনুর রশীদ, ২০১৩ : ৫৫)। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় সংস্কৃতির মূলোৎপাটনই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য। জ্যান নেডারভিন মনে করেন :

> বিশ্বায়ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সংকর সংস্কৃতি (Hybrid Culture) সৃষ্টি করবে। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'তৃতীয় সংস্কৃতি'। এ নয়া সংস্কৃতি এখন স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২৪০)

বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের যে সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদান আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে সেগুলো হলো :

ভাষা

ভাষা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং কথা বলা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক চর্চা। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বিশ্বায়ন পর্বে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা আজ প্রবল হুমকির সম্মুখীন। আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বমানব হওয়ার দুর্মর বাসনায় বরাবরের মতোই বাংলার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ফলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী

সময়ে এ ভাষার প্রচার ও প্রসারে যে অমিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা আজ তিরোহিত তো হয়েছেই, বরং এ ভাষার বিগত সময়ে যতটুকু প্রসার হয়েছিলো তাও যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে (মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন, ২০১২ : ১৩০-১৩১)। আপন ভাষাকে ভুলতে পারলে বাঙালি যেন মুক্তি পায়। ইংরেজি তার জীবিকার নিশ্চয়তা। সেজন্য সে আপন ট্যাক উজাড় করে ভিন্ন দেশ থেকে লাখ টাকা মূল্যের ইংরেজির পণ্ডিত আমদানি করে জেলায় জেলায় আপন সন্তানদের ইংরেজি শেখানোর কাজে নিয়োগ করছে, ব্রিটিশের জমানাতেও যার প্রয়োজন পড়ে নাই। বাঙালি বছরে দু'বার বাংলা চর্চা করে বটে– একবার, ফেব্রুয়ারি মাসে, আরেকবার বাংলা সনের প্রথম দিনে। বাঙালি বছরে দুইবার বাঙালি হয়, বাঙালি হওয়ার উৎসব বসায়, বছরের আর সময় সে অবাঙালি হয়ে যায় (শামসুজ্জামান খান, ২০০৮ : ৯৩-৯৪)। আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে মানুষ নিজেকে স্মার্ট করার জন্য ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফরাসি ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে জগাখিচুড়ি ভাষার উদ্ভব ঘটাচ্ছে। ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিশ্বের ৩৫০ কোটি লোকের ভাষা হবে ইংরেজি, ২০০ কোটি লোকের ভাষা হবে মান্দারিন এবং ১০০ কোটি লোকের ভাষা হবে হিন্দি (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। এখন আর বাঙালিদের চিরপরিচিত বাবা-মা শব্দটি খুব একটা শোনা যায় না। বাবা-মা সম্বোধনের স্থলে এখন ছেলেমেয়েরা পাপা-মম বলে সম্বোধন করে। আর পিতামাতারা সেই সম্বোধন শুনে অনেক বেশি আত্মতৃপ্তি লাভ করে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৪৯)। বিশ্বায়নের ফলে বর্তমানে অনেকে বাংলা ভাষার পরিবর্তে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিদেশি ভাষা ব্যবহার করছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রতিটি জাতির নির্ধারিত লেবাস-পোশাক তার সভ্যতা-সংস্কৃতির দর্পণ। পোশাক দ্বারাই জাতির ইতিহাস উন্মোচিত হয় এবং তার আচার-আচরণ সম্পর্কে জানা যায়। এটিই কৃষ্টির প্রাণ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ। কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের যে স্থান অর্জিত হয়ে থাকে সে স্থান পোশাকেরও অর্জিত হয়। এ কারণেই ভাষার মধ্যে যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় কম-বেশী পোশাকের মধ্যেও তা পাওয়া যায়। পোশাকই মূলত কোন জাতির সবচেয়ে বড় পরিচয় (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ২১০-২১১)। পোশাক নির্ভর করে প্রধানত দেশের আবহাওয়া এবং সংস্কৃতির ওপর। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গেও এর যোগ থাকে। ভিন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের ফলেও পোশাকে পরিবর্তন আসে। সর্বোপরি, এর যোগাযোগ থাকে প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে (গোলাম মুরশিদ, ২০০৬ : ৪৬১)। বিশ্বায়ন পোশাক পরিচ্ছদে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গামছা, লুঙ্গি, কোর্তা-ফতুয়া, পায়জামা-পাঞ্জাবি, শাড়ি-ব্লাউজ বাংলাদেশি নরনারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে এখন আর কেউ ঐসব পোশাক পরতে চায় না। পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে এখন বাংলাদেশি নারীরা সেলোয়ার কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ছেড়ে জিন্স, টি-শার্ট, স্কার্ট ও শর্ট ফতুয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। পুরুষের লুঙ্গি, পাজামা-পাঞ্জাবি, জিন্স, গ্যাবাডিন, কোর্ট, টাই দখল করেছে। ফলে শালীন ও রুচিবোধসম্পন্ন বাংলাদেশি নারী-পুরুষরা ক্রমেই অশালীন ও রুচিবোধহীন হয়ে পড়ছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩ ও ৩৪৯)। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের অনুকরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্যাভ্যাস

অনুপ্রবেশকৃত সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে বিচিত্র খাদ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত হচ্ছে। এর কোনো কোনোটি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হলেও অধিকাংশ খাবার এদেশীয় আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষদের অনুপযোগী ও স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর। আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে এই খাবারগুলো নতুন প্রজন্মের ফ্যাশন রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উৎকর্ষের অন্যতম মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। হালে এসব খাবার ফাস্ট ফুড নামেই পরিচিত। হট ডগ, হ্যামবার্গার ও পিৎজা লোকদের প্রিয় খাবারে পরিণত হয়েছে। মার্কিন কালচারের প্রতিনিধিত্বকারী ম্যাকডোনাল্ড, বার্গার কিং ও পিজাহাট নামক রেস্টুরেন্ট প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি শহরে খুলে গেছে। এ সমস্ত রেস্টুরেন্টে লোকদের উপচে পড়া ভীড় থাকে (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ২১২)। ফাস্ট ফুড পাশ্চাত্যদের প্রধান খাবার কারণ তাদের পরিবারে খাবার তৈরির রেওয়াজ নিতান্তই কম। কিন্তু আমরা ফাস্ট ফুড খাই কেন? কোকাকোলা থেকে শুরু করে সিগারেট সামগ্রী নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক সেবার অন্তর্গত বিষয়। বিশ্বায়ন নিঃসন্দেহে ভোগবাদকে বাড়িয়েছে (মোঃ আকবর হোসেন, ২০০৯ : ১৪)। 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বাংলাদেশি মানুষদের অতি পরিচিত একটি বিশেষণ। তিনবেলা মাছ-ভাত খেতেই তারা অভ্যস্ত। অতিথি আপ্যায়নেও তারা মাছ-ভাতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সাথে থাকে বিভিন্ন রকম পিঠা-পুলি, ফিরনি-পায়েস ও গুড়-মুড়ি। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশিদের খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমেই তারা ফাস্ট ফুডের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অতিথি আপ্যায়নে এখন তারা নুডুলস, চিপস পরিবেশন করছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৪৯)। এর ফলে বাঙালিদের ঐতিহ্যবাহী খাবার-এর গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে।

পরিবার ব্যবস্থা

পরিবার হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে বসবাস করে। পরিবারের দুটি প্রধান রূপ হলো যৌথ পরিবার এবং একক পরিবার। চীন এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবারগুলি নানা কারণে ভেঙে যাচ্ছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব, আর্থিক সমস্যা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে একক পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে। একক পরিবারে একটি দম্পতির সন্তানসন্ততি ছাড়া সাধারণত আর কেউ সেখানে বসবাস করে না। যৌথ পরিবারে অবশ্য দু-তিন পুরুষের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন বর্তমান থাকে। আধুনিক একক পরিবার এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল বলে মর্গান তাঁর '*Ancient Society*'- তে উল্লেখ করেছেন (আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০১৬ : ১১৬)। বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে চিরপরিচিত যৌথ পরিবার প্রথার পরিবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মানুষ তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একক পরিবার গঠনে অধিকতর উৎসাহী। তাই বর্তমানে আমাদের সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবার বিকশিত হচ্ছে। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ ফিকে হতে শুরু করেছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৪৯)। বিশ্বায়ন যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবার গঠনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়ে যায়।

সংগীত

দেশীয় সংস্কৃতিতে অন্য একটি বিপর্যয় নেমে এসেছে আমাদের সংগীতের ক্ষেত্রে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী সুর সম্ভার হারিয়ে যাচ্ছে বিজাতীয় সংগীতের প্রভাবে। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের মানুষ কেবলই মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনা ও শাকিরাদের পশ্চিমা পপ সংগীতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ব্যান্ড সংগীতের নামে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা যে হৈহুল্লোর-চেঁচামেচির মহড়া দেয় তা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে না মোটেও (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২৩৮ ও ৩৪৯)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের প্রতি মানুষের আর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, গাজীর গান ও গম্ভীরা প্রভৃতির স্থান দখল করেছে পশ্চিমা পপ সংগীত। একতারা, দোতারা, সারিন্দা, ঢোল-তবলা ও বাঁশি এখন আর আগের মতো সুর তোলে না। সেগুলোর স্থান দখল করেছে গিটার, কি-বোর্ড, বেহালা, পিয়ানো, পাইপ অর্গান ও সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

চলচ্চিত্র

দৃশ্য ও শব্দ এই দুই ইমেজের সমন্বয়েই তৈরি হয় চলচ্চিত্রের ভাষা ও নন্দনভাবনা। বিশ্বায়নের ফলে সিনেমাটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে দর্শকদের কাছে। চলচ্চিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ। যে সংস্কৃতিতে তা নির্মিত হয় তাকেই প্রতিনিধিত্ব করে চলচ্চিত্রটি। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে তার একটি বড়ো অংশ হলিউডের অনুকরণ। এসব ছবিতে আমেরিকার জীবনধারা তুলে ধরা হয় এবং তাকে আদর্শ হিসেবে দেখার তাগিদ থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতিকে দেখানো হয় সমাজের স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে। এমনকি অন্যান্য দেশের লোকগাথাকে বিকৃত করতে হলিউড দ্বিধা করে না। যেমন ডিজনি মুভি মুলান-১৯৯৮ (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯.০৫.২০১৮)। বিশ্বায়নের ফলে বাংলা চলচ্চিত্রগুলো এদের স্বকীয়তা হারিয়েছে। এখন বাংলা চলচ্চিত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পশ্চিমা যৌনতানির্ভর কাহিনী সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। চলচ্চিত্রে এখন স্বল্পবসনা নারীদের পদচারণা খুব বেশি। শিল্পের ছোঁয়া নেই এসব অভিনয়ে। ফলে এখন ইচ্ছা থাকলেও কেউ সপরিবারে সিনেমা হলে যেতে পারে না (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২৩৮ ও ৩৪৯)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বাংলা চলচ্চিত্র তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

উৎসব

মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো উৎসব। উৎসব মানুষকে আনন্দ দেয় এবং মানবাত্মাকে প্রসারিত করে। বাঙালি উৎসবপ্রিয় জাতি। বাংলায় প্রচলিত লোকায়ত উৎসবের মধ্যে রয়েছে– পহেলা বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তি, বর্ষা উৎসব, শরৎ উৎসব, নবান্ন উৎসব, বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, পৌষ-পার্বণ, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি। বিশ্বায়নের ফলে এসব সার্বজনীন উৎসব সমূহের বিলুপ্তির প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন বাংলাদেশিরা থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইত্যাদি বিজাতীয় সংস্কৃতি পালনে অনেক বেশি তৎপর (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৫০)। বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং আকাশ সংস্কৃতির অবিরাম

বিকিরণ পৃথিবীর শত শত ঐতিহ্যবাহী দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে (শামসুজ্জামান খান, ২০০৮ : ১৩২)। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পালন করতে গিয়ে বর্তমানে দেশীয় সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পালন অনেকটা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে।

খেলাধুলা

মানবসত্তার স্বাভাবিক গতি ও ধারা বহমান রাখতে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষের প্রাণ জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিশ্বায়ন খেলাধুলার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, দাবা, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেবিল টেনিস, লন টেনিস এখন বিশ্বের সর্বত্র চলছে। জার্মানির গুটেনবার্গে টাইপরাইটার আবিষ্কার যেমন রেনেসাঁ ঘটিয়েছে তেমনি বিশ্বায়ন খেলাধুলার বিশ্বে রেনেসাঁ ঘটিয়েছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩)। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম বর্তমানে কাবাডি, গোল্লাছুট, কুতকুত, কানামাছি প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খেলার পরিবর্তে কম্পিউটার ও মোবাইলে বিভিন্ন পাজ্‌ল ও ভিডিও গেম নিয়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট আকার ধারণ করছে। এই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী ভোগবাদী সমাজের প্রলোভনের বিভিন্ন উপকরণ। বর্তমান প্রজন্মের এক বিশাল অংশ সার্বিকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সহজ মেলামেশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে নারী-পুরুষের মধ্যে। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ক্রমাগত বাড়ছে। সিনেমার চটুল কাহিনিতে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল নৃত্য-গীত, নায়ক-নায়িকার উদ্দাম প্রণয়চিত্র, খুন-জখম, রাহাজানি-ছিনতাই ও ডাকাতি ইত্যাদি যুবসমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ তাদের নিজ নিজ সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধকে হারিয়ে ক্রমেই পশ্চিমা ধ্যানধারণানির্ভর সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজে যৌনতা ও হিংস্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজি নতুন বর্ষ পালনে কিংবা ১৪ ফেব্রুয়ারি পালনে হিড়িক লেগেছে। প্রেম-ভালোবাসা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার থেকে দেহসর্বস্বে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের দিন দিন অবনতি ঘটছে। গুরুজন ভক্তি নতুন প্রজন্মের কাছে বিকৃত রূপধারণ করেছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩)। বিশ্বায়ন চায় নৈতিকতার পতন ও অবক্ষয়ের এই যুগে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নীতি-নৈতিকতাহীন জাতির অপবিত্র নীতি-নৈতিকতা গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে এবং জাতি যেন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একটি সৎ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে ব্যর্থ হয়ে যায়, বরং জাতি যেন কোন সমাজ বিনির্মাণের কষ্ট করতেও প্রস্তুত না হয়। কারণ তার সমাজ হবে পশ্চিমা দেশে বিনির্মিত "ইম্পোর্টেড" সমাজ (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ২৫৪)। একটি আদর্শ সমাজ গঠনে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা দুষ্কর।

সুপারিশমালা

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করতে পারে :

১. বিশ্বায়নের ফলে বাংলার সাথে বিশেষত হিন্দি ও ইংরেজির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক ধরণের অদ্ভূত ভাষায় কথা বলে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম। এর ফলে বাংলা ভাষার বিকৃতি দিন দিন বাড়ছে। তাই সর্বস্তরে বাংলা ভাষার সঠিক রূপের প্রচলন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বিদেশিদের অন্ধ অনুকরণ করছে। ফলে বর্তমানে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ঐতিহ্যের সংকট। এই সংকট থেকে উত্তরণের নিমিত্তে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. ফাস্ট ফুডের সহজলভ্যতা ও জনপ্রিয়তার কারণে দেশীয় পিঠা-পুলি, ফিরনি-পায়েস এবং গুড়-মুড়ি নবীন প্রজন্ম এখন আর পছন্দ করে না। এজন্য দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার গ্রহণে আমাদের নবীন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৪. আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবার বিকশিত হচ্ছে। পরিবার ব্যবস্থার এ ধরণের ভাঙন রোধকল্পে যৌথ পরিবারের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে হবে।

৫. আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে পশ্চিমা পপ সংগীত অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি ও ভাওয়াইয়া প্রভৃতির স্থান দখল করেছে পশ্চিমা পপ সংগীত। সংগীতের ক্ষেত্রে এ বিপর্যয় রোধে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প অন্যান্য ভাষার চলচ্চিত্রকে অন্ধ অনুকরণ করছে। এর ফলে বাংলা চলচ্চিত্র স্বকীয়তা ধরে রাখতে পারছে না। তাই বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনি ও গল্প নির্মাণে নতুনত্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং একই সাথে স্বকীয়তা ধরে রাখতে হবে।

৭. বর্তমানে বাংলাদেশিরা থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেনটাইন্স ডে প্রভৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতি পালনে অনেক বেশি তৎপর। ফলে বাংলায় প্রচলিত লোকায়িত উৎসবের প্রতি তাদের আগ্রহ দিন দিন কমছে। সুতরাং, আমাদের চিরাচরিত লোক উৎসবের প্রতি সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. বিশ্বায়নের বদৌলতে আমাদের নতুন প্রজন্ম ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার সুযোগে কম্পিউটার ও মোবাইলে বিভিন্ন পাজল ও ভিডিও গেম নিয়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে থাকে। এর ফলে অনেকেই ঘরকুনো স্বভাবের হয়ে পড়ছে। তাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খেলার প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করার পাশাপাশি উৎসাহও প্রদান করতে হবে।

৯. বর্তমান প্রজন্মের এক বিশাল অংশের মধ্যে দেখা দিয়েছে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতির চর্চা এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতি মেনে চলার ব্যাপারে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার

বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সীমানাবিহীন বিশ্ব। বিশ্বায়ন যেমন মানুষের পরিচিতিকে করেছে সংকটময়, তেমনি করেছে অনিশ্চয়তাবাদী, সংশয়বাদী এবং খণ্ডিত। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলোতে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাবই বেশি। 'বিশ্বায়ন' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটি বিষয়ে ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একারণেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপজ্জনক দিকটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি 'আধিপত্যের মতাদর্শ' (Ideology of dominance) থেকে উদ্ভূত। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আমাদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও ভাষা সবকিছু আজ প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, পরিবার ব্যবস্থা, সংগীত, চলচ্চিত্র, উৎসব ও খেলাধুলায় দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচণ্ড প্রভাব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি আজ বিপন্নতার সম্মুখীন। আমরা সকলেই জানি যে, বিশ্বায়ন এক অনিবার্য বাস্তবতা। বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সুচিন্তিত ও সুদৃঢ় পদক্ষেপই পারে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নামক এই ভয়ানক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে।

সহায়কপঞ্জি

আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য (২০১৬)। *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*। অনন্যা, ঢাকা।

ইয়াসির নাদীম (২০০৮)। *বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি*। প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০০৬)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। অবসর, ঢাকা।

প্রাণগোবিন্দ দাশ (২০১৩)। *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা ।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০২)। *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*। হাসান বুক হাউজ, ঢাকা।

মোঃ আকবর হোসেন (২০০৯)। *বিশ্বায়ন ও উত্তর আধুনিকতাবাদ*। গ্রন্থ কুটির, ঢাকা ।

মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন *সম্পা.* (২০১২)। *বিশ্বায়ন : সংকট ও সম্ভাবনা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ. কে. এম শওকত আলী খান (২০১৭)। *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*। গ্রন্থ কুটির, ঢাকা।

রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ (২০০৫)। *প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী (২০১৫)। *সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*। মিত্রম্, কলকাতা।

শামসুজ্জামান খান *সম্পা.* (২০০৮)। *বাংলাদেশ সংস্কৃতির সন্ধানে*। সূচীপত্র, ঢাকা।

শাহ মোঃ আব্দুল হাই (২০১৮)। *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি*। বিদ্যাধন প্রকাশনী, ঢাকা।

শওকত আরা হোসাইন *সম্পা.* (২০১৯)। *বিশ্বায়ন, আঞ্চলিকতাবাদ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান*। আকাশ বুক ডিপো, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম *সম্পা.* (২০০৩)। *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৯*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী (২০১৩)। *বিশ্বায়ন বিস্তার ও বিরোধ*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

হারুনুর রশীদ (২০১৩)। *রাজনীতিকোষ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বাংলাদেশ স্টাডিজ, ইউনিট-১৩। "বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সমাজ"। বিবিএস প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৯.০৫.২০১৮

দৈনিক যায়যায়দিন, ২৪.১১.২০১৯

রবীন্দ্রগানের গায়কি ও প্রয়োগ ভাবনা

দেবশ্রী দোলন*

[সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য অঙ্গনের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। যার অবদান বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় সুস্পষ্ট। সংস্কৃতির সকল ধারায় অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ সংগীতের প্রতি একটু বেশিই স্পর্শকাতর। তাই তিনি তাঁর গানের গায়কির দিকে একটু বেশিই সচেতন ছিলেন। গানের গায়কির বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে যদিও তিনি স্বরলিপি প্রথা অনুসরণ করেন, তা সত্ত্বেও শিল্পীভেদে গায়কির তারতম্য যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়েও তিনি দ্বিমত করেননি। তবে তাঁর গানের প্রতি যেন অবিচার করা না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখতে বলেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কি প্রসঙ্গ ছাড়াও আরেকটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস থাকবে, তা হচ্ছে রচয়িতাভেদে গানের সুরান্তর। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও ধারা অনুযায়ী কী ধরনের যন্ত্রানুষঙ্গ হতে পারে সে বিষয়েও খানিক আলোচনার প্রয়াস থাকবে। মোটকথা, রবীন্দ্রগানের উপস্থাপনে যে সকল বিষয়ে মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন তার মধ্যে গায়কি অন্যতম। তাঁর গানের কথা স্পষ্ট এবং সুর অনড় রেখে যে উপস্থাপন-মন্ত্র তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে এ প্রবন্ধে।]

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি
কেবল শুনি
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৭)

বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতের এক বিশাল যজ্ঞক্ষেত্রের অন্যতম পুরোধা। বাঙালির মন ও মননের এক সুবিশাল অংশের প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির জীবনে এক অবিনশ্বর স্থান দখল করে আছে এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে তার সুর ও গায়কির প্রশ্নও। তাঁর নিজের রচিত উপরে উল্লেখকৃত গানের লাইনে তার কিছুটা হলেও প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান সেকালে রবিবাবুর গান হিসেবে অধিক পরিচিত ছিল। বংশপরম্পরা বা পারিবারিকভাবে সংগীতের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকলেও তাঁর নিজের রচনাতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায় বইকি! রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন ঠিকই, তবে তাঁর গানে শিল্পীর প্রভূত স্বেচ্ছাচারিতা করার সুযোগ তিনি রাখেননি। কিন্তু তিনি যে শক্ত হাতে এর প্রতিরোধ-প্রতিবিধান করেছেন এমনও নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গায়কের কণ্ঠের উপর রচয়িতার জোর খাটে না সুতরাং ধৈর্য্য ধরে থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই..." (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ২০০)।

এ কথার প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কি ও সুরের নথিবদ্ধ ব্যবহার। তাঁর এমন অনেক গান রয়েছে যে গানের রচনাকালীন প্রেক্ষাপট বা তার নেপথ্যের তথ্য গানের আস্বাদই পালটে দিয়েছে। জানা যায়, শিল্প আস্বাদনকালে সৃষ্টিকালীন ইতিহাস

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

দিয়ে অধিকার করে রাখাটা রবীন্দ্রনাথ সাবলীলভাবে গ্রহণ করেননি। তবে এও ঠিক যে, আমরা যদি গানের ইতিহাসকে সম্পৃক্ত না করি তবে বদলে যেতে পারে তাঁর গানের গায়কি ।

সংগীত শিল্পেরই একটি প্রতীকবহ অংশ আর গান এই সংগীতেরই বিশেষভাবে নির্মিত মাধ্যম। শিল্প ও সংগীত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো গায়ক নির্ভরতা। তাই ধরা হয় গায়কভেদে গানের পরিবেশনা কিছুটা বদলে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর বজায় রাখতে ভীষণভাবে অনড় ছিলেন। আর সংগীতকার হিসেবে গায়ক-নির্ভরতার বিষয়টিও তাঁকে বেশ ভাবনায় আবদ্ধ করেছিল। আর এ সকল দিক বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সংগীতকারদের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্যও চোখে পড়ে। যেমন– তিনি যে তাঁর গানকে অবিকল্প রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তা বজায় রাখতে বিস্তর অনুনয়-অনুরোধ-আক্ষেপ করতে হয়েছে তাঁকে– "তোমাদের কাছে আমার মিনতি; তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান রূপে চিনতে পারি।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ৫৭১)।

রবীন্দ্রনাথ গানের সুর আহরণ বা আস্বাদনে কখনো কার্পণ্য বা হীনম্মন্যতা প্রকাশ করেননি। তিনি যেখানে যেমন মাধুর্যপূর্ণ সুর শুনেছেন সেখানেই আস্বাদনের চেষ্টা করেছেন। সেসকল সুর শুধু আস্বাদনেই ক্ষান্ত হননি, ব্যবহার করেছেন নিজের রচনায়। কখনো সুরে কথা বসিয়েছেন, কখনোবা কথা আগে এসেছে সুরটি পরে, গানের কথাকে যদিওবা আমরা আমাদের ভাষিক সীমানার মধ্যে পাই বা অনুধাবন করি, তবুও সুরের এমনি এক সংগীতিক ধ্বনিজগৎ আছে যা নিরর্থ করে দিতে চায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত শব্দসমূহকে। শব্দকে তার সীমানা অতিক্রম করে অজানা অচেনা পথে অনুভূতিদেশে পৌঁছে দেয়। গানের বাহ্যিক আকার সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গানের বিচার বিশ্লেষণগত দিক তো বটেই তা আস্বাদনের সময়ও বিশেষ ধরনের পাঠ আমরা গ্রহণ করি। এই "বিশেষ ধরনের" পাঠটি আমরা যারা গানকে দেখতে পাই তাদের কাছে একরকম, আর যারা দেখতে পাই না তাঁদের কাছে ভিন্ন রকম। যেমন– কবিতার সাথে যদি তুলনা করা যায় তাহলে বলা যায় শতবর্ষ পরেও যদি একটি কবিতাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা হয় তবুও তার শরীর পালটায় না, কিন্তু কবিতা বা কবিতা নয় এমন কিছু যদি সুর দেওয়া হয় তখন তা গান হয়ে ওঠে এবং যে কেউ সেই গান গাইতে পারে। সেক্ষেত্রে গানের বাণী নির্দিষ্ট হলেও শিল্পীভেদে এর সুরের তারতম্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ গানের শরীর পালটাচ্ছে, স্বভাব পালটাচ্ছে কেবল বজায় থাকছে গানের কথাটুকু– যা কি না গান নয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের যে রূপ সেটা তাঁর নিজের স্বভাবগ্রস্ত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কেননা গায়ক যতই আন্তরিক হোক না কেন যদি সত্যকে মেনে নেই তবে গায়কভেদে গানের স্বভাবে পরিবর্তন আসবেই। যেহেতু গায়কভেদে গায়কি ভিন্ন হবে তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর বজায় রাখার যে মিনতি করেছেন তার কোনো চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যমতে, তিনি চেয়েছিলেন যাতে গানের মূলভাব ঠিক থাকে বা গান তার স্বভাবভ্রষ্ট না হয়, কারণ গায়ক তাঁর চিন্তার পরিধি ও সামর্থ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের যে অন্তর্নিহিত মাধুর্যে পৌঁছাতে না পারলে গান বিকৃত হবে এমনটাই আশঙ্কা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই শেষজীবনে এসে তিনি তাঁর রচিত গানের পরিবেশনা নিয়ে বেশ মনঃক্ষুণ্নই

হয়েছেন বলা যায়। শেষ বেলায় তিনি নিজেই নিজের গান চিনে উঠতে পারেননি। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল– গানের কথাটা শুধু তাঁর নিজের, সুরটা নয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজের গানের ব্যাপারে খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী না থাকলেও সংগীত নিয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা থেকে খুব একটা সরে আসতে চাননি। তবে রসিকভেদে গানের গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন হবে এটাই বাস্তব। কোনো প্রচলিত রীতি যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তখন তাঁর কথা ও সুরে রবীন্দ্রনাথ কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যও অনুসরণ করেছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিশেষত্বটা রবীন্দ্রনাথের সকল রচনার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে। তবে বাংলা রাগসংগীত, কীর্তন, রামপ্রসাদি, লোকসংগীত বা নিধুবাবুর টপ্পায় যে ভাব এটা সেভাব নয়, আর এটাই হলো রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব শ্রেণির বাঙালিয়ানার সাংগীতিক প্রকাশ। এমন একটি অতিপরিচিত গান তিনজন তিনভাবে স্বরলিপি আকারে প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয়টি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তৃতীয়টি সরলা দেবী। তিনটি স্বরলিপিই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো–

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

।।- া সা রা । রগা গা গা । গা গা গা। গমা- া গমগা।
০ আ মি । চি০ নি গো। চি নি তো। মা০ ০ ০০০

। রা- া রগা। রা-গা রা। র-পা ক্ষা। পধপা-া -া।।
রে ০ ও০ । গো০ বি। দে ০ শি নী। ০০০ ০ ০

২. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

।।- া সা রা । গা গা গা। গা গা গা। গমা গপা মগা।
আ মি চি। নি গো চি। নি তোমা। ০ ০০ ০০

। গরা- া রা। রা-গা গরা। রা-পা পক্ষা।। ধাপা-া -া।
রে০ ০ও। গো বি দে। শি নী ০০।। ০০ ০ ০

৩. সরলা দেবী

।।- া সা রা । গা গা গা। সগা গা গা। মা- া মগা।
০ আ মি। চি নি গো। চি নি তো। মা ০ ০ ০

। রা- া রা। রগা রা। গা রা ধা। -া পা ক্ষা।
রে ০ ও। গো০ বি। দে ০ শি। নী ০০

। ধপক্ষা- া পা।।
০০০ ০ ০ ০

এই তিনটি স্বরলিপিই রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রচিত কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনোটার সঙ্গে কোনোটার হুবহু মিল নেই, তবে এটাও ঠিক যে এর কোনোটাই এমন নয় যে স্বরলিপি ভিন্নতার কারণে মূল গান চেনা যায় না। তেমনি আরও একটি গান "তবু মনে রেখো"-এর চারটি স্বরলিপি দেখা যায়, তবে সেগুলিও হুবহু এক নয়। এই তো গেল স্বরলিপিগত প্রভেদ,

রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান আছে যাতে শিল্পীভেদে সুরের প্রক্ষেপণও পরিবর্তিত হয়ে যায়, কেউ হয়তো গানের কোনো এক জায়গায় মীড়ের ব্যবহার করেছেন কিন্তু অন্যজন তাঁর গায়কিতে একটু ভিন্নতা এনেছেন এখানেই গানের সুরের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই এদের কারো কারো শিক্ষাগুরু ছিলেন। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, স্বরলিপিতে যে সুরান্তর তা রবীন্দ্রনাথ নিজে করেছেন কি না! সেক্ষেত্রে আবার উত্তরও তৈরি। শিল্পীভেদে যেমন সুর পরিবর্তন হয়, স্বরলিপিকার ভেদেও তার পরিবর্তন অবান্তর নয়।

গান সম্পর্কে তাঁর যে মতামত বা ধারণা তা প্রথম জীবনেই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। যা কি না শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। বিশ বছর বয়সে একটি লেখায় তিনি লেখেন–

> ওস্তাদেরা গানের কথার উপর সুর দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। (সত্যজিৎ, ২০১৭ [https://www.boierhut.org])

কিন্তু প্রত্যেকটি গানের একটি নিজস্ব রূপ আছে, যা তাকে অন্য একটি গানের থেকে আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে, যার খোঁজ পাওয়া যায় ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বরলিপি আকারে নথিবদ্ধ থাকার মাধ্যমে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেও তাতে খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা যায়।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর অন্যান্য প্রিয় গায়ক-গায়িকাদের মুখে শুনলেও ভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে অনেক গান প্রথমে গীত হয়েছে, পরবর্তীকালে স্বরলিপিতে রচিত হয়েছে। যেমন- রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা গান "স্বপন যদি ভাঙিলে" যা রামকেলি রাগে নিবদ্ধ। এই গানটি বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত গায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী গেয়েছিলেন শুদ্ধ আকারে। বিস্তার এবং তানসমেত সে গান রেকর্ডেরও অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ওস্তাদ ভি ভি ঝলওয়ার গানটির স্বরলিপি তৈরি করেন, তখন সেখানে তান বা বিস্তারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তেমনি আরেকটি গান "বুঝি ঐ সুদূরে"। গানটি রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসবে সাহানা দেবীকে নিজে শেখান যা পরে সাহানা দেবী রবীন্দ্রভারতীর জন্য রেকর্ড করেন যা থেকে পরবর্তীকালে স্বরলিপি তৈরি করা হয়। এই সাহানা দেবীই একমাত্র ছিলেন যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তাঁর গানের মূল সুর ধরে রাখতে পারতেন বলে সাহানা দেবীকে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টির সাথে শুনতেন। এরা সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আদরণীয় ও উচ্চশ্রেণির সংগীত শিল্পী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে গানের রূপটি পুরোপুরি গায়কনির্ভর হয়েই রইলো।

কিন্তু প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, তাঁর গান অবিকৃতভাবেই গাইতে হবে। এ নিয়ে শ্রী দিলীপ কুমার রায়ের সাথেও তাঁর বিস্তর আলাপচারিতার প্রমাণ মেলে *সংগীত চিন্তা* নামক গ্রন্থে। সেখানে দিলীপ কুমার ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যকার আলোচনায় রবীন্দ্রসংগীতের গায়কির বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে। দিলীপ রায়ের সাথে তাঁর মতের মিল হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতানৈক্যই চোখে পড়ে। দিলীপ রায় গানের স্বাধীন সুরবিহারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন পরের মুখে তাঁর গান নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। তাই তিনি নিজ মেয়েকে অপাত্রে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চান নি। এদিকে দিলীপ রায় যেহেতু সাংগীতিক বিষয়টি হিন্দুস্থানি সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন তাই আলোচনার শুরুতেই তিনি

হিন্দুস্থানি গান ও বাংলা গানের গায়কির পার্থক্য নিয়ে আলাপ করেন। তবে এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আগেই দিলীপ রায়কে মতপার্থক্যের সীমারেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন, "বাংলা ও হিন্দুস্থানী গান নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ যদি বা থাকে তাহলে অন্তত তার সীমাটি স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। নইলে সত্যের ছায়াটা বড় হয়ে অমিলটা প্রকাণ্ড দেখতে হয়" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ৮৮)।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দুস্থানি সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল সৌন্দর্যবাদী তিনি হিন্দুস্থানি সংগীতের বিশেষভাবে বলতে গেলে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির প্রবন্ধের গঠনগত প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত রাগরূপায়ণের রসবস্তুকে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল ভেঙে বাংলা গান রচনা করলেও এসব ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। আর তা হচ্ছে সংগীতের সরলরৈখিক গঠন প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে হিন্দুস্থানি সংগীতের অলংকার বাহুল্য বর্জন করেছেন এবং সুরের সরলরেখাটিকে ধরে বাণীর মর্মবস্তুটিকে তীব্র করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু দিলীপ কুমার তাঁর এই প্রক্রিয়ার সাথে সহমত পোষণ করেননি। মূলত রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শিল্পীর সহজাত সুরবিহারে (Improvisation) কোনো স্বাধীনতা না দেওয়াতেই দিলীপ কুমার তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করেন। দিলীপ কুমারের যুক্তি অনুযায়ী হিন্দুস্থানি সংগীতে যেরূপ নির্দিষ্ট রাগরূপ বজায় রেখে তানকর্তব্যের সাথে পরিবেশন করা হয়, রবীন্দ্রসংগীত সঠিক রাগরূপের অনুসরণ করেও কেন সমূহ তানকর্তব্য প্রয়োগ করতে পারবে না। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিও প্রদান করেন। তিনি দিলীপ রায়কে জানান–

> এইখানে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্তানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না ? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্তানী সংগীতের সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরীক বলে মানতে সে নারাজ– বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে চিরকুমার ব্রত তাঁর নয়, সে যুগমিলনের পক্ষপাতী। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ৯৪)

যখন রবীন্দ্রসংগীতে গায়কির স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে তখন রবিঠাকুর খানিক অনড় রূপই প্রকাশ করেন। তবে এটাও ঠিক যে গায়ক গানে শত আন্তরিকতা প্রকাশ করলেও গায়কভেদে গানের স্বভাব পালটানো অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন কণ্ঠে গানের যে রূপায়ণ তা রবীন্দ্রনাথের গানের স্বভাবের কাছাকাছি হতেও পারে আবার নাও পারে। কিন্তু দিলীপ কুমার যখন রবীন্দ্রনাথের গানের মৌলিক সুরের অপরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে বলেন তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করতে পারেননি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি চেষ্টা করলেও তাঁর গানের মৌলিক সুর বজায় রাখতে পারবেন না। কিন্তু তারপরেও তাঁর রচিত গানে শিল্পীর নিজস্ব স্বাধীনতা তিনি প্রদান করার অনুমতি দেননি। রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছা বা অনড় রূপ না থাকলে হয়তো শিল্পীরা তাঁর গানের মূল কাঠামো বজায় রেখেও তাদের ইচ্ছামতো স্বরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর গানকে একটা নূতন সৌন্দর্যে গরীয়ান করে তুলতে পারতো। কিন্তু কবিগুরুর এই আদেশের দরুন তাদের নিজেদের অনুভূতির রং ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া শিল্পীদের কাছে একটা সংকোচের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সকল কঠিন আদর্শের উলটাদিকে ঝুঁকি ও বড়োসরো আকারে হতে বাধ্য। তাই ঝুঁকির ভয়ে তো আদর্শকে ছোটো করা চলে না, আর এই প্রসঙ্গের জের ধরে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমারকে

বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, স্বর প্রক্ষেপণের বৈচিত্র্যের মাধ্যমেও স্বরলিপির স্বাধীনতা খর্ব হয়। যদিওবা স্বরলিপি অনুসরণ করে ভাবাবেগের স্বাধীনতা গ্রাহ্য হতে পারে সেক্ষেত্রে স্বাধীন সুরবিহার এখানে কোনোমতেই গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপ কুমার রায়ের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল গায়কির স্বাধীনতা, আর এই প্রসঙ্গে তাঁদের দুজনার সংগীতাদর্শ নিয়েও মতপার্থক্য দেখা যায় বহুবার, রবীন্দ্রনাথের মতে কীর্তনে বাঙালির গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি তা বাঙালির অন্য সাধারণ গানেও ফুটে উঠেছে। কেননা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির ভিতরকার কথাটা শিল্পের মধ্য দিয়ে একটা বিশ্বজনীন তারে আঘাত দেয় সুতরাং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়–

আর্টে প্রগল্‌ভার চেয়ে মিতভাষ,
বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ।
(করুণাময়, ১৯৯৩ : ২৩০)

এরপরে সংগীতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যাবে। যেমন– আজকাল রবীন্দ্রনাথের অনেক গান মুক্ত ছন্দে গাওয়া হয়। আর তা অনেক স্বনামধন্য শিল্পীরাই গাইছেন। রবীন্দ্রভারতীয় এককালীন স্বরলিপি-প্রণেতা শ্রী সুভাষ চৌধুরীর একটি তালিকায় দেখা যায় প্রায় ৮৯টি গান রয়েছে যা স্বরলিপি, তাল বা নির্দিষ্ট মাত্রা নিবন্ধ হলেও মুক্তছন্দে প্রচলিত। এমনকি "এ পরবাসে" গানটিও মালতী ঘোষাল তাল ও ছন্দে নিবদ্ধ করে গেয়ে রেকর্ড করেছেন। যা পূর্বে মুক্তছন্দে অনেকেই গেয়েছেন।

এরপর আসে যন্ত্রসংগত নিয়ে আলোচনা সেখানেও কিছুটা দোদুল্যমানতার স্বীকার অর্থাৎ গানের Orchestration এ বিষয়ে সত্যজিৎ রায় বলেছেন, "আরেকটা জিনিস যেটা স্বরলিপিতে পাওয়া যাবে না সেটা হল গানের সংগতের নির্দেশ সংগত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু বলে যান নি। এখানে সুরকারের খুব একটা বড় দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি" (সত্যজিৎ, ২০১৭ [https://www.boierhut.org])।

সেসময় গানের সঙ্গে সারেঙ্গি, এসরাজ, সেতার, দোতারা ইত্যাদি ব্যবহার হতো তার যন্ত্র হিসেবে আর তবলা, পাখোয়াজ, খোলের ব্যবহার হতো তালের জন্য খুব সম্ভবত তখন এই যন্ত্রগুলি সংগীতজগতে বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু তারপরেও এ নিয়ে সেসময় বেশ তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল বলে জানা যায়।

রবীন্দ্রসংগীতের যা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সেরা ছবির মতোই সতেজ ও সাবলীল, এমনকি অনুকরণীয়ও বটে, তাঁর গান সুগীত হচ্ছে না এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ থাকলেও কোনোদিন প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। শুধু তাঁর গানের সাথে যেন সুবিচার হয় তারই অনুরোধ রেখেছেন শ্রী প্রফুল্ল মহলানবীর কাছে–

> বুলাবাবু তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ, এদের একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে গান শিখিয়ো- এটাই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপর তোমরা যদি স্টীম রোলার চালিয়ে দাও আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তাল থাকে দরদ ও নীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি করো। (শম্ভুনাথ, ১৩৮০ : ৫৭)

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সাংগীতিক ধারণার চেয়ে কিছুটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা নিয়েই বাংলা গানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাণী ও সুরের যুগপৎ রচয়িতা হিসেবে তিনি যা চেয়েছিলেন তাই সুরের সাহায্যে বাণীবাহিত ভাব পরিস্ফুটনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। আর তাঁর গানে তিনি যে ধারণাটি যথোপযুক্ত মনে করেছেন সেটিই চূড়ান্ত বলে স্থির করেছেন। কোনো গায়কের পক্ষে সেখানে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। কারণ তেমন কোনো অসম্পূর্ণ অবস্থা সেখানে রবীন্দ্রনাথ রাখেননি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন একটি সম্পূর্ণ রচনা তাঁর গানও ঠিক তাই। বাংলা গানের ধারায় সম্পূর্ণরচিত গানের এই ধারাটির শুধু গোড়াপত্তনই তিনি করেননি বরং একে দৃঢ় অবস্থানে রবীন্দ্রনাথই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তে যদি আমরা কর্ণপাত না করি, তবে শিল্পীদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ দেওয়া হয় যা শুধু রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করবার অজুহাতে। আর তা হলে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ সত্যিকার অর্থেই আশঙ্কাপূর্ণ।

সহায়কপঞ্জি

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *সংগীত পরিক্রমা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৯)। *গীতবিতান*। মলি প্রকাশনী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৭৩)। *সংগীতচিন্তা*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্র রচনাবলী* ষোড়শ খণ্ড। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

শম্ভুনাথ ঘোষ (১৩৮০)। *রবীন্দ্রসংগীতের ইতিবৃত্ত* (*প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রসংগীত* দ্বিতীয় খণ্ড)। সঙ্গীত প্রকাশন, কলকাতা।

সত্যজিৎ রায় (২০১৭)। 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা'। *বইয়ের হাট পত্রিকা* (https://www.boierhut.org *দ্রষ্টব্য*)।

গীতবিতান-এর পূজা পর্যায় : প্রসঙ্গ পথ

ইয়াতসিংহ শুভ*

[সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী *গীতবিতান*-এর গানগুলোকে প্রধানত ছয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। যেমন– পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক প্রভৃতি পর্যায়। স্বদেশ, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক পর্যায় বাদে বাকি পর্যায়গুলো একাধিক উপপর্যায়ে বিভক্ত। সর্বাধিক সংখ্যক গান রয়েছে যে পূজা পর্যায়ে, তার বিশটি উপপর্যায়ের মধ্যে একটি হলো 'পথ' উপপর্যায়। এই উপপর্যায়ের গানগুলো প্রধানত 'পথ' সংক্রান্ত হলেও পূজা পর্যায়ের অন্যান্য গানেও পথের প্রসঙ্গ নানাভাবে ঘুরেফিরে এসেছে। গানগুলোতে পথ কখনো অনন্ত অসীমের চির প্রবহমান জীবনধারার মাধ্যম, কখনো অসীমের সঙ্গে সসীমের মিলনের উপায়, কখনো চিরকালের বন্ধু তথা ঈশ্বরের মানবের পথের সঙ্গী হয়ে ধরার ধূলিতে নেমে আসার রূপক। এভাবে 'পথ' শব্দটি প্রয়োগভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। বাংলা গানের ধারায় বাউল, কীর্তনসহ সুফি মতাদর্শী রচনায়ও 'পথ' দ্বারা বৈচিত্র্যময় তত্ত্বের প্রকাশ রয়েছে, যার প্রভাব দেখা যায় পূজা পর্যায়ের এমনি কিছু গানে। পূজা পর্যায়ের এই গানগুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পথ' সংক্রান্ত দর্শনের একটি রূপরেখা খোঁজার প্রয়াস করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল ভান্ডারে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে সুরে, তেমনই গানের বাণীতে, শব্দচয়নে। গানগুলোতে এমন অনেক শব্দ আছে, যা ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, কিছু কিছু বিষয়ে কবির নিজস্ব চিন্তাধারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে এবং অন্যান্য রচনার মতো গানেও তার ছাপ পড়েছে স্পষ্টরূপে। এমনকি, গানে এমন অনেক জীবনদর্শনের পরিবর্তনের রূপ চোখে পড়ে, যা অন্যান্য রচনায় প্রচ্ছন্ন। তাই জীবন, মানুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ে তাঁর চিন্তাধারা বোঝার জন্য শুধু রবীন্দ্রসংগীত শোনা নয়, বরং *গীতবিতান* পাঠ করাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে 'পথ'। পথের নেশা যেমন কবির বাউল মনকে করেছে ঘরছাড়া, তেমনি পথের টানে ছুটে আসা সবাইকে যুক্ত করেছে এক অভিন্ন বন্ধনে। গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ কখন যেন মিশে যায় বিশাল বিপুল বিশ্বজগতের চিরন্তন পথের সঙ্গে, কখনো মহামানবের আগমনধ্বনি শোনা যায় ঐ পথের ধূলার 'পরে। এভাবে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে 'পথ' নিয়ে তাঁর ভাবনা বেশ বিস্তৃত রূপ পেয়েছে। কিন্তু 'পথ' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর গানে। হয়তো এ জন্য *গীতবিতান*-এর পূজা পর্যায়ের একটি উপপর্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'পথ'।

পূজা পর্যায়ে 'পথ' নিয়ে রচিত গান নিয়ে পর্যালোচনার আগে *গীতবিতান*-এর পর্যায় ও উপপর্যায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান আবশ্যক। *গীতবিতান*-এর বর্তমান রূপটি কবির দেওয়া। তবে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের সময় এমন ছিল না। প্রথম প্রকাশের সময় প্রকাশকের ইচ্ছেমতো গানের ক্রম সাজানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নতুন অনেক গান যুক্ত করে এবং

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সকল গান ভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিন্যস্ত করে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে দুই খণ্ডে পুনরায় প্রকাশ করেন। এতে গানগুলি মোট ছয়টি পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ হয়। তার মধ্যে পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলো একাধিক উপপর্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। কবিগুরু নির্দেশিত পর্যায় এবং উপপর্যায়ের তালিকাটি হলো :

১. পূজা পর্যায়। উপপর্যায় : গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়।
২. স্বদেশ পর্যায়। উপপর্যায় নেই।
৩. প্রেম পর্যায়। উপপর্যায় : গান, প্রেমবৈচিত্র্য।
৪. প্রকৃতি পর্যায়। উপপর্যায় : সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।
৫. বিচিত্র পর্যায়। উপপর্যায় নেই।
৬. আনুষ্ঠানিক পর্যায়। উপপর্যায় নেই।

(সন্‌জিদা, ২০১২ : ১৯১)

রবিঠাকুরের মৃত্যুর পরে *গীতবিতান*-এর তৃতীয় খণ্ডে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, নাট্যসংগীত, জাতীয় সংগীত, পূজা ও প্রার্থনা, আনুষ্ঠানিক সংগীত, প্রেম ও প্রকৃতি– এই বিভাগগুলো এবং গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য সংযুক্ত হয়।

গীতবিতান-এর প্রধান ছয়টি পর্যায়ের মাঝে 'পূজা' পর্যায়ে গান আছে ৬২১টি, যা সংখ্যার দিক দিয়ে সর্বাধিক।

'পূজা' শব্দটি দ্বারা সাধারণত বোঝায় ফুল-পাতা-জল-অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা প্রতিমার সামনে আরাধনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'পূজা' দ্বারা প্রতিমার প্রসঙ্গ নির্দেশ করেননি। বরং এ পর্যায়ের গানগুলো ঈশ্বরচিন্তা, জীবনদর্শন, আত্মচিন্তা, মোক্ষ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কে নির্ভর করে রচিত হয়েছিল। রামমোহন রায় প্রবর্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা প্রসারিত ব্রাহ্মধর্মেও প্রতিমা পূজা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম জীবনে রবিঠাকুর একনিষ্ঠভাবে এই ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং শেষ দিকে এসে নিজের মাঝে ধর্মচিন্তার এক নতুন রূপ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তাঁর প্রদত্ত 'পূজা' নামকরণে প্রতিমা পূজা, ব্রহ্ম কিংবা ভগবানের স্তুতি– কোনোটিই এককভাবে প্রকাশ না পেয়ে তাঁর জীবনব্যাপী ঈশ্বরচিন্তা ও সীমা-অসীমের সম্পর্কের বিচিত্র ভাবনাগুলি স্থান পেয়েছে। এখানে ঈশ্বর কখনো মহা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ, কখনো পরম পিতা, কখনো বন্ধু, আবার কখনো পথিকবেশে পান্থজনের সখা।

পূজা পর্যায়ের উপপর্যায়গুলোর ক্রমবিন্যাস লক্ষ করলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবসত্তার সম্পর্কের স্তরগুলোর আভাস পাওয়া যায়। যেমন, প্রথম উপপর্যায় হলো 'গান'। এ উপপর্যায়ের গানে গান ও সুরের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তথা বিশ্বমানব ও প্রকৃতির সঙ্গে পরম আরাধ্যের সম্পর্কের বিষয়টি ফুটে ওঠে। পরবর্তী অনুবিভাগ 'বন্ধু'। জীবনের নানা পর্যায়ে ঈশ্বরকে দূরের লক্ষ না ভেবে অন্তরাত্মার পরম বন্ধু বলে অনুভব করার গানগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে। পরবর্তী 'প্রার্থনা' উপপর্যায়ে সেই পরম বন্ধু তথা আরাধ্যকে জীবনে উপলব্ধি করে জীবনকে ভরিয়ে তোলার আশা জানানো হয়েছে। এরপর আসে 'বিরহ'। সৃষ্টির মাঝে চিরকালের বিরহমাখা পথযাত্রার বাণী নিয়ে রচিত এ উপপর্যায়ের গানগুলো। এই সত্য অনুধাবনেই আসে 'সাধনা ও

সংকল্প'। জীবনব্যাপী সাধনা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পথ চললে তবেই আসে প্রাপ্তি। কিন্তু সে পথে চিরসঙ্গী হয়ে থাকে দুঃখ। এই দুঃখবোধ জীবনকে কান্নায় নয়, বরং নিবেদনের প্রত্যাশায় পূর্ণ করে। দুঃখের পরে আসে 'আশ্বাস'। অর্থাৎ, ঈশ্বরকে সঙ্গী করে জীবনযাত্রার পথ খোঁজা। এই বোধ জাগ্রত হলেই মানুষ তাকায় 'অন্তর্মুখে'। নিজের আত্মাকে অনুভবের দ্বারা হয় 'আত্মবোধন'। এর ফলে হয় 'জাগরণ'। আত্মবোধের জাগরণ হলে 'নিঃসংশয়' হয়ে ঈশ্বরের পথে রাখা যায় দৃষ্টি। অতঃপর মানবমন পরিণত হয় 'সাধকে'। এই আত্ম-অনুভবেই মিলনের 'উৎসব', 'আনন্দ'। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বজগতের সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন দৃষ্টিগোচর হয় এবং জীবনে আসে পূর্ণতা। এই পূর্ণতা নিয়ে উপপর্যায় 'বিশ্ব'। পরবর্তী উপপর্যায়ে এমনি কোনো নির্দিষ্ট রূপ ধরা পড়ে না। তাই তার নাম 'বিবিধ'। বিবিধ গানের পরে চারটি উপপর্যায় রয়েছে। এ উপপর্যায়গুলো স্বতন্ত্রভাবে একেকটি ভাব প্রকাশ করে। উপপর্যায়গুলো হলো : সুন্দর, বাউল, পথ এবং শেষ। এর মধ্যে 'পথ' উপপর্যায়ে এমন কিছু গান সন্নিবিষ্ট, যেখানে জীবনের পথকে, ভাবনার পথকে, দর্শনের পথকে নানা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'পথ' শিরোনামে একটি উপপর্যায় থাকলেও পূজা পর্যায়ের বাকি সব উপপর্যায়ে (অন্তর্মুখে, সাধক, উৎসব ব্যতীত) এই প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। 'পথ' একটি শব্দ হিসেবে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রসংগীতে অন্যান্য অনেকগুলি বিশেষ শব্দের ন্যায় এটিও ঘুরেফিরে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি 'পথকে' দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কবির মধ্যজীবন থেকে এই দর্শনের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। কেবল গানই নয়, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ঋতুনাট্য– সব ক্ষেত্রেই 'পথ' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একটি অনুষঙ্গ তথা রূপকার্থক শব্দ। তার সঙ্গে আসে 'পথিক'। সমস্ত জীবনজুড়ে পথ ও পথিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অত্যন্ত বিচিত্র, নানামুখী, রূপকার্থক, ব্যঞ্জনাময়।

বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'পথ' শব্দটির অর্থ হলো রাস্তা, সরণি, ছিদ্র, দ্বার ,পন্থা, কৌশল, উপায়। 'পথিক' শব্দটির অর্থ হলো পথ দিয়ে বিচরণকারী, পর্যটক, পান্থ, মুসাফির। বাংলা সাহিত্য ও গানে এই প্রসঙ্গের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদে* কাহ্নপা বলেছেন–

যে যে আইলা তে তে গেলা
অবনাগমণে কাহ্ন বিমনা ভইলা
কাহ্নকহি গোই করিম নিবাস
জো মন গোঅর সো উয়াস।

(আফসার আহমদ, রবীন্দ্রনাথের গানে
পথ ও পথিক, কালের খেয়া, ২ নভেম্বর ২০১৮)

দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দে* দেখা যায়, অভিমানিনী রাধা কৃষ্ণের পথ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু কৃষ্ণ যখন এলেন, রাধার মান যেন আর ভাঙেই না।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদু পবনে
কিমপরমধিক সুখং সখি ভবনে
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে।

(কবি জয়দেব, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্লোক : ২, নবম সর্গঃ)

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপদাবলির যুগেও পথের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। রাধার কণ্টকাকীর্ণ পথে অভিসারে গমন, সেই পথের দুর্দশা বর্ণনার দ্বারা রাধার আকুতি প্রকাশ– প্রভৃতি বিষয়গুলো 'পদ' রচনার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যখন বাংলায় কীর্তন আন্দোলনের সূচনা করেন, সেটিরও উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন নগরের পথে। নামসংকীর্তন গেয়ে গেয়ে সাথীদের নিয়ে পথে ভ্রমণ করতেন তিনি। পরবর্তীকালে নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনের কাঠামো নির্ধারণে গৌরচন্দ্রিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সারা বাংলা ধীরে ধীরে কীর্তনের জোয়ারে প্লাবিত হলো । তারপর অষ্টাদশ শতকে কবিগান, যাত্রা, তরজা গান প্রভৃতি নানা ধারার সংগীতের প্রচলন হলো বাংলায়। কিন্তু গীতিকবিতায় কাব্যের প্রয়োজনে অন্যান্য অনেক বহুল চর্চিত শব্দের সঙ্গে 'পথ' ও 'পথিক' বিশেষ গুরুত্ব পেল। অর্থাৎ , এই দুটি শব্দ বাংলা গানের আদি থেকে বর্তমান– সর্বদাই বহুল ব্যবহৃত বলে লক্ষ করা যাচ্ছে। সেই ধারায় আমরা রবীন্দ্রসংগীতেও 'পথ' প্রসঙ্গ নবতর রূপে দেখতে পাই। তবে রবিঠাকুর প্রধানত তিনটি উৎস থেকে 'পথ' সংক্রান্ত দর্শনের রসদ লাভ করেন। তা হলো : সুফিতত্ত্ব, কীর্তন, বাউল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুফিতত্ত্বের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেন বলেন : "এইসব ভাব, অসীমের সঙ্গে সসীমের সম্পর্ক স্থাপনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা, সসীমের সীমা প্রসারণের বা অসীমের সঙ্গে মিলনের প্রয়াস, এগুলো অবশ্যই সুফিভাব।" (মোতাহার, ২০১১ : ৫)

সুফিতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বা প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন দিওয়ান-ই-হাফিজের অমর গজলের অনুরাগী, তাঁদের বাড়িতে নানা ভাষাভাষী অতিথির সমাগম হত, গানের আসরও বসত। আর সেই যুগের বৃদ্ধেরা প্রায় সকলেই ফারসি জানতেন, কারণ কিছুকাল আগেও ফার্সিই ছিল রাজভাষা। বিশেষত কবির, দাদু, বুল্লাশাহ এবং বঙ্গদেশেও লালন শাহ, পাগলা কানাই, মদন বাউল প্রভৃতি সাধকগণ পল্লিগানের মধ্য দিয়ে মানুষের সহজ ধর্ম প্রচার করে গেছেন – যাকে বিশেষভাবে ইসলামী সাম্যনীতি ও একেশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবিত পৌরাণিক ধর্মের রূপান্তর বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সাধক কবিরের একশত গানের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। (মোতাহার, ২০১১ : ৫)

ধর্মনিরপেক্ষ তত্ত্বদর্শী 'কবীর' প্রসঙ্গে রবিঠাকুর বলেন :

> তাহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তমান, তাহাদের ধর্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্মবোধ হইতে উৎসারিত। মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাহাদের কারবার। (মকসুদ, ২০১১ : ৫৭৮)

রবীন্দ্রসাহিত্য যে তত্ত্বগুলো সুফিবাদের সঙ্গে মিলে যায় তার অন্যতম হলো 'পথ'। এই পথ তথা রাহ্, পথিক তথা রাহী, মনজিল তথা গন্তব্য সুফিদের একটি বিশেষ রূপক। (প্রসাদ, ২০০৩ : ৫৮)

কীর্তনের প্রতি কবি খুব অল্প বয়সেই মুগ্ধ হন। 'ভানুসিংহের পদাবলীর' প্রথম পদ 'গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে' মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রচনা করেন তিনি। জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদগুলো তাঁর ভীষণ পছন্দের বিষয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনহেতু রাধার অভিসার, সেই অভিসারের পথে নানা রকম বাধা সহাস্যে বরণ করা, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সেই যাত্রাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পরমাত্মা কৃষ্ণের পানে ছুটে চলা প্রভৃতি কবিগুরু খুব আগ্রহ সহকারে

পর্যালোচনা করেছেন। ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী হয়েও 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' বলে বৈষ্ণব দর্শনের পথে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সংযোগের কথা বলেছেন। পূজা পর্যায়ের অনেক গানে কীর্তনের সুর, বৈষ্ণবপদাবলির দর্শন থাকলেও 'পথ' সংক্রান্ত দর্শন এ গানগুলোয় কম। এর চেয়ে বাউলতত্ত্বের প্রভাবে রচিত গানে 'পথ' শব্দটির প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

বাউল মতাদর্শের সঙ্গে কবির পূর্বপরিচয় থাকলেও প্রথম আন্তরিকতা তৈরি হয় ১৮৮৯ সালে পূর্ববঙ্গে এসে। পিতার আদেশে তিনি জমিদারি দেখার কাজে প্রথমে শিলাইদহে আসেন, তারপর শাহজাদপুর। এতদঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রগুচ্ছে। একদম মাটির কাছাকাছি গ্রামীণ সমাজ নিয়ে লেখা তাঁর প্রায় সবগুলো রচনায় অবধারিতভাবে পূর্ববঙ্গের ছায়া পড়েছে। সেইসঙ্গে গান রচনায় পড়েছে পূর্ববঙ্গের বাউলদের প্রভাব। বাউলদের চিন্তাধারায় বৈষ্ণবদর্শন ও সুফিবাদ একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ফলে বাউলদের গানে শব্দপ্রয়োগের রূপকার্থক কৌশল একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। এরই আলোকে রবিঠাকুর বাউলদের 'মনের মানুষ', 'পথ' প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। পূজা পর্যায়ের গানগুলোর রচনাকাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'পথ' সংক্রান্ত গানগুলোর প্রথম কয়েকটি বাদে সবগুলো গানই ১৮৮৯ সালের পরে রচিত।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের খানিক আগে ও পরে কবিগুরু বাউল সুর ও দর্শনের সহায়তায় অনেকগুলো স্বদেশ পর্যায় এবং জাতীয় সংগীত পর্যায়ের গান রচনা করেন। এই সময়কালে পূজা পর্যায়ের গান খুব একটা দেখা যায় না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সহিংস রূপ নিলে কবি ধীরে ধীরে সক্রিয় আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এর পরেই তাঁর রচনায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এবং জীবনদর্শনের প্রভূত বিচিত্র দিকগুলো সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। জীবনপথের পথিক হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকুতি নিয়ে ১৯০৮ সালে রচিত 'শারদোৎসব' এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই ঋতুনাট্যেই সর্বপ্রথম 'পথ' সম্পর্কিত রবীন্দ্রদর্শন একটি বিস্তৃত স্থান পেয়েছে। নাটকে দেখা যায়, রাজা সন্ন্যাসীর বেশে শরতের উৎসবে পথে বের হয়েছেন। 'ঋণশোধের' উপায় খুঁজছেন তিনি। হঠাৎ উপনন্দের সঙ্গে দেখা। বালক উপনন্দ আপনমনে প্রভুর ঋণশোধে ব্যস্ত। প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার এই হলো সংযোগ, প্রাপ্তিকে বৃহৎ মানবের সঙ্গে এক করে দেখা। কবির ভাষায়, "প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয়, সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়।" এই নাটক রচনার ঠিক পরের বছর কবি রচনা করেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। এখানেই কবির বাউল মনের 'পথ' সংক্রান্ত দর্শন প্রথম সর্বতোভাবে প্রকাশিত হয়।

শারদোৎসবে যেমন ছিলেন ঠাকুরদা, *প্রায়শ্চিত্তে* পাওয়া গেল ধনঞ্জয় বাউলকে। রাজা প্রতাপাদিত্যের সন্তান উদয়াদিত্য পিতার ন্যায় লোভী, নিষ্ঠুর নন। তাই রাজত্ব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। 'সত্যদ্রষ্টা, ভগবদভক্ত, ন্যায় ও সত্যের পূজারী' ধনঞ্জয়ের পথকে অনুসরণ করার অভিপ্রায় তাঁর। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ধনঞ্জয় উদয়াদিত্যকে বলছে, "আজ রাস্তায় মিলন। আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই, আজ তুমি যুবরাজ নও, আজ তুমি ভাই।" একই দৃশ্যে বিভা জিজ্ঞেস করে যে বৈরাগী যাচ্ছেন কোথা, তিনি তাদের সঙ্গে যাবেন কিনা। উত্তরে বৈরাগী বলেন, "কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই তো আমায় মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।" (করুণাময়, ২০০৮ : ৭৩)

গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে!
ওরে কার পানে মোর হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে!

এই নাটক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে করুণাময় গোস্বামী রবিঠাকুরের জীবনে পথের প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলেন,

> পথের আহ্বান রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকে তীব্র টানে টেনেছে। এই পথ নেমে এসেছে উপনিষদের অমৃতময় লোক থেকে। এই পথ জগতের ধুলোবালির ভেতর দিয়ে গাছগাছালি ডিঙিয়ে অমৃতধামের দিকে যাচ্ছে। এ পথ মুক্তির পথ। পথযাত্রা সবাইকে পথিক করে দেয়, কোনো ভেদাভেদ থাকতে দেয় না, পথ সবাইকে চলার আহ্বানে উদ্বেলিত করে। (করুণাময়, ২০০৮ : ৭২)

১৯২২ সালে 'লিপিকায়' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।"

এভাবেই রবিঠাকুরের সাংগীতিক জীবনে, বিশেষ করে পূজা পর্যায়ের গানগুলোর রচনায় 'পথ' প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্জগতের একটি সূক্ষ্ম ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে যখন তিনি *গীতবিতান*-এ তাঁর রচিত সকল গান সংকলন করেন, ভাবের দিকে লক্ষ রেখে গানের ক্রম বিন্যস্ত করার কারণে অবধারিতভাবে 'পথ' বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাই পূজা পর্যায়ের ১৯শ উপপর্যায়ের নাম দেন 'পথ'। প্রেম পর্যায়ের গানগুলোতেও 'পথ' প্রসঙ্গ এসেছে, প্রকৃতি পর্যায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু পূজা পর্যায়ের ভাবের সঙ্গে পথ সংক্রান্ত দর্শনের যেন এক ভিন্ন সখ্য। তাই 'পথ' নামে একটি উপপর্যায় থাকার পরেও বাকি সবগুলো উপপর্যায়ে পথের প্রসঙ্গ এসেছে একদম অবধারিতভাবে।

পূজা পর্যায়ের প্রথম উপপর্যায় 'গান'-এ সর্বতোভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'গান' তথা সুরের মাহাত্ম্য। রবীন্দ্রনাথ সুরের গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে জীবনের যাত্রাপথে একে একে যে বিচিত্র ধ্বনি ও সংগতি আপনার জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন, তারই আলোকে দৃষ্টি রেখেছেন হৃদয়জগতে। ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বের এবং বিশ্বের সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন সংযোগই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে সুরের মালা। প্রাচীন সাহিত্য, বৈদিক গ্রন্থ কিংবা তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজেও ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্য প্রকাশক সুরের ঐকতানের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকেই নতুন করে সৃষ্টি করলেন। এ উপপর্যায়ে মোট গান আছে ৩২টি। একটি লক্ষণীয় গান :

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান
পথে চলি, সুধায় পথিক, 'কী নিলি তোর দান!'
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২)

পরমাত্মার পথে সবাই চলছে একসঙ্গে। তাঁরই বাঁশির সুরে পার্থিব জগতকে বিদায় জানানোর তান যখন বাজলো, শেষ হয়ে এলো সংসারের আড়ম্বরপূর্ণ সাংগীতিক আয়োজন। শেষ অর্ঘ্যের প্রসঙ্গে কবি 'গানটি শুধু নিলেম গলায়' বলে জানালেন যে, সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করে হৃদয়ের সুরটুকুকে একমাত্র অবলম্বন করে নিয়েছেন তিনি। সংসারের পথের প্রান্তে বাউল মনের বৈরাগ্য খানিকটা প্রকাশিত হয়েছে এ গানে। ১৯১৪ সালে শিলাইদহে অবস্থানকালে লেখা গানটি। ২৪ সংখ্যক গানে তিনি পথের চিত্রকল্প একদম পাল্টে নিয়েছেন। এবার তিনি নিজে পথে নামেননি, ঈশ্বরকে করেছেন পথিক।

গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২)

পরবর্তী উপপর্যায় হলো 'বন্ধু'। এতে গানের সংখ্যা ৫৯। ঈশ্বরকে পরম বন্ধু বলে কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের কণ্টকময় পথে তিনি এমনই এক বন্ধু, যার কাছে অকপটে নিজেকে মেলে ধরা যায়। সমস্ত চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে 'পান্থজনের সখা' করে তাঁকে হৃদয়ের মাঝে বিলীনরূপে ভাবা যায়। সে বন্ধুর কাছে অক্ষমতা প্রকাশের কোনো অজুহাত লাগে না।

সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাবো যে খুঁজে না পাই দিশা।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২)

এই সমস্যাকীর্ণ জীবনের পথে যখন সমস্তকিছু থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই পথের মাঝে কবি ঈশ্বরের বীণার সুরে আত্মজাগরণের উপায় খুঁজে ফেরেন। শিলাইদহে অবস্থানকালে লিখছেন—

অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণা নিত্য বাজে
আপন সুরে আপনি নিমগন।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১৬)

৫১ সংখ্যক গানে কবি পরম বন্ধুকে পথের ক্লান্তি নিয়ে নিজের কাছে আসতে দেখেছেন। চিরকাল ধরে তিনি আমায় ভালবাসছেন, আমার কাছে আসছেন। আমিই শুধু তাঁকে বুঝতে অক্ষম। ভাগ্যাহত হয়ে চেয়ে আছি তাঁর করুণার আশায়, অথচ তাঁর অপার প্রেম বুঝতে পারিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণও—

পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯:১১৯)

ঈশ্বরকে বন্ধু করে হৃদয়ের মাঝে পেলে তবেই জাগে প্রার্থনার ভাব। তখন পথের ক্লান্তি কিংবা আনন্দ- সবকিছুই তাঁর চরণে সমর্পণ করে মুক্ত হওয়া যায়। এভাবেই 'বন্ধু' উপপর্যায়ের পরে আসে 'প্রার্থনা' উপপর্যায়। এতে গান আছে মোট ৩৬টি। একটি বহুল শ্রুত গান :

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে ?
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ২০)

মিলনের পথে ঈশ্বর অবারিত রেখেছেন দ্বার। কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়ে গেছে দেরি। তাই নিরুপায় হয়ে আকুল প্রার্থনায় পথের ত্রুটি ঘুচিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা কবির মনে। পথের মাঝে কেন এরূপ বাধা— এমন প্রশ্নও আসে কবির মনে। ১১৭ সংখ্যক গানে বিবিধ পথে নতুন নতুন সংকটের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পথে ঈশ্বরের পানে যাত্রার জন্য প্রার্থনা করছেন তিনি।

আমারে রহে যেন না ঘিরি, সতত বহুতর সংশয়ে
বিবিধ পথে যেন না ফিরি, বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৩৪)

এই গানটির সঙ্গে তুলনীয় জালালউদ্দিন রুমীর নিম্নোক্ত গানটি :

তন্ ও জাঁ, ও জাঁ ও তন মসতূর নিস্ত লায়কে কসরা দিদে জাঁন মসতূও নিস্ত।
(মোতাহার, ২০১১ : ৪)

অর্থাৎ, দেহ থেকে আত্মা বা আত্মা থেকে দেহ তো সঙ্গোপন বা প্রচ্ছন্ন নয়। কিন্তু বাধা এইখানে যে, আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করা (এখনও) মানুষের ভালো করে রপ্ত হয়নি।

গান দুটির খুব সূক্ষ্ম একটা মিল রয়েছে। রবিঠাকুর ঠিক এই গানটিকেই অনুসরণ করেননি, কিংবা হয়তো কোনো সুফি শ্লোকই অনুসরণ করেননি। কিন্তু তাঁর মনে এমনই কিছু তত্ত্ব তথা দর্শন ছিল, যা উপরিউক্ত সুফি কাব্যাংশের সঙ্গে মিলে যায়। গানটিতে চঞ্চল মনকে শান্ত করার প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্ত সর্বদা মানুষের মন তার আজ্ঞানুবর্তী হয় না। দিকহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। পথে প্রান্তরে ভ্রমণ যখন সমাপ্ত হলো, তখন কবির প্রার্থনা :

এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহো॥
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৩৫)

এমনি করে কখনো পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য, কখনো পথ খুঁজে পাবার জন্য, আবার কখনো পথিকের সাথি হবার জন্য কবির আকুল প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে এ উপপর্যায়ে। এর পরে আসে উপপর্যায় 'বিরহ'। বিশ্বমানবের হৃদয়ে একটা চিরকালের বিরহভাব সর্বদা বিরাজ করে। এই বিরহ পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হবার বিরহ, অসীমের সঙ্গে সীমার বিচ্ছেদের বিরহ, পরম বন্ধুর থেকে বিচ্যুত থাকার বিরহ। মিলন খণ্ডাংশে আরাধ্যের উপস্থিতি জানান দেয়। কিন্তু বিরহ অনন্ত মহাকালের একটি অনুষঙ্গ হয়ে মানবের যাত্রার প্রতিই ইঙ্গিত করে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ পূজার গানে বিরহের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং করুণা সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছেন। জীবনের পূর্বাহ্নে (১৮৯৫ সালে) লিখেছেন চিরবিরহী সায়াহ্নের গান :

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৪৩)

ভক্ত ও ভগবানের চির বিরহের উপলব্ধি কি কেবলই ভক্তের হৃদয়ে? রবীন্দ্রনাথ তেমনটা মনে করতেন না। অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' বলে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, চির বিরহের এই অনুভবের দ্বারা ঈশ্বরও ফিরে ফিরে আসেন ভক্তের কাছে। তাই তো ভক্তের মনে বাজে সুর :

ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৩৭)

এখানে ঈশ্বর স্বয়ং পথিক। তাঁর চলার পথের ধুলায় আরাধনা ও মুক্তির আশায় কবি নিজেও ব্রতী হতে চান। ১৪২ সংখ্যক গানে লিখেছেন :

বসবো তোমার পথের ধুলার 'পরে
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৪১)

১৫৯ সংখ্যক গানেও প্রায় একই আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় কবি পথ চেয়ে আছেন, জানেন না সে পথ আদৌ চিরকালের বন্ধুর সঙ্গে বিরহের অবসান ঘটাবে কি না!

পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে
তোমায় আমায় প্রাণের বঁধু, মিলব গো একসাথে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৪৬)

এই গানটির মূলভাবের সঙ্গে মিল আছে রুমীর আরেকটি বয়েতের :

জুমলা মা'শুক আম্ত, আশিক পর্দায়ে
যিন্দা মা'শুক আম্ত, আশিক মুর্দায়ে॥

এর অর্থ নির্ণয় করেন কাজী মোতাহার হোসেন এভাবে : "প্রিয়াস্পদ অখণ্ড পরিপূর্ণ রাগিণী, প্রেমী তার একটি স্বর বা পর্দা মাত্র। প্রিয়াস্পদ সদা জাগ্রত, প্রেমী ত অচেতন– তাকে জাগালে তবেই সে জাগে।" (মোতাহার, ২০১১ : ৪)

বিরহের পরে আসে 'সাধনা ও সংকল্প'। ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সত্যিকারের মিলন-বিরহের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা হলে সাধনার দ্বারা সেই বোধের উত্তরণ এবং সংকল্প দ্বারা উদ্দেশ্যের ভিত তৈরি হয়। ১৮৬ সংখ্যক গানে কবি লিখছেন :

যে পথে ধাই নিরবধি
সে পথ আমার ঘোচে যদি
যাব তোমার মাঝে পথের ভুলে।

পথ ভুললে তবেই ঈশ্বরের পথটি চেনা যায়। তাই যেখানে চেনা পথের সমাপ্তি, সেখান থেকেই তাঁর পথের সূচনা। এ হলো সাধনারই একটি রূপ। এর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকতে হয় চিরমুক্তির উদ্দেশ্যে। ১৯০ সংখ্যক গানে মুক্তির জন্য 'পারের পানে' বহমান পথকে অনুসরণ করার কথা বলেন কবি :

এই কথাটা ধরে রাখিস, মুক্তি তোরে পেতেই হবে
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৫৩)

এর পরে আসে উপপর্যায় 'দুঃখ'। রবিঠাকুরের সমগ্র জীবনই নানামুখী দুঃখ দ্বারা আবৃত ছিল। প্রিয়জন হারানোর দুঃখ, সন্তান হারানোর দুঃখ, অসহযোগিতা পাওয়ার দুঃখ প্রভৃতি প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে গড়ার প্রত্যয় ছিল তার মাঝে। তাই জাগতিক দুঃখবোধকে সৃষ্টিতত্ত্বের অনুভবের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। ধর্ম প্রবন্ধ সংকলনে তিনি 'দুঃখ' নামক প্রবন্ধে বলেন, "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।" (করুণাময়, ২০১৩ : ১৩৭) ২০৫ সংখ্যক গানে কবি লিখছেন :

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিলে তারে
আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৫৬)

পথের মাঝে ঈশ্বরকে ভুলে গেলে গভীর অন্ধকারে আবার পথ খুঁজতে হয়। তবু স্থবিরতাকে গ্রহণ করা অনুচিত। ভুল হবে, পথে ভ্রান্তি আসবে, হয়তো দুঃখভারাক্রান্ত মনে ঈশ্বরও ছলনা করছেন বলে মনে হবে :

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৬০)

এরপর কবি 'দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখ, কত শোকদহন/গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান' (পূজা পর্যায়, ২৫০ সংখ্যক গান) বলে 'আশ্বাস' খোঁজেন আপনার মাঝে এবং আত্মবোধের জাগরণ ঘটার একটি প্রচ্ছন্ন আশা দেখা যায় কবির মনে। 'আত্মবোধন' উপপর্যায়ের একটি গান :

চলিস নে পথ মেপে মেপে
আপনাকে দে নিখেল ব্যেপে
যে ক'টা দিন বাকি আছে
কাটাসনে আর ঘুমের ঘোরে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৬৮)

গানটির রচনাকাল ১৯১৩, স্বরলিপিতে রাগ হিসেবে উল্লেখ আছে 'বাউল সুর'। বলা হয়ে থাকে, 'আউল' শব্দটি থেকে এসেছে 'বাউল'। অর্থাৎ, আপনার দিকে বেখেয়ালি যে। এই কথাটিরই একটি রূপ দেখতে পাই উপরের গানটিতে। রচনাকাল অনুযায়ী রবিঠাকুর তখন বাউল দর্শনে একদম আত্মহারা হয়ে আছেন। জীবনের চলার পথে তাই বাউলদেরই মতো বেখেয়ালি হতে চান।

আত্মবোধনের পরে আসে উপপর্যায় 'জাগরণ'। এ উপপর্যায়ের একটি গান :

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো,
দিসনে তারে ফাঁকি।
... ...
পথে পায়ে পায়ে দুঃখের বাঁশরি বাজবে তোরে ডাকি
মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৬৯)

গানটি রচনা শিলাইদহে বসে, সুর করা রাগ পিলুর আশ্রয়ে। এতে বাউলের প্রভাব অত্যন্ত সহজভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। 'কঠিন পথের শেষে' পরম বন্ধু একা বসে আছেন। একদিন সব ছেড়ে তাঁরই উদ্দেশ্যে হবে যাত্রা। জাগরণের এই অনুভূতি পূর্ণতা পাবে 'নিঃসংশয়' স্থিতিতে এসে। অর্থাৎ, পথ অজানা হলেও যাত্রা সুনিশ্চিত।

অবোধ আমি ছিলেম বলে, যেমন খুশি এলেম চলে
ভয় করিনি তোমায় আমি অন্ধকারে।
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যা রে।"
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৭৩)

পরবর্তী 'সাধক' এবং 'উৎসব' উপপর্যায় দুটিতে তেমন কোনো 'পথ' সংক্রান্ত গান নেই। এর পরে আসে উপপর্যায় 'আনন্দ'।

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৮৩)

এই গানটি রচিত কীর্তনের সুরে, ১৮৯৯ সালে। 'আনন্দের' পরে আমরা উপপর্যায় পাই 'বিশ্ব'। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের এতগুলি স্তর পার হয়ে এসে তবে রবিঠাকুর 'বিশ্ব' উপপর্যায়ের স্থান নির্ধারণ করলেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সত্যিকারের সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়, তখন নিজের সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক বোঝা সম্ভব হয়। এই উপপর্যায়েও 'পথ' শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে।

যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া
চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে, সে পথতলে পড়িব লুটে...
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে॥
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৮৯)

পরবর্তী উপপর্যায় হলো 'বিবিধ'। বিশিষ্ট সংগীতবোদ্ধা করুণাময় গোস্বামী মনে করেন, এই নামে আলাদা একটি উপপর্যায় না রাখলেও চলত। তিনি বলেন, "... পরের ১৪৩টি গানকে কেন রবীন্দ্রনাথ বিবিধ উপশিরোনামে সংকলিত করতে গেলেন বোঝা গেল না। এ গান থেকে অনেক গানকে আগেকার উপশিরোনামসমূহে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন।" (করুণাময়, ২০১৩ : ১৪৭) এ উপপর্যায়ে যে গানগুলোয় পথের প্রসঙ্গ আছে, সেগুলোতেও কোনো ঐক্য নেই। পরবর্তী উপপর্যায় 'সুন্দর', তারপরে আসে 'বাউল'। 'বাউল' উপপর্যায়ে গান আছে মাত্র ১৩টি। অথচ রবিঠাকুরের সমস্ত জীবনজুড়েই রয়েছে বাউলের প্রভাব, বিপুল সংখ্যক গানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রয়েছে বাউলের ছায়া। এ উপপর্যায়ে পথ সংক্রান্ত একটি গান :

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি খুঁজে তারে পায় কি আঁখি
এখন, পথে ফিরে পাবি কিওে ঘরের বাহির করলি যারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২৭)

বাউলের পরে আসে উপপর্যায় 'পথ'। এতে গান আছে মোট ২৫টি। পথকে তিনি কোনো কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, তার বেশ কিছু উদাহরণ সন্নিবেশিত আছে এখানে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এ উপপর্যায়ের সবকটি গানের রচনাকাল ১৯১২ থেকে পরবর্তী সময়। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি 'গীতাঞ্জলির' যুগে যেই আধ্যাত্মিকতার ধারায় স্নান করেছিলেন এবং তারই ফলে পরবর্তী জীবনে গান রচনা করেছিলেন, 'পথ' উপপর্যায়ে সেই বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ উপপর্যায়ের প্রথম গানটিতেই আনন্দের সঙ্গে কবি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পথ চলা শুধুই উপভোগের, শুধুই সাধনার :

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া বর্ষা আসে বসন্ত।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২৯)

এ উপপর্যায়ের গান সম্পর্কে করুণাময় গোস্বামী বলেন,

> ... পথ তাঁর রচনায় গতি, অভিযান, রহস্য ও অনন্তের প্রতীক। পথ এখানে অনন্তের পথে যাত্রা পথ, রাজপথ, স্বয়ং বিশ্বরাজধামের দিকে যাচ্ছে এই পথ। এ পথ জীবনপথ। কেউ জানে না এই পথ যাত্রা কবে আরম্ভ হলো, কবে এই যাত্রা শেষ হবে। (করুণাময়, ২০১৩ : ১৫১)

'শেষ' উপপর্যায়ে অবধারিতভাবেই পথের প্রসঙ্গ এসে যায়। জীবনের পার্থিব অধ্যায়ের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে অনন্ত অসীমের সঙ্গে মিলনের যাত্রায় কবি ঈশ্বরের বাঁশির ডাক শুনে যখন উতলা, পথের পথিকদের কাছে জানতে চান পথের দিশা। কেউ ঠিক কথাটি বলে না, কবি নিজেও পথের সন্ধান ঠিকঠাক অনুধাবন করতে পারেন না। তবু পথ চলেন, তবু আশায় বুক বাঁধেন।

> শুধাই যত পথের লোকে– 'এই বাঁশিটি বাজালো কে?'
> নানান নামে ভোলায় তারা নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে।
> (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১৩৯)

পথের মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারলেই পথচলা হয়ে ওঠে সহজ এবং সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলোতে জীবনের পথকে আপন করে পাবার, আনন্দের সঙ্গে সেই পথে চলার বাণী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গ্রন্থিত রয়েছে। যে কেউ এই গানগুলোর মর্ম অনুধাবনের দ্বারা জীবনের জটিল পথকে সহজ করে নিতে পারেন।

বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রসংগীত এমন একটি স্থান লাভ করেছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সময়ের বাংলা গানের মোটামুটি সব ধরনের উপাদান নতুন রূপ পেয়েছে, এক ধরণের পূর্ণতা লাভ করেছে। গানগুলোতে বাংলার কীর্তন, বাউল ও সুফীতত্ত্বের মূল ভাবটি পুরোপুরিভাবে দৃশ্যমান না হলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই সকল ধারার গানে ও দর্শনে পারস্পরিক মিল অভাবনীয় এবং অপূর্ব। এরই ধারাবাহিকতায় 'পথ' শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ও ক্ষেত্রবিশেষে অর্থের পার্থক্য নিরূপণের প্রচেষ্টার দ্বারা পূজা পর্যায়ের গানে 'পথ' সংক্রান্ত দর্শন নিয়ে রবিঠাকুরের নিজস্ব চিন্তাধারার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হলো । *গীতবিতান*-এর জগতে এমনি আরও অনেক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ রয়েছে, যা থেকে কবিগুরুর জীবনদর্শনের অনেক বৈচিত্র্যময় দিক আবিষ্কার করা সম্ভব।

সহায়কপঞ্জি

আফসার আহমদ (২০১৮)। 'রবীন্দ্রনাথের গানে পথ ও পথিক'। *কালের খেয়া*।
আবদুশ শাকুর (২০১২)। *রবীন্দ্রজীবন* (২য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
আহমদ রফিক (২০১৬)। *রবীন্দ্রজীবন* (৩য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
আহমদ রফিক (২০১৬)। *নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।
করুণাময় গোস্বামী (২০০৮)। *রবীন্দ্র নাট্যসংগীত*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
করুণাময় গোস্বামী (২০১৩)। *রবীন্দ্রসংগীতকলা* (১ম ও ২য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
প্রসাদ সেন (২০০৩)। *রবীন্দ্রসংগীতে মিলন মেলা*। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
মোবারক হোসেন *সম্পা.* (২০১১)। বাংলা একাডেমির নিবেদন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মোবারক হোসেন *সম্পা.* (২০১২)। রবীন্দ্র-বীক্ষণ নানা দৃষ্টিতে। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান (২০১১)। *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৯)। *গীতবিতান*। মলি প্রকাশনী, ঢাকা।

লীনা তাপসী খান *সম্পা.* (২০০৯)। *সংগীত শেকড়* (সংখ্যা : ১)। আন্তর্জাতিক বাংলা সংগীত কেন্দ্র।
সন্‌জিদা খাতুন (২০১২)। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ'। *রবীন্দ্রবীক্ষণ : নানা দৃষ্টিতে*। সম্পাদক : মোবারক হোসেন। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
সন্‌জিদা খাতুন (২০১৬)। *রবীন্দ্র বিশ্বাসে মানব অভ্যুদয়*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।
সুচিত্রা মিত্র *সম্পা.* (১৯৮৯)। *রবীন্দ্রসংগীতায়ন*। প্যাপিরাস, কলকাতা।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)। *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1250 date : 19th march 2019.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* : একটি বিকল্প পাঠ

মো. সোহানুজ্জামান*

[সারসংক্ষেপ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসের বিষয় হিসেবে প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনায় পূর্ব-বাংলার পির সংস্কৃতিকেই প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনা-সমালোচনা করা হয়। একইসাথে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস আলোচনায় বিষয়ের চেয়ে সাহিত্য-প্রকরণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। *লালসালু* উপন্যাস সম্পর্কে 'প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনার' বিপরীতে এই প্রবন্ধে 'বিকল্প পাঠ' উপস্থাপিত হবে। 'বিকল্প পাঠ' বলতে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ধর্ম, শিক্ষাসহ সমাজ-সম্পর্কিত আরও নানান বিষয়ে সম্পৃক্ত হয়ে উপন্যাস-পাঠকে বোঝানো হচ্ছে : যে সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস নির্মিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে দেখানো হবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং পরিপ্রেক্ষিত-প্রভাবে কীভাবে এই উপন্যাস বৈষয়িক দিক থেকে সম্পূর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে এই উপন্যাসের সাহিত্য-প্রকরণও (Literary Technique) আলোচিত হবে।]

'৪৭ সালের দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে 'পূর্ব-বাংলার' উপন্যাস-ইতিহাস-বিবেচনায় এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবেচনায়ও নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১)। বিশেষ করে সাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের (Aesthetics) বিচারে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বারংবার পাঠ ও বিবেচনা করা হয় 'আধুনিক' হিসেবে। 'আধুনিক' সাহিত্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অবশ্যই পালিত হয়েছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে; সেটা অনেকাংশেই সক্রিয় থেকেছে তাঁর উপন্যাসের প্রকরণ-কৌশলে, উপন্যাসের বিষয়ে নয়। উপন্যাসের বিষয়-নির্বাচনের বেলায় ওয়ালীউল্লাহ্‌ সর্বদাই সজাগ থেকেছেন; বিশেষভাবে উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে সম্পৃক্ত থেকেছেন পূর্ব-বাংলার ভূমি, মানুষ ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের সাথে। বিশেষ করে কলকাতাকে কেন্দ্র ধরে যদি এই আলোচনা করা হয়– তবে এই বিষয় আরও স্পষ্ট হবে।

'আধুনিক' সাহিত্যে নগর, 'নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত', (দীপ্তি, ১৯৯৭ : ২) নগরের মানুষ এবং এই নাগরিক মানুষের নানারকম কর্মপ্রবাহ সক্রিয় থাকে; এবং সেই বিষয় নির্ধারিত হয় 'আধুনিক' সাহিত্যের বিষয় হিসেবে– এই ব্যাপারটা অনেকাংশেই বাতিল হয়ে যায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে। পূর্বোক্ত ব্যাপারটা বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, প্রকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতার দাবিদার। অর্থাৎ 'আধুনিক' সাহিত্যের প্রকরণ-কৌশল ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে সক্রিয়তা হারায় না। প্রকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহ্‌ বারংবার পাশ্চাত্যের নানারকম 'সাহিত্য-প্রকরণ' ধার করে তা তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করলেও বিষয়ের বেলায় ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন।

ওয়ালীউল্লাহ্‌ সব মিলিয়ে, বাংলা ভাষায়, মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ইংরেজিতে লিখেছিলেন আরও দুটো উপন্যাস। বলতে দ্বিধা নেই, সেই ইংরেজি উপন্যাসেও তিনি 'দেশি' বিষয় ব্যবহার করেছেন। তা পূর্ব-বাংলা [বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র] না ছুঁয়ে গেলেও,

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

উপমহাদেশের [ভারতীয় উপমহাদেশ] বাইরে যেতে পারেনি। আর সেই 'না যাওয়া ব্যাপারও' বিশেষভাবে সম্পৃক্ত থেকেছে পূর্ব-বাংলার মাটি-মানুষ, তাদের আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সূত্রের সাথে। ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলায় যে তিনটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাস। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভক্তিতে প্রাপ্ত সদ্যোজাত ভূমিতে [পাকিস্তান] একেবারেই আনকোরা এক উপন্যাস; যা এই ভূমির [পূর্ব-বাংলা] আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়কে সাথে নিয়েই নির্মিত হলো। কিন্তু 'আধুনিকতা' 'প্রগতিশীলতা' আর 'পির সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের' কথাই প্রাধান্য পায় লালসালু উপন্যাস-পাঠের বেলায়। আদতেই কি 'আধুনিক' উপন্যাস : *লালসালু*? তাছাড়া কেবলই কি প্রচারিত হয়েছে পূর্ব-বাংলার পির-সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর বিরোধিতার বিষয়? আদতে এই দুটো বিষয় নয়, এই উপন্যাস ধারণ করে আছে আরও নানান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিহ্ন-সূত্র।

'আধুনিকতার' আর কলকাতাকেন্দ্রিক 'রেনেসাঁর' প্রতি তীব্র আকর্ষণ, তীব্র আগ্রহ পূর্ব-বাংলার মানুষের মানস-জগতে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে দীর্ঘদিন; তা এখনো যে উন্মূলিত হয়েছে, তা হলফ বলা যাবে না। সেই 'আধুনিকতা' এবং 'রেনেসাঁ' যতই মেকি হিসেবে সমালোচিত হোক না কেন। 'রেনেসাঁ' এবং 'আধুনিকতায়' যে সমস্ত কার্যকলাপ সংঘটিত ও সম্পাদিত হয়েছিল সে সময়কার 'কেন্দ্র কলকাতায়', তা থেকে নানান কারণে দূরবর্তী অবস্থানে ছিল পূর্ব-বাংলা : তা অবস্থানগত দিক থেকে যেমন সত্য, তেমনি সত্য 'মানসিকতার দ্বন্দ্বে'র ক্ষেত্রেও।

এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য, 'ধর্মচৈতন্যে'র প্রভাব এবং 'পরাজিতের সাধারণ মানসিক অবস্থা'— এই দ্বৈত অবস্থার প্রভাবে পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ 'নতুন উপনিবেশ' এবং এর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। এবং দূরত্ব যা বজায় রাখার দরকার, তা তারা রেখেছিল। ফলে আকাঙ্ক্ষিত 'আধুনিকতা'র ব্যাপারে তীব্র আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এই পরাজিত শ্রেণি কখনই মানসিকভাবে বিজেতার শাসনযন্ত্রের সাথে একত্রিত হতে পারেনি। এর পিছনেও নানান কারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ৪-৫) নানা চিহ্ন-সূত্রের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় এবং বাস্তব জীবনযাপনের নানা ক্রিয়াকলাপে 'প্রগতিশীল' ও 'অসাম্প্রদায়িক' ও 'আধুনিক' হিসেবে স্বীকৃত ওয়ালীউল্লাহ্ও কিন্তু এই একই কারণে স্বতন্ত্র ভূমির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন; সক্রিয়তায় অংশগ্রহণ করেছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের মতো 'ইউটোপিয়ান'[১] কর্মকাণ্ডে। আসলে পূর্ব-বাংলার গড় জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেই যেন ওয়ালীউল্লাহ্ও জানিয়ে দেন 'রেনেসাঁ' এবং 'আধুনিকতার' প্রতি পূর্ব-বাংলার মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার। কিন্তু কেন এই আকাঙ্ক্ষা? তা স্পষ্ট হওয়া উচিৎ।

এই আকাঙ্ক্ষার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে দুই বাংলার 'সাংস্কৃতিক দূরত্ব' [শিক্ষা, শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত নানা প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, শিল্প, সংগীতসহ এমন নানা বিষয়কে এক কথায় 'সাংস্কৃতিক দূরত্ব' হিসেবে উদ্ধৃত হচ্ছে]। যদিও অনেকে মনে করেন যে, অর্থনৈতিক অবলম্বনের স্থানচ্যুতি কিংবা স্থানান্তর [সামন্ততন্ত্র এবং লগ্নি পুঁজি— এই দুই দিক বিবেচনায়] হয়তো বিভাজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু সেটা কেবল একদিক থেকে সত্য, সর্বাংশে সত্য নয়। ফলে 'সাংস্কৃতিক দূরত্বের' ব্যাপারটাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব-বাংলার বৃহৎ একটা শ্রেণি যে এই শাসনযন্ত্রের [ঔপনিবেশিক] প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হয়নি, এমনও নয়। কিন্তু সম্পৃক্ত হতে যাবে কী নিয়ে? হাতে টাকা থাকলেই তো সব হয় না। ভাষাও লাগে, লাগে চলাফেরার আদবতমিজ। তা তো পূর্ব-বাংলার গড় জনগণের

ছিল না, নির্দিষ্ট শ্রেণির লোকজনও প্রথম দিক থেকেই ইংরেজ-উপনিবেশ-বিরোধিতার কারণে এই বিষয়সমূহ আয়ত্ত করতে পারেনি। এর পিছনে মূল কারণ ছিল মূলত দুটি : ক. 'অতীত স্মৃতি' খ. পূর্বোক্ত 'পরাজিতের মনস্তত্ত্ব'।

বিশেষ করে টমাস বেবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay, 1800-1859) ১৮৩৫ সালে যখন রাজ-ভাষার এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার রদবদল করলেন– তখন এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৩৫ সালে টমাস বেবিংটন মেকলে ফারসির বদলে– বাংলা নয় অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাও নয়– ভারতে 'ব্যবসায়ী ইংরেজ সরকারের'[২] সকল ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষা প্রতিস্থাপন করেন, প্রবর্তন করেন নতুন শিক্ষানীতি। এমনকি মেকলে এটাও বলেন যে, 'আমি কখনই তাঁদের মধ্যে [সেইসব ইংরেজ, যাঁরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় ভাষার পক্ষে ওকালতি করছেন] এমন একজনকেও পাইনি, যিনি অস্বীকার করতে পারবেন যে একটা ভালো ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটামাত্র শেলফ পুরো ভারতের নেটিভ ও আরবীয় সাহিত্যের সমতুল্য।' (Macaulay, 1835) ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে 'মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন' (*Minute on Indian Education*) প্রবন্ধে মেকলে যখন একইসাথে এই বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও বর্ণবাদী বক্তব্য দিচ্ছেন; তখন পূর্ব-বাংলার, এমনকি সমগ্র ভারতের মুসলমানদের যে অংশটা তখনো ইংরেজ প্রশাসনের নানাস্থানে কর্মরত ছিল ফারসি ভাষার বদৌলতে– তারাও কেউ কেউ চাকরি খুইয়ে বসে, বসার উপক্রমের পথে উপনীত হয়। এই বেদনাবোধ আরও বাড়িয়ে তোলে সিপাহি বিদ্রোহের পরাজয়ের হতাশা আর গ্লানি।

'সাংস্কৃতিক' বোধ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তায় সক্রিয় বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। এমনকি এই বোধটা যে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে প্রথম থেকেই তাড়িত করেছিল, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কারণ মহৎ এবং বড়ো লেখকরা অভিক্রিয়া ও পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি দ্বারা তাদের লেখাজোখা তৈরি করেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাই করেছেন, কেবল ভিন্ন হয়েছেন সাহিত্য-প্রকরণে (Literary Technique)। প্রকরণের ফলেই তাঁর সাহিত্যিক বৈষয়িকতা চূর্ণনীয় হয়ে উঠেছে– আলোচিতও হয়েছে সবচেয়ে কম, সমালোচনায়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ 'সাংস্কৃতিক' বিষয়– যা দেশভাগ এবং হিন্দু-মুসলমানের পরিচয়গত সংকটেরও (Identity Crisis) সৃষ্টি করেছে; এবং আলাদা হওয়ার রসদও জুগিয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার মতো নিন্দনীয় সহিংসতায় পড়ে লোকজন বেঘোরে মারাও পড়েছে।

ফলে লাগামটা আর ধরি ধরি করেও ধরা হলো না পূর্ব-বাংলার গড় জনগণের। কিন্তু চেতনাবাধ তো আর চিরদিন একস্থানে স্থির থাকে না। মানুষ দেখে হলেও কিছু শেখে। সেই প্রক্রিয়ায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তুলনায় গিয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণ দেখলো আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান-বিবেচনায় কেন্দ্রসহ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তাদের অবস্থান সঙ্গিন। কিন্তু পূর্ব-বাংলার প্রাক-ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা ছিল চমকপ্রদ; এবং কেন্দ্র দিল্লির সাথে মোকাবিলা করে স্বাধীনতা-ঘোষণার মতো তুরীয়বাদী সিদ্ধান্ত এই পূর্ব-বাংলায়ই সম্ভব হয়েছিল! কিন্তু তার বিনাশের ইতিহাস এবং রিক্ততা সম্পৃক্ত বর্তমান অবস্থা [দেশভাগ পূর্ববর্তী অবস্থা] ওয়ালীউল্লাহ্‌কে গভীরভাবে ভাবিয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতেই ওয়ালীউল্লাহ্‌ এমন এক দেশের বর্ণনা করেন, যা ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত দিক থেকেও একটা চিহ্ন-সূত্রের জোগান দেয় "...দেশটা কেমন মরার দেশ।

শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ৪) আসলে এই উপন্যাসের শুরুর এই ক' বাক্যেই এক ধুন্ধুমার কাণ্ড যে ওয়ালীউল্লাহ্ ঘটিয়ে ফেলেছেন তা কি খেয়াল করা উচিৎ নয়? কেবলই 'আধুনিকতা' আর 'আধুনিক প্রকরণ' আর 'মজিদের ভণ্ডামিতেই' কি শেষ হয়ে যাবে এইরকম ভৌগোলিক ও সমাজনিষ্ঠ এক দলিল? তা হতে পারে না। সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা করা উচিৎ। বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র কলকাতার সাহিত্যের সাথে যে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যের বিষয়গত পার্থক্য– তার কারণটাই ওয়ালীউল্লাহ্ জানিয়ে দেন উপন্যাসের সূচনায়। সেই সূচনা অংশে সমাজনিষ্ঠ এবং ভূমি-নির্ভর এক উপন্যাসের-পাঠের চোরা-সংকেত ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথমেই জানিয়ে দেন। নগর কলকাতা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য নির্মিত হওয়ার বেলায় যে আবেগ-অনুভূতি সক্রিয় থাকে, তার সাথে একটা বড়ো পার্থক্য বজায় থেকেছে এই উপন্যাস রচনার বেলায়। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত উক্তি নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

> বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ব-বাঙলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নেই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতোধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে ওঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের আনন্দ দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি। প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই? (হুমায়ুন কবির, ২০১৫ : ২)

ভৌগোলিক ও আবহাওয়া-জলবায়ুগত নানা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নানাবিধ বিষয়ের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল ওয়ালীউল্লাহ্র। দেশকে [পূর্ব-বাংলা] ভীষণভাবে ভালোবাসতেন। দেশের বাইরে অবস্থানকালে দেশ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন; দেশকে নিয়ে ভাবতেন। বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার নিসর্গ-রূপ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তা তিনি উপন্যাস রচনার বেলায়ও স্মরণে রেখেছেন। এ বিষয়ে আন মারির উক্তিও নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

> দেশকে সে গভীর ভালোবাসত। পূর্ব বাংলার সৌন্দর্য, অজস্র আঁকাবাঁকা নদী, সবুজ খেত, তরুবীথির পেছনে ঢাকা পড়া ছোট ছোট গ্রাম, বাঁশঝাড়, কাঁঠালগাছ, দামাল মেঘ, দমকা বাতাসের সঙ্গে মৌসুমি বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়া শিশু-কিশোরের দল– আমাকে এসব দেখানোর জন্য সে উদ্গ্রীব ছিল।... নিজের দেশের দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, দেশটিতে ব্রিটিশ, হিন্দু জমিদার এবং এখন পাকিস্তানিদের [ষাটের দশক] শোষণকে ঘৃণা করত সে। (আন মারি, ২০১২ : ৩২)

মধ্যযুগে, মুসলিম শাসনামলে, কেন্দ্র [রাজধানী] হিসেবে ঢাকা যখন অবস্থান হারালো, ইংরেজদের ব্যবসিক তল্পিবাহক জব চার্নক (Job Charnock, 1630-1692/93)[৩] ঢাকা থেকে যখন তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে সুতানুটিতে ব্যাবসা আরম্ভ করলো– সমস্যার সূচনা সেখান থেকেই। পরবর্তী সময়ে তা ক্রমায়াতভাবে বেড়েছে। যে 'বাঁশবনে' চার্নক 'বাঁশবনের রাজা' হয়েছিলেন, সেখান থেকে দ্রুতই বেড়ে উঠতে থাকে কলকাতা নগর– এই নগরের নানা

প্রভাব-প্রতিপত্তি [প্রধানত অর্থনৈতিক] ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমগ্র ভারতবর্ষে। (তীর্থংকর, ২০১৭ : ৫৯-৬৫) ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব-বাংলা আরও বেশি নিষ্প্রাণ হতে থাকে। ১৭৫৭ পরবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলের মৌন-অবস্থা সম্পর্কে উইলিয়াম উইলসন হান্টারও (William Wilson Hunter, 1840-1900) এই একই কথা বলেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *পল্লীবাংলার ইতিহাস* (*The Annals of Rural Bengal, 1868*) গ্রন্থে। (হান্টার, ২০১৮ : ২৭-২৮) এই নিশ্চলতা– অর্থনৈতিকভাবে তো বটেই– এরপর আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে বলতে গেলে, "রাজনীতিক পরিবর্তনে পুরনো অবস্থাসম্পন্ন মুসলমান পরিবারগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।" (সরদার ফজলুল, ২০১৬ : ১৮)

অর্থাৎ বাংলার রাজধানীর ক্রমাগত পরিবর্তন পূর্ব-বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর গভীর প্রতিঘাত ফেলেছে। সেই প্রাচীন আমল থেকেই নানা কারণে পূর্ব-বাংলা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌ভূমি (*Hinterland*) হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। ইংরেজ আমলে তা একেবারেই স্বীকৃত রূপ হিসেবে প্রাধান্য পায়। কারণ কেন্দ্র কলকাতার সাথে পূর্ব-বাংলার যে রেল-ব্যবস্থা নির্মিত হয়েছিল তার সাথে রয়েছে কেবলই ব্যবসায়ী-সম্পর্ক, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু এসব কর্মকাণ্ডের ফলে আর্থিকভাবে যে এতটা পরিযায়ী অবস্থার মধ্যে পতিত হতে হবে পূর্ব-বাংলার মানুষকে– তা তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদের পরিযায়ী পরিস্থিতি [আর্থ-উৎপাদন-সম্পর্ক] এবং এর পিছনে মজিদের পিতৃভূমির বিরানতার রূপকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক বাস্তবচিত্র। তা পূর্ব-বাংলার ক্রমাগত আর্থিকভাবে নিঃশেষ হওয়ারই চিত্র।

ফলে বিষয় হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পূর্ব-বাংলার মাটি-মানুষকে তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করারও সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। মনে রাখা জরুরি যে, যে 'আধুনিকতা' আর 'প্রগতির' স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো গভীর 'আধুনিক' চেতনাবোধ সম্পন্ন মানুষও এই কারণেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রমাগত নয়া-ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ড ওয়ালীউল্লাহ্‌কে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল, তিনি তাঁর অবস্থানও পালটে ফেলেছিলেন পরবর্তীকালে, দ্রুতই।

উপনিবেশ-প্রভাবিত নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি যে বিপুল অনীহা পূর্ব-বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তার খেসারত কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ দিতে হয়েছিল এ অঞ্চলের মানুষের। এখনো যে সক্রিয় রয়েছে এই ব্যাপারটা, তার মূল কারণও সে সময়ের পশ্চাদ্‌গামী চিন্তা। পূর্ব-বাংলার বড়ো একটা শ্রেণি অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, সেই সময় ইংরেজ শিক্ষার প্রতি ছিল অনাগ্রহী। এর পিছনেও বিজিত ও পরাজিতের মানসিকতা সক্রিয় ছিল, আর ছিল অতীত-সম্পৃক্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি। বিশেষ করে কেন্দ্র কলকাতা থেকে পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক দূরত্বের কারণের মধ্যে ছিল শিক্ষা-বিষয়ে ভীষণ অনাগ্রহ। আর ধর্ম-চৈতন্যের গভীর প্রভাব তো এক্ষেত্রে কার্যকর ছিলই; যা পাশ্চাত্য শিক্ষা-গ্রহণে ছিল প্রধানতম অন্তরায়। এই চিত্র ওয়ালীউল্লাহ্‌ *লালসালু* উপন্যাসে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক 'মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাসে'র মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

> হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তা আগে করিমগঞ্জের স্কুলে নিজে নাকি পড়াশোনা করেছে কিছু।...
>
> ...কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কি দু-দুটো মক্তব বসানো হয় নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে? (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ৪৫)

ফলে এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনের মানোন্নয়ন বা অগ্রগতির কোনো চিহ্নই চোখে পড়ে না। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণে যে একেবারেই মুসলিমদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না এমনটা বললে ভুল হবে। কারণ নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক পরে হলেও মুসলমানদের অংশগ্রহণের ফল হিসেবে মুসলিম চাকুরের উপস্থিতি ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ বলছেন, *লালসালু* উপন্যাসে, "এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ৪) এমনকি জমিদারদের একটা বড়ো শ্রেণিও সবকিছু হারিয়ে পালিয়েই যেন বেঁচে-বর্তে ছিল। সেই মুসলমানেরই আবার এক নতুন জাগরণ ঘটেছে, বিশেষ করে আলিগড়-আন্দোলন-এর প্রভাব কেন্দ্রের সাথে সাথে পূর্ব-বাংলাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেই প্রভাব দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মতো সাহিত্যও প্রভাবিত হয়েছে। (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ৩১)

ফলে ওয়ালীউল্লাহ্ যে উপন্যাসের সূচনায় মুসলমান-চরিত্র নির্মাণের ফিরিস্তি দেন, তার একটা কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তার সময় বেশ পরের; যদি তুলনা করা হয় 'নবোদ্ভিন্ন হিন্দু মধ্যবিত্তের' সাথে। এরও রয়েছে যৌক্তিক কারণ। হিন্দু মধ্যবিত্ত ধর্মীয় অন্তরায় কাটিয়ে ইংরেজ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুসলমানরা সে কাজটা করতে পারেনি। 'সংস্কৃতি' থেকে 'ধর্মকে' প্রাধান্য দেওয়ায় এই বিষয়টা হয়ে ওঠেনি, ওঠা সম্ভব ছিল না। ওয়ালীউল্লাহ্র *লালসালু* উপন্যাসে বর্ণিত 'মক্তবভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রম' এ কথাকেই স্পষ্ট করে। এ বিষয়ে একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

> ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে হিন্দু সমাজের সচেতন অংশের আগ্রহ এবং তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ এর পশ্চাতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া তারা বুঝতে পেরেছিল যে ইংরেজ শাসন এদেশে দীর্ঘস্থায়ী হবে, ইংরেজি শিক্ষা অচিরেই প্রাধান্য পাবে। ফলে তারা মানসিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। এক্ষেত্রে ধর্মও তাদের আগ্রহের অন্তরায় ছিল না। অন্যদিকে মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় অংশ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। মুসলিম 'আশরাফ' শ্রেণি যারা অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তারা অতীত ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষার পথ থেকে সফলভাবে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই শ্রেণির মধ্য থেকে বাংলায় বসবাসকারী কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই সময়ে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। (আবদুল বাছির, ২০১২ : ২০৪-২০৫)

ফলে সেই পূর্বস্মৃতি আর বর্তমানের [ঔপনিবেশিক শাসনামল] সঙ্গিন পরিস্থিতিই পূর্ব-বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে ভাবিয়েছে। এবং তারা আন্দোলন [নতুন ভূমির] করেছিল মূলত এই 'সাংস্কৃতিক' দূরত্ব ঘুচানোর জন্যই। এই ব্যাপারে 'ধর্মচৈতন্য' টেনে আনতে পারে যে কেউ;

সেক্ষেত্রে সদুত্তর হবে পূর্ব-বাংলার মানুষের ধর্মের বিষয়– যা গভীরভাবে সম্পৃক্ত ভূমি-গঠিত জীবন-মানসের সাথে। বিষয়টি তাদের শ্রেণি-পেশার আলোচনার বেলায়ও সমানভাবে গ্রহণীয়।

কিন্তু এর সাথে এ কথাও বলে নিতে হয় যে, নতুন ভূমি-ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্‌রও বিশেষ আগ্রহ ছিল। মুসলমানদের জন্য নতুন দেশের আবদার যারা করেছিল, তাদের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ও অবস্থান করেন। এসব থাকার পরও কিন্তু আলিগড়-আন্দোলন দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত ওয়ালীউল্লাহ্‌ হননি। কারণ যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ আর ঐতিহ্যের কথা বার বার সে সময়কার সাহিত্যে বলা হচ্ছিল, সেই ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্‌র তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। শেষাবধি 'স্যুট-কোট' পরা ওয়ালীউল্লাহ্‌ কিন্তু 'টুপি-পাঞ্জাবির' দেশ চাননি। তাঁর স্বপ্নে কলকাতা না হলেও আরেকটা 'নকল কলকাতার' স্বপ্ন বজায় ছিল। তাঁর চিন্তায় ছিল না যে পূর্ব-বাংলা 'আরব মুল্লুকের মরুভূমিতে' ঢাকা পড়ুক। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ পাকিস্তানের ভূমি ও তার ধর্মের সাথে পূর্ব-বাংলার যে পার্থক্য– তা বজায় রেখেছিলেন, বিশেষ করে বিষয়ে ও ভাষায়।

এই ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক ওয়ালীউল্লাহ্‌ হয়েছিলেন ভাষা-আন্দোলন পরবর্তী সময়ে। যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ জিন্না মারা গেলে বলছেন, "কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এ যাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিদের একজন।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৮: ৬, 'সাজ্জাদ শরিফ লিখিত ভূমিকাংশ') সেই ওয়ালীউল্লাহ্‌-ই বিশেষভাবে চিন্তিত থেকেছেন ষাটের দশকে, পাকিস্তানের ভগ্নপ্রায় দশা দেখে; পশ্চিম পাকিস্তানিদের নয়া-ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ডে পূর্ব-বাংলার জনগণের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত আর বঞ্চিত হতে দেখে। লিখেছেন *কাঁদো নদী কাঁদো*র (১৯৬৮) মতো উপন্যাস। যে সময় এই উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে সেই সময়টাও বিবেচনা করা দরকার। "পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যখন বেগবান হয়ে ক্রমাগত জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, *কাঁদো নদী কাঁদো*র প্রকাশ সেই সময়ে, ১৯৬৮ সালে। সেই উত্তাল প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসে একটিমাত্র স্টিমার দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বাঁধা– যে সংযোগও কিনা একেবারে ছিন্নপ্রায়– কুমুরডাঙ্গা দ্বীপটির সঙ্গে পূর্ববাংলার আশ্চর্য মিল কীভাবে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।" (সৈয়দ, ২০১৮: ৭, 'সাজ্জাদ শরিফ লিখিত ভূমিকাংশ') সাজ্জাদ শরিফের এই মন্তব্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। শরিফ যে বিষয়ে কথা বলেন, অস্তিত্ববাদী উপন্যাস হিসেবে বিস্তর পাঠের ফলে এই উপন্যাস-পাঠ অনেকটা ক্লিশে হয়ে পড়েছে। তারও রয়েছে নির্দিষ্ট কার্যকারণ।

এর জন্য ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাস্তব-জীবনের দিকে একটু দৃক্‌পাত করা দরকার। মনে রাখা জরুরি যে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন তিনি ফ্রান্সে সরকারি কাজে নিয়োজিত। ফ্রান্সের কেন্দ্রেই অবস্থান করেছেন। ১৯৬১ সালে ফ্রান্স-গমন (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ২৬৯) এবং সেখানকার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ তাঁর সাহিত্যের প্রকরণগত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। এ সময়ে কেবল আধুনিক সাহিত্য বিবেচ্য বিষয় নয়, অ্যাবসার্ড (Absurd) নাটকেরও তখন রমরমা অবস্থা। এবং সেই সব নাট্যকার এবং নাটকের বিষয়-প্রকরণ-দর্শন– এর সবই নির্মিত হচ্ছে ফ্রান্সে। সেই প্রভাবেই কেবল ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে প্রকরণগত পরিবর্তন ঘটে গেল; দার্শনিক কিছু প্রপঞ্চও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তাঁর সাহিত্যে। কিন্তু বিষয় হিসেবে পূর্ব-বাংলাকে বাদ দিয়ে, পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থাকে বাদ দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহ দেখাননি ওয়ালীউল্লাহ্‌। বরঞ্চ সচেষ্ট থেকেছেন পূর্ব-বাংলার সাথেই; চিন্তিত

যে ছিলেন তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুই জানিয়ে দেয় আমাদের।

এই বিষয়ে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খেয়াল করার আছে, পূর্ব-বাংলার ভাষার হিসেবের বেলায়। মানে আলিগড়-আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েও যে ওয়ালীউল্লাহ্ স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রেখেছিলেন, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন-সূত্র তাঁর উপন্যাসের ভাষা। কট্টর পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী চিন্তা-সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতায় নিমগ্ন হয়ে অন্যান্যের মতো তিনি তাঁর উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'আরোপিত আরবি-ফারসির' ব্যবহারে উৎসাহী ছিলেন না। পূর্ব-বাংলার ভাষা যে স্বতন্ত্র, এমনকি কলকাতার ভাষার সাথে তুলনার বেলায়ও, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষার হিসেব যদি করা হয়– সেই বিষয় ওয়ালীউল্লাহ্ বিশেষভাবে স্মরণে রেখেছেন।

এ কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূমি চাওয়ার পিছনে ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তায় কার্যকর থেকেছে এ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের কথা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বার্থ হাসিলের একটা উদ্দেশ্য তো ছিলই। কিন্তু 'পাঞ্জাবি বা টুপি' পরে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন ওয়ালীউল্লাহ্ কখনই দেখেননি। এই বিষয় তাঁর বাহ্যিক জীবনযাপন-সূত্রের মধ্যেই গ্রথিত ছিল, শেষাবধি। এক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহ্র বিয়ের ব্যাপারটা যেমন আছে; তেমনি এর সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে জিন্নাহর ধর্ম পালনের বিষয়। ফলে পূর্ব-বাংলার ভাষা যে স্বতন্ত্র, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের পান্ডাদের ভাষার থেকে– এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার ফলেই মজিদের মুখের ভাষার সাথে আওয়ালপুরের পিরের ভাষার ফারাক ওয়ালীউল্লাহ্ নির্মাণ করেছেন। এমনকি এই বিষয় স্পষ্ট হয়েছে আওয়ালপুরের পিরের এবং তার সাঙাতদের মুখের ভাষার সাথে মহব্বতনগরের জনগণের ভাষার। তাই এই কথা বলতেই হবে যে, ভাষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। ওয়ালীউল্লাহ্ আওয়ালপুরের পিরের ভাষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মজিদের ভাষাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এ উপন্যাসে।

ধর্মবোধের বিষয়েও ওয়ালীউল্লাহ্ নিজস্ব অঞ্চলভিত্তিক [পূর্ব-বাংলা] ধর্মবোধের ব্যাপারটাকে সংযোজিত করেছেন তাঁর *লালসালু* উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুর দিকে খতনা করার বিষয়টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন-সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই অঞ্চলে মুসলমানের আগমনের পূর্বে ধর্মীয় পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা গভীরভাবে ভাবিয়েছে ওয়ালীউল্লাহ্কে। ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজেও এই বিষয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন : তা তাঁর স্ত্রীর সাম্প্রতিক প্রকাশিত স্মৃতিচারণামূলক লেখা থেকে স্পষ্ট হওয়া যায়। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়; ধর্মের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে আগ্রহ ছিল ওয়ালীউল্লাহ্র। ফলে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্ অনেকটাই মুসলিম ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাপারে তাঁর ছিল না তেমন কোনো আগ্রহ। কিংবা ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীলতা দ্বারা তিনি কোনোসময়ই প্রভাবিত হননি; নিশ্চয় আঘাত পেতেন, তা তাঁর লেখাজোখায় স্পষ্ট হয়েছে।

> ওয়ালী ছিল অবিশ্বাসী, কিংবা বলা যায় অজ্ঞেয়বাদী। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও মুসলমান হিসেবে গর্ব বোধ করত। ও অক্লান্তভাবে মুসলিম-বিশ্বের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে যেত। পশ্চিমা দেশগুলো যখন বর্বর ছিল, তখনকার মুসলিম সভ্যতার উৎকর্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করত।... সালাদিনের মহত্ত্বের কথা বলত ও। আরব দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেডের ভিন্ন একটি চিত্র আঁকত ও। (আন মারি, ২০১২ : ৫৬-৫৭)

সাংস্কৃতিকভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং এর প্রভাবিত ধর্মবোধ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ধর্মীয় বিষয়াদি উপস্থাপনে সহায়তা করেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই কারণেই তিনি *লালসালু*তে বলতে পেরেছেন , "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ৩) অর্থাৎ ভৌগোলিক ও আবহাওয়া-জলবায়ুর সাথে সাথে সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে নির্দিষ্ট অঞ্চলের ধর্মকে : সে ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্‌ সজাগ ছিলেন। এছাড়া ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল এবং নেতিবাচকতার প্রতিও তাঁর বিরূপ মনোভাব বজায় ছিল। এই কারণেই হয়তো 'উদারনৈতিক ইসলামের' ইতিহাস-স্মৃতি তাঁকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। পূর্ব-বাংলায় ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম প্রচারের একটা প্রেক্ষাপট আছে– সে ব্যাপারেও ওয়ালীউল্লাহ্‌ অবশ্যই গভীর জ্ঞান রাখতেন। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক একজন ঐতিহাসিকের মতামত বিষয়টাকে স্পষ্ট করবে : বিষয়টা ধর্ম, ভাষা ও অভিবাসী মুসলমান বিষয়কে স্পষ্ট ইতিহাস-ভিত্তি প্রদান করবে। যার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র ধর্মবোধের।

> কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরের অনুমানকে সমর্থন করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিপুল পরিমাণ নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি ইসলাম ধর্ম শুধু অভিবাসী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে বাংলা ভাষা নিয়ে চতুর্দশ শতক থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিত না। (আকবর আলি, ২০১৯ : ২৪)

এই ধর্মান্তরকরণের চিহ্ন-সূত্র ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর *লালসালু* উপন্যাসে সরবরাহ করেছেন। বিশেষ করে মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে আসার পরপরই খতনা করার ব্যাপারটা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। নির্দিষ্ট কিন্তু কৃত্রিম, এক মাজারকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করেছিল মজিদ– তা অনেকটাই রূপকার্থের ভিতর দিয়ে মিলে যায় পূর্ব-বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচারণার সাথে। যেমনটা দেখিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্‌।

> বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিল, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিল, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মতো চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,
>
> —আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ১১)

লালসালু উপন্যাসে মাজারভিত্তিক পির সংস্কৃতির যে ভণ্ডামির কথা সমালোচকরা বারবার বলেন, তার আসলে সত্যতা রয়েছে। বিশেষ করে ওয়ালীউল্লাহ্‌ লিখিত *বহিপীর* (১৯৬০) নাটকের পিরদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছিল। কিন্তু সেই 'পিরেদের' সাথে '*লালসালু*র পীরের' রয়েছে পার্থক্য, নানান বিষয়ের চিহ্ন-সূত্র তা স্পষ্ট করে। কারণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*র 'মজিদের মতো পিরের' ভূমি-সংলগ্নতার বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু *বহিপীর* (১৯৬০) নাটকের 'পিরেদের' সাথে এই ব্যাপারটা সম্পৃক্ত থাকেনি পুরোপুরি। এছাড়া যেমন রয়েছে মারফতি মতের বিষয়, পূর্ব-বাংলায়। কারণ নিম্নশ্রেণির মুসলমান, যারা বিবেচিত 'আতরাফ' হিসেবে, তাদের সাথে একটা বড়ো পার্থক্য রয়েছে উচ্চশ্রেণির মুসলমান হিসেবে

বিবেচিত 'আশরাফদের'। এই দ্বন্দ্বও প্রকটিত হয়েছে *লালসালু* উপন্যাসে। এই বিষয় পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত কিংবদন্তি-পাঠের মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া সম্ভব।

> একটি দেশ বা অঞ্চলের কাছে যা 'বিশ্বাস' অন্য ভৌগোলিক পরিবেশে অন্য জাতির নিকটে তা 'সংস্কার' হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে একটি দেশ, জাতি বা অঞ্চল একটি বিশেষ পরিমণ্ডলীভুক্ত প্রবহমান ঐতিহ্যের মধ্যে গড়ে উঠে— এ ঐতিহ্যে থাকে তার ধর্ম, পূজা-প্রার্থনা, উৎসব-উপাচার, খাদ্য-খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশ্বাস-সংস্কার। (আশরাফ সিদ্দিকী, ২০১০ : ১৬৯)

বিশেষ করে ধর্ম-পালনের অভিজ্ঞতা এবং ধর্মের উদ্ভবের নানা অভিজ্ঞতায় আশরাফ শ্রেণির মুসলমানের অভিজ্ঞতার সাথে দুরপনেয় সম্পর্ক বিদ্যমান আতরাফ শ্রেণির মুসলমানের। তাই নামাজ পড়ার রীতি এবং ইসলামের অন্যান্য পালনীয় বিষয়ের মধ্যে একটা বিরোধের চিত্র ওয়ালীউল্লাহ্ এই [*লালসালু*] উপন্যাসে হাজির করেন। এই হাজিরকৃত দ্বন্দ্বে আতরাফ বা নিম্নবর্গের মুসলমানদের পির হিসেবে কিন্তু মজিদেরই জয় হয়েছে। এবং পরাজিত হয়ে পির যে গাছে চড়ে বসে, তাও এক স্যাটায়ার-নির্মিত বিজয়-চিহ্নবিশেষ, মজিদের জন্য। আর গাছে চড়ে বসা পিরের মাধ্যমে কেবল সাধারণ স্যাটায়রই নির্মিত হয়েছে এমন নয়— একইসাথে একই ধর্মের বর্গভিত্তিক পার্থক্যের হিসেবটা সুস্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া এই দুই শ্রেণির সাথে সাংঘর্ষিক তুলনার উদাহরণও ওয়ালীউল্লাহ্ দিয়েছেন।

> কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে— বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২ : ২৪)

জেমস ওয়াইজ (James Fawns Norton Wise, 1835-1886) পূর্ব-বাংলার লৌকিক ধর্ম ও জাতি-বর্ণ-পেশা বিষয়ে যা বলেছেন, তাও নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জাতি-বর্ণ-পেশার সাথে ও ধর্ম-চৈতন্যের ব্যাপারে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারে সক্রিয়তা নিয়েও বিশেষ তাঁর মন্তব্য; সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তার সাথে এই চিন্তার। (ওয়াইজ, ২০০০ : ২৩-২৫)

ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসের শুরুতেই যে ফিরিস্তি দেন, বিশেষ করে মজিদের জন্মভূমির বাস্তবতা বিষয়ে, সেই বাস্তবতায় বলতে হয় মধ্যপ্রাচ্যের সুফি ঘরানার পির ও শরীয়তপন্থি পিরদের সাথে কার্যত বিপরীত ভূমিকা পালন করেছে মারফতিপন্থিরা। *লালসালু* উপন্যাসে ফসলের কল্যাণ-কামনা করে মাঠে শিঙা বাজানো, কিংবা ছাই ছিটানোর ব্যাপারটা এই বিষয়েরই নির্দেশ করে। এর পিছনে নদী, ভূমি, ফসল, উর্বরতার মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক-উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। কারণ পূর্ব-বাংলা মানুষের সাথে নদীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর ফসল উৎপাদন কিংবা আর্থ-উৎপাদন-কাঠামোয় গুরুত্বের দাবিদার ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু। ফলে ধর্মের উদ্ভব-ইতিহাস একেবারেই অলৌকিক নয়। এমনকি বৈশ্বিক ধর্মের উদ্ভব-ইতিহাসের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সভ্যতার বাস্তবতায় ধর্মের উদ্ভবের ইতিহাস-বিবর্তন। আবার এ প্রশ্নও জাগে, এক অলৌকিক অচেতনেই কি ধর্মের উদ্ভব হয়ে গেল? না, এ কথা যৌক্তিক নয়। এক্ষেত্রে একটি উক্তি এ বিষয়ের সত্য ও যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করবে।

> The study of the mythological systems of ancient nations has revealed many curious and unlooked-for facts and correspondences. It has been made apparent, in the first place, that those mythologies had their origin in primitive ideas about the movements of the heavenly bodies, the variations of day and night , summer and winter, and other natural phenomena, which were in time, through the modification of human ideas, transformed into the doings of a throng of deific beings. The worshippers did not know whence came their gods. We, who can approach the subject without prejudice and bigotry, and to whom mythology has ceased to be sacred, can easily trace their origin, and point out nearly every step of their unfoldment. It has become evident, in the second place, that a close affinity exists between the mythological ideas of different and often widely separated countries, the resemblance extending not only to their broader features, but in some cases to their mind or details of dogma and belief. (Titcomb, 1889 : 13-14)

এই একই প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকবে পূর্ব-বাংলার মানুষের ধর্ম-চৈতন্যের উদ্ভব ও বিকাশ-ইতিহাসের সাথে– এ কথা পূর্বোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা যায়। ফলে পূর্ব-বাংলার কৃষক শ্রেণির ধর্ম-চৈতন্যের পিছনে কাজ করেছে এ অঞ্চলের ভূমি-অভিজ্ঞতা ও ভূমি-প্রভাব। বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবও এই বাস্তবতা মেনেই হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরত্যাগের চেয়ে বাস্তবতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "The Buddha did not deny the gods, therefore, but believed that the ultimate reality of nirvana was higher than gods." (Armstrong, 1993 : 43) ফলে এই একই প্রক্রিয়ায় শরিয়তপন্থি ধর্মচৈতন্য-অবলম্বনের চেয়ে মারফতপন্থি ধর্মচৈতন্য-অবলম্বনের প্রতি ঝোঁক রয়েছে পূর্ব-বাংলার জনগণের। এই কারণেই পূর্ব-বাংলায় লোকায়ত ধর্মের প্রভাব এত বেশি। তাই *লালসালু* উপন্যাসের কৃষকদের শরিয়ত-বিরোধি কর্মকাণ্ডের রয়েছে সুস্পষ্ট কার্যকারণ সূত্র। ফলে আসমানি-চৈতন্য তাদের ওপর সহজে প্রভাব ফেলতে পারেনি। এ বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ নিজেও উপন্যাসে বলছেন :

> কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শীষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ৯)

ধর্মতন্ত্র ও ক্ষমতা-কাঠামো, সেটা কেবল সামন্ততন্ত্র বলে নয়, এখনো আধুনিক যুগেও ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে ধর্মতন্ত্রের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এভাবেই এখনো ক্ষমতা-কাঠামো আর ধর্মতন্ত্রের যোগসাজশে একটা আধিপত্য সমাজে ক্ষমতার বিস্তার ঘটায়। সেই বিষয়ও স্পষ্ট করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্‌, তাঁর এই উপন্যাসে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ উপন্যাসের একস্থানে বলছেন এমনটা।

> এবং সমাজের মূল হল একটি লোক– যার আঙ্গুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হল মজিদ। জীবনস্রোতে দুজনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১২ : ৩১)

নারীবাদী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি এই উপন্যাসের নারী-চরিত্র; বিশেষ করে জমিলা। কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়, ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই উপন্যাসের নারীবাদী-চিন্তা সকর্মক ভূমিকা পালন করেছে। রহিমা চরিত্রের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার নারীর টাইপ চরিত্র নির্মাণ করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্। কিন্তু মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা আবার রহিমার এই টাইপ-চরিত্র ভেঙে দেয়, বিপরীতে অবস্থান নেয়। বিশেষ করে প্রথাগত ধর্মতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে তার প্রয়াস এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পুরুষতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের নিবিড় যোগসাজশে যে আধিপত্য নারীকে সহ্য করতে হয়, তার বিরুদ্ধে জমিলা চরিত্র বিদ্রোহী। তার বিদ্রোহ কোনো গ্রন্থগত নারীবাদ নয়। প্রায়োগিক নারীবাদী চিন্তার তুরীয় উদাহরণ জমিলার নানান কর্মকাণ্ড।

ইউটোপিয়ান পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে নিজেকে অন্তর্ভুক্তিকরণেরও ওয়ালীউল্লাহ্ নানাভাবে 'পাকিস্তান নামক অবাস্তব (Utopian) রাষ্ট্রের' একটা অংশ দ্বারা আরেকটা অংশের শোষিত-নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস ওয়ালীউল্লাহ্‌কে তাঁর পূর্বতন দৃঢ় রাজনৈতিক বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। এবং যে 'সাংস্কৃতিক' উন্নয়নের স্বপ্ন ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রথম জীবনে দেখেছিলেন এবং তাঁর চিন্তা-চেতনায় ধারণ করেছিলেন খুব দ্রুতই তা বদলে যায়। ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বিগত কাল্পনিক স্বপ্নের বীভৎসতা এবং কুৎসিত রূপ দেখে যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। ব্যথিত তো হয়েছিলেনই। আর এইসব মনঃক্ষোভ শেষপর্যন্ত তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসে যেমন চিড় ধরায়, তেমনি করে সেইস্থান দখল করে নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা। কিন্তু সর্বসমক্ষে সেই চিন্তার প্রকাশ ঘটানো সম্ভবপর ছিল না তাঁর পক্ষে। তা ব্যক্তিক ক্ষেত্রেও ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বারা করে ফেলা সম্ভব ছিল না। ভাষা আন্দোলনের প্রভাব হয়তোবা টের পেয়েছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্; আর তাই মোড় নিয়েছিল তাঁর চিন্তা। সেই চিন্তা *লালসালু*তে যেভাবে ছিল তার চেয়ে বেশি সংক্রমিত হয়েছিল তাঁর অপর দুটি বাংলা উপন্যাসে। তবে *লালসালু*তে সেই চিন্তা একেবারেই রহিত হয়নি। কিন্তু টের পাওয়া বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।

> কিন্তু সাতচল্লিশের আগে থেকেই পাকিস্তানি স্বাধীনতা সম্পর্কে এরকম সন্দেহ জাগে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের মনে;— এমনকি যারা পাকিস্তানি ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধ'রে প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলো পাকিস্তান ও ইসলামের, তাদের অসহায়ত্বও চোখ এড়ায় না। যতো অভিলাষ আর স্বপ্ন ছিলো, তা সম্ভবত বাস্তবায়িত হবে না— এমন একটা বোধ ছড়িয়ে পড়েছিলো সম্ভবত পূর্ব বাঙলার মানুষের মধ্যে। এ-বোধ পাকিস্তানি স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকে তখনকার সাহিত্যে। (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৫ : ৬৭)

এক্ষেত্রে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এই বলে, পূর্বোক্ত জিন্নাহকে সমর্থনের বিষয়টা তাহলে আদতে কী ছিল? সময়টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৪৮ সালে। দেশভাগের পরপরই। যার মাঝে একটা বড়ো সমস্যা এসে হাজির হয়েছে, তা নিয়ে আন্দোলন চলছে— হ্যাঁ, ভাষা আন্দোলন তখন তুঙ্গ পর্যায়ে। স্মরণে রাখা জরুরি মহৎ লেখক মাত্রই দূরদর্শী হন। সময়-প্রভাবে ইতিবাচক দিকেই ধাবিত হন। ওয়ালীউল্লাহ্ তার ব্যতিক্রম নন।

*লালসালু*র পরে প্রকাশিত *দুই তীর ও অন্যান্য গল্পে*র (১৯৬৫) 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পেও ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ধর্মীয় উন্মাদনার বিকৃত চিত্রই ধরা পড়েছে। তারা মিঞার হত্যাকাণ্ড, আর তা নিয়ে সেলিনা, দাদাসাহেব আর আম-মৌলবীর কর্মকাণ্ডে।

(সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৭ : ৮৯-৯৫) যে গল্প-প্লট নির্মাণ হয়েছে তা স্পষ্টাভাবে ধারণ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও পাকিস্তানের মুদ্রা-বৈষম্য– যা দুই দেশ দুই অর্থনীতির তত্ত্বের মতোই।

এই একই প্রক্রিয়ায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য-পাঠ জরুরি। তাহলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের বৈষয়িক ব্যাপারগুলো 'দিবা-রাত্রির' সংকট কাটিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বিষয় সংযুক্ত করা দরকার। ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রথমদিকে [চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে] যে সমর্থন জুগিয়েছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে তার ফল তিনি পেয়েছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন; তবে তা তো অবশ্যই যোগ্যতা বাদে নয়, যোগ্যতার দিক থেকেও তিনি সবদিক থেকেই যোগ্য ছিলেন[৪]। কিন্তু নিজের চাকরির ব্যাপার, এবং নিজের বোধের যে দ্বন্দ্ব তা তাঁকে আসলে মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত রেখেছিল বহুদিন যাবৎ। এরই ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ সরাসরি কিছু বলেননি, যেমনটা বলেছিলেন *লালসালু*তে। কিন্তু *কাঁদো নদী কাঁদো* কিংবা *চাঁদের অমাবস্যা*তে *লালসালু*র চেয়ে বেশি 'রাজনৈতিক বয়ান' (Political Narrative) উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কৌশলগত কারণেই তা বিমূর্ত হয়ে ধরা পড়ে; একটু গভীর পর্যবেক্ষণে তা আবার মূর্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে সাজ্জাদ শরিফের পূর্বোক্ত মন্তব্যই যথার্থ।

'ব্যক্তিক বোধ ও চিন্তা 'আধুনিক' সাহিত্যের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। 'আধুনিক' কবিতা-ভাষায় যেমন বিষয়টা বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়, তেমনি করে উপন্যাসের ভাষায়ও এই ব্যক্তিক-বোধ বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের ভাষায়ও এই বিষয়টা কেউ কেউ খেয়াল করেছেন।

> পূর্ব বাংলার উপন্যাসের আঙ্গিকের মতই ভাষার নৈপুণ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রতিটি উপন্যাসেই তাঁর ভাষা ব্যক্তি-মানসের জটিলরূপকে প্রকাশ করেছে অসাধারণ ব্যঞ্জনায়।... সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের ভাষাও ব্যক্তিমানসের জটিলতম স্তরগুলিকে ব্যঞ্জিত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। (শাহীদা, ১৯৯২ : ১৯২)

কিন্তু কেবলই যে এই ভাষা [ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের ভাষা] ব্যক্তিকতার ওপর ভিত্তি করেই বেড়ে উঠেছে এমনটা পুরোপুরি সত্য নয়; সত্য হলেও তা উপরিকাঠামোয় (Superstructure) আংশিক সত্য। কারণ এই ব্যক্তিক ভাষাবোধ আর ভাষা-নৈপুণ্য যুগপৎভাবে ব্যক্তিকতা আর নৈর্ব্যক্তিকতা– এই দুই বিষয়কেই ধারণ করেছে। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসের ভাষা নানা কারণে আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিক বলে মনে হলেও এর ভিতর-কাঠামোয় লুক্কায়িত রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক নানা বিষয়াদি। এমনকি ব্যক্তিক অস্তিত্বের বেলায় এই ব্যাপারটা সমানভাবে কার্যকারী। ওয়ালীউল্লাহ্‌ যে তাঁর সাহিত্যে নানারকম রং, বর্ণ, প্রকৃতি, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-ঝঞ্জা উপস্থাপন করেন তা তাঁর প্রিয় বিষয় যেমন, তেমনি ফরাসি সাহিত্যের নানা প্রভাব এক্ষেত্রে কার্যকারী এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ব্যক্তিকতায় নৈর্ব্যক্তিকতা ধরতে পারার বিষয়টা আরও নানামাত্রায় মেলানো যেতে পারে দূরান্বয়ী অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষাবোধের সাথে।

ফ্রান্সে বসবাসের সময়ও এই ব্যাপারটা তাঁর সাহিত্য-মানসকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে এই সময় তিনি অ্যাবসার্ড নাটকের কৌশল ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যুগ-বাস্তবতায় তার ব্যক্তিজীবন তো সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সে [যে কোনো ব্যক্তি] যতই বলুক না কেন যে সে রাজনৈতিক চিন্তার বাইরের লোক। ফলে এই ব্যাপারটাই ঘটে

গেছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নিজ জীবনেও, সংগোপনে। ওয়ালীউল্লাহ্ যদিও তা প্রকাশ করেননি বলে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে; কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় যেন আরও বেশি। কিন্তু তার কৌশলটা ভিন্ন; দার্শনিক অভিপ্রায়েও ব্যাপারটা কেমন যেন মাটিছাড়া– এই যা। এ ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহ্ ফ্রান্সে অবস্থানকালীন নানা প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। বিশেষ করে অ্যাবসার্ড নাটক আর নাট্যকারদের প্রভাব। এ বিষয়ে একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জীবনের শূন্যতা, একাকিত্ব, আত্ম-বিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর-বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য, অন্তহীন ক্লান্তি, অর্থহীন ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের দুর্ভর যন্ত্রণা উপস্থাপনে একদল নাট্যকার সচেতনভাবে এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে নাটক নির্মাণ করেন। এই নাটকে চরিত্র-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা কিংবা ঘটনাংশের ক্রমবিকাশ থাকে না; বরং তার জায়গায় পাই কাব্যময়তা আর প্রতীকী ব্যঞ্জনাময় পরিণাম-চিত্র। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯ : ২৭১)

সেই প্রভাবে তিনি নাটকও রচনা করেছিলেন। এমনকি উপন্যাসের বেলায় তাঁর পূর্বতন প্রকরণ-কৌশল [বিশেষভাবে *লালসালু*] বদলে গিয়েছিল। ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক রেখে কেবল বদলেছিলেন প্রকরণ। তাতেই ঘটে গেছে বিরাট কাণ্ড– নেই, কিছু নেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে– এই বলে একদল সারা সাহিত্যপাড়া মাথায় করে চিৎকারে ব্যাপৃত থেকেছে। আবার আরেকটি দল কেবল প্রকরণ-কৌশল নিয়েই সময় পার করেছে। কিন্তু ভেবে দেখার দরকার আছে যে, স্যামুয়েল বেকেট (Samuel Beckett, 19065-1089) যে তাঁর বিখ্যাত অ্যাবসার্ড নাটক *গডোর প্রতীক্ষায়* (*Waiting for Godot, 1952*) রচনা করেন তা কেবলই বৈষয়িক দিক থেকে নিরর্থকতাকেই (Absurdity) ধারণ করে না; এই 'নিরর্থকতা' আসলে নিরাকার কার্যকলাপের মাধ্যমে সাকারকে উপস্থাপনেরই এক দুর্দান্ত কৌশল– তা ভুলে গেলে চলবে না।

কিন্তু জ্যাঁ জেনের (Jean Genet, 1910-1986) বিখ্যাত অ্যাবসার্ড নাটক– অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান তাত্ত্বিক মার্টিন এসলিন (Martin Esslin, 1918-2002) যে নাটককে অ্যাবসার্ড নাটকের 'মাস্টারপিস' বলে আখ্যায়িত করেছেন (সোহানুজ্জামান, ২০১৬ : ২৯২)– *দ্য ব্যালকনি* (*The Balcony, 1956*) যেমন একটি ব্যালকনিতেই উপস্থাপিত হয়েছিল– এক 'নাগরিক ব্যালকনিতেই' শেষ হয়েছে এই নাটকের কাহিনি। এই যে অ্যাবসার্ড নাটকের একজন নাট্যকারের একটা নাটকের উদাহরণ দেওয়া হলো, এই ধারায় আরও অনেকেই আছেন, তা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের এই রমরমা সময়ে, যা দ্বারা তিনি প্রভাবিতও হয়েছিলেন, ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসেবে *দ্য ব্যালকনি*-এর বিষয়ের মতো ক্ষুদ্র বিষয়কে গ্রহণ করেননি, গ্রহণ করেছেন এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক বিষয়। যা তাঁর উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপটগত বিষয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকরণের বেলায় ওয়ালীউল্লাহ্ বারবার ব্যবহার করেছেন পাশ্চাত্যের উপন্যাস-কাঠামো; যা ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। যদি আপত্তি তুলে কেউ বলেন যে ওয়ালীউল্লাহ্ তো *লালসালু* উপন্যাসে আখ্যান-বর্ণনায় ধারাবাহিক কাঠামোটাই ব্যবহার করেছেন সেক্ষেত্রে বলতে হবে যে, এই আধুনিক কিন্তু চৈতন্যপ্রবাহরীতি সম্পৃক্ত নয়। এ কথা সর্বাংশে সত্য। যেমনটা তিনি *চাঁদের অমাবস্যায়* (১৯৬৪) কিংবা *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসে আখ্যান-বর্ণনা করেছিলেন– তা থেকে *লালসালু* উপন্যাসের আখ্যান-বয়ান-প্রক্রিয়া

একটু পূর্ববর্তী চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বৈষয়িক চিন্তা অনেকাংশেই অগ্রবর্তী– এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপরিউক্ত আলোচনায় সৃষ্ট প্রেক্ষাপট নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের পাঠের ক্ষেত্রে। কারণ প্রকরণগত আলোচনায় তাঁর [ওয়ালীউল্লাহ্‌র] উপন্যাসের বিষয়গত আলোচনা স্বভাতই অনেকটা অনালোচিত থাকে। ফলে গভীর ও তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গিমার অন্তরালে যে একটা বিস্তৃত জনজীবন এবং তার কার্যকারণ সূত্র লুক্কায়িত থাকে তা হরহামেশাই বাদ পড়ে যায়। কিন্তু সেই প্রকরণের যে কোনো মূল্য নেই তা বলা একেবারেই নিরর্থকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ প্রকাশভঙ্গি কিংবা বয়ানের পরিবর্তনও উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমায়ত পরিবর্তন ও উন্নয়নের মৌল শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ যে প্রকরণরীতি ব্যবহার করেন তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিল্পের করণকৌশল এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে; আর সেক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার তো নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ আকরম হোসেনের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

> আধুনিক উপন্যাসের শব্দনির্বাচন মূলত চেতনা, অনুধ্যান ও অস্তিত্ব-উপাসনার বিষয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপন্যাসে শব্দ উৎসারিত হয় ঔপন্যাসিকের সমগ্র মনের গভীর-গভীরতর চেতন-অচেতনকেন্দ্র কিংবা স্মৃতি-উৎস থেকে এবং সৃষ্টিকর্মে সে-সব শব্দ সক্রিয় হয় অনুসূক্ষ্ম মেধায়, আবেগে-অনুভবে। (সৈয়দ আকরম, ২০২০ : ৮২)

সৈয়দ আকরম হোসেনের এই মন্তব্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গিই প্রধানতম এর বৈশিষ্ট্য। কারণ উইলিয়াম জেমসের বিখ্যাত মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ *প্রিন্সিপলস্‌ অব সাইকোলজি (Principles of Psychology, 1890)* প্রকাশিত হওয়ার পরই মূলত পুরোনো উপন্যাস-বয়ান-কৌশল (Narration-Technique) বদলে যেতে থাকে। নতুন নতুন উপন্যাস এই পুস্তক-পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম জেমস জয়েসের (James Augustine Aloysius Joyce, 1882-1941) *ইউলিসিস* (*Ulysses, 1922*) ও ভার্জিনিয়া উলফের (Adeline Virginia Woolf, 1882-1941) উপন্যাস *মিসেস ড্যালওয়ে* (*Mrs Dalloway, 1925*)। বিশেষ করে ইউলিসিস। যে উপন্যাসের বয়ান কোনো প্রথাগত ধারাবহিক আর কৌলিক বর্ণনা কৌশল মানে না। নির্মিত হয় একটা চৈতন্যপ্রবাহরীতির আখ্যান বর্ণনা-কৌশলের মাধ্যমে। আসলে আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপনরীতিটাই বিশেষভাবে জরুরি– অর্থাৎ উপস্থাপন-রীতি গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে, বিষয়ের চেয়ে। কিন্তু তিনি কেবল উপস্থাপনরীতিরই ভিন্নতা এনেছেন তা নয়। তাঁর উপন্যাসে বিষয় হিসেবে যে সমস্ত বিষয় তিনি একত্রিত করেছেন তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয় যেমন সক্রিয় থেকেছে তাঁর প্রথম উপন্যাস *লালসালু*তে, তেমনি সক্রিয় থেকেছে পরবর্তী চৈতন্যপ্রবাহরীতিকে ভিত্তি করে নির্মিত উপন্যাস-আখ্যানে।

নয়নচারা গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে; সেই গল্পগ্রন্থের টেকনিক কিন্তু 'আধুনিক' আর চৈতন্যপ্রবাহরীতির। ফলে বলার জো নেই যে তিনি এ ব্যাপার একেবারেই ফ্রান্সে গিয়ে আমদানি করেছেন তাঁর সাহিত্যে। সবচেয়ে বড়ো বিষয় তাঁর গভীর পাঠাভ্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ছিলেন "এক সর্বভুক পাঠক।" (আন মারি, ২০১২ : ৩৮) তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়তেন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্‌ খোঁজখবর রাখতেন এবং সেসব বই-পুস্তক সংগ্রহ করে পড়তেন। বিশেষ করে

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আগ্রহ। এছাড়া রুশ, ফরাসি, আইরিশ, আমেরিকান, ইতালিয়ানসহ নানান দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্য যেমন তিনি পাঠ করেছিলেন; তেমনি ক্লাসিক, রোমান্টিক কিংবা বাস্তববাদী সাহিত্যের প্রতিও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। (আন মারি, ২০১২ : ৩৮-৪৪)

কিন্তু প্রকরণ এবং বিষয়ে একেবারেই স্বচ্ছতার কারণ কী কী ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*তে? এরও কারণ নির্মাণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনী ঘাটলেই স্পষ্ট হয়ে পড়বে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র কলকাতায় বসবাসের ইতিহাস এবং সেখানকার শিল্প-সাহিত্যের কৌলিক বয়ান-কৌশল (Lineal Narration Technique) তাঁকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই প্রভাবই ওয়ালীউল্লাহ্‌ *লালসালু*তে উপস্থাপন করেছেন। ফলে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত *লালসালু*র সাথে যোজন যোজন পার্থক্য নির্মাণ করেন সমালোচকরা। কিন্তু কী নিদারুণ দুঃখের বিষয় যে, এই পার্থক্য কেবলই প্রকরণে, নিজের [ওয়ালীউল্লাহ্‌র] সাহিত্যে-যাপন-অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত। ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) প্রথম উপন্যাস *জননী* (১৯৫৮) পাঠের বেলায় যে সমস্ত কথা বলতে চাননি, তা ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস-চিন্তায় সক্রিয় থেকেছে। এ বিষয়ে আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ বলছেন,"তবে ওর মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার গ্রামের মানুষদের নিয়ে লেখা। ওয়ালী হয়তো আধুনিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। তবে এগুলো ও প্রয়োগ করেছে নিজ দেশের পরিস্থিতিতে।" (আন মারি, ২০১২ : ৫৪-৫৫)

পরিশেষে এই কথা বলতেই হয় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস গভীরভাবে সমাজ-সম্পৃক্ত। সামাজিক নানা বিষয় উপস্থাপনের বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন। বিশেষ করে এই বিষয়াদি সম্পন্ন হয়েছে পূর্ব-বাংলার সমাজ-কাঠামোয়, অন্য অঞ্চলে নয়। ওয়ালীউল্লাহ্‌ এই সমাজ উপস্থাপন করতে গিয়ে পূর্ব-বাংলার ধর্ম-চৈতন্যের গভীর ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক বিবরণ, ভৌগোলিক বিবরণের মাধ্যমে জনমমানসে ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত নানা প্রভাব স্পষ্ট করেছেন। আধুনিক সাহিত্যে বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়ায় "আধুনিক লেখক সম্প্রদায় নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন শিল্পকলায় মানবিক উপাদানের অনুপ্রবেশ।" (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৫ : ২০) স্পেনদেশীয় দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিক হোসে অর্তেগা ঈ গাসেৎ (José Ortega Y Gasset, 1883-1955) আধুনিক শিল্প সম্পর্কে যে মতামত দেন, তার দেশনা যেমন জনজীবনের সাথে সম্পর্কহীন; তেমনি "আধুনিক শিল্পকলা যে আপামর সাধারণ উপভোগ করতে পারে না এতে বোঝা যায় যে এর প্রেরণাপুঞ্জ সর্বজনীনভাবে মানবিক নয়।" (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৫ : ১৩)

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতা এনেছেন তাঁর উপন্যাসে। প্রকরণ হিসেবে আধুনিক হলেও ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে গভীরভাবে মানবিকীকরণ প্রক্রিয়াই অনুসরিত হয়েছে। গাসেৎ-অবলম্বিত বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়া 'আধুনিক' সাহিত্যের বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তা সক্রিয় থাকেনি ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে। গভীরভাবে জনজীবন-সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে *লালসালু* উপন্যাস এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ (Anne Marie Waliullah, 1929-1997) রচিত *আমার স্বামী ওয়ালী* গ্রন্থের বর্ণনাও এই সত্য উপস্থাপন করে যে, ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। এবং ব্যক্তিজীবনের নৈঃসঙ্গতা আর উন্মূলতা সত্ত্বেও গভীরভাবে চিন্তা-

ভাবনা করতেন নিজের জন্মভূমি সম্পর্কে। (আন মারি, ২০১২ : ১৩-১৮) আর তাঁর উপন্যাসে এসবেরই উপস্থাপনে প্রয়াসী থেকেছেন সবসময়; *লালসালুর* ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তাই বলতে হয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র, "যাবতীয় রচনাকে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা চলে বলে আমার ধারণা : এক দিকে তিনি বাস্তব জগৎসংসারের অভিজ্ঞতা ছেনে তৈরি করেন দুনিয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবনসত্যকে; অন্য দিকে তিনি ঐ অভিজ্ঞতার সারাৎসার বুনে দেন অস্বচ্ছ এক মায়াবী জগতের মাটিতে যেখানে কুসুম ফুটে ওঠে প্রতীকে ও ব্যঞ্জনায়।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ভূমিকাংশ : ২০১৭) আদতে এটাই সত্য, ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য-পাঠের বেলায়। আর এক্ষেত্রে প্রথমাংশ– 'দুনিয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবনসত্যকে'– উপস্থাপন করেছেন *লালসালুতে*। কিন্তু তা কেবল পির-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি ওয়ালীউল্লাহ্‌। একইসাথে তৎকালীন পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ বিষয়-আশয়ের সাথে এই উপন্যাস সম্পৃক্ত থেকেছে। ফলে কেবলই যে 'পির-সমাজের ভণ্ডামি' আর 'মজিদ চরিত্রের বিকাশ-প্রক্রিয়া'-ই কেবল আলোচিত বিষয় নয়, এই উপন্যাসে– এরই সাথে সাথে আরও নানান বিষয় : রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় চৈতন্য, ধর্ম ও ক্ষমতাকাঠামো, সাংস্কৃতিক দূরত্ব, কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত অনুষঙ্গ, নারীমুক্তি-প্রয়াস, পূর্ব-বাংলার মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসসহ নানান বিষয় সক্রিয় থেকেছে এই উপন্যাসে।

টীকা

১. ইউটোপিয়া (Utopia) একটি গ্রিক শব্দ– যার অর্থ কোথাও নেই (Nowhere)। ইউটোপিয়ান রাষ্ট্র কেবল কল্পনায়-ই সত্য। বাস্তবে এমন রাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন টমাস মোর (Thomas More, 1478-1535)। টমাস মোর ১৫১৫ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন; এবং প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন ১৫১৬ সালে। তৎকালীন ইংল্যান্ডের নানা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তার নিন্দা-জ্ঞাপন করেছেন প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে এক কাল্পনিক দ্বীপের কথা বলেছেন, যেখানে সবদিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : টমাস মোর (১৯৮১)। *ইউটোপিয়া* [*Utopia*-এর অনুবাদ], (প্রথম সংস্করণ)। অনুবাদ : মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৭-২০

২. 'ব্যবসায়ী ইংরেজ সরকার' বলতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকেই (East India Company) বোঝানো হচ্ছে। সিপাহি বিদ্রোহের (The Sepoy Mutiny, 1857) আগ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) ভারত শাসন করেছে। যা ইতিহাসে 'কোম্পানি আমল' (১৭৫৭-১৮৫৭) হিসেবে পরিচিত। সিপাহি বিদ্রোহের পরপরই কোম্পানি এই নিয়ন্ত্রণ হারায়; নিয়ন্ত্রিত এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ভারতের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করেন মহারানি ভিক্টোরিয়া। এ বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : Shashi Tharoor (2016). *An Era of Darkness : The British Empire in India*. Aleph Book Company, New Delhi. p. (xiii-xv)

৩. জব চার্নক (Job Charnock, 1630-1692/93)-এর মৃত্যু-সাল নিয়ে দ্বিমত আছে। বাংলাদেশের জাতীয় কোষগ্রন্থ *বাংলাপিডিয়ার* ভুক্তি-তথ্যানুসারে জব চার্নকের মৃত্যু-সাল ১৬৯২। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া *ব্রিটানিকা* অনুসারে জব চার্নকের মৃত্যু-সাল ১৬৯৩। এ বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : ১. Retrieved from : https://www.britannica.com/biography/Job-Charnock. ২. সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (২০১২)। ভুক্তি : "চার্নক, জব", *বাংলাপিডিয়া (চতুর্থ খণ্ড)*। এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৩৯ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন ১৯৪১ সালে। বিএ পাস করেন ১৯৪৩ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনে তিনি ইংরেজি দৈনিক *স্টেটসম্যান*-এ চাকরি করেছেন। ফলে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইংরেজি ভাষাজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করা অবান্তর। তাঁর ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে আরও স্পষ্ট হওয়া যায় *কদর্য এশীয়* (*The Ugly Asian*), *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* (*How Does One Cook Beans*) উপন্যাস-পাঠের পর। এই বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : ১. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন (১৯৯০)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক*। মুক্তধারা, ঢাকা। পৃ. ১৯-৩১ ২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৮)। সাজ্জাদ শরিফ লিখিত 'ভূমিকাংশ', *কদর্য এশীয়* [*The Ugly Asian*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : শিবব্রত বর্মন, অবসর, ঢাকা।

সহায়কপঞ্জি

আকবর আলি খান (২০১৯)। *বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১২)। *আমার স্বামী ওয়ালী* [*Wali, My Musband, as I Saw Him*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (২০১৪)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*। চারুলিপি, ঢাকা।

আবদুল বাছির (২০১২)। *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আশরাফ সিদ্দিকী (২০১০)। *কিংবদন্তীর বাংলা*। সালমা বুক ডিপো, ঢাকা।

উইলিয়াম ডব্লিউ হান্টার (২০১৮)। *পল্লীবাংলার ইতিহাস* [*The Annals of Rural Bengal*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : ওসমান গনি, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

জেমস ওয়াইজ (২০০০)। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ* [*Notes on thd Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*-এর অনুবাদ]। অনুবাদ : ফওজুল করিম (সম্পা. মুনতাসীর মামুন), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

তীর্থংকর রায় (২০১৭)। *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৯৭)। *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। 'বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী', *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শাহীদা আখতার (১৯৯২)। *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৭১)*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সরদার ফজলুল করিম (২০১৬)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০২০)। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১২)। *উপন্যাসসমগ্র*। সম্পাদক : হায়াৎ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৭)। *গল্পসমগ্র*। সম্পাদক : হায়াৎ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৮)। *কদর্য এশীয়*। অনুবাদ : শিবব্রত বর্মন, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সোহানুজ্জামান (২০১৬)। 'অ্যাবসার্ড নাটক : বাইরে, ঘরে'। *দ্বীপজ* (ঈদ সংখ্যা), [সম্পা. সাব্বির আলম চৌধুরী], ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। 'শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ', *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। 'ভাষা-আন্দোলন-পূর্ব (১৯৪৭-১৯৫২) বাঙলাদেশের সাহিত্যে বিধৃত সমাজের রূপ : বাঙালির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ', *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির (২০১৫)। *বাঙলার কাব্য* [আনিসুজ্জামান সম্পাদিত]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Karen Armstrong (1993). *A History of God : From Abraham to the Present : The 4000-year Quest for God*. Vintage Books, London.

T. Macaulay, Babington (2nd February, 1835). 'Minute on Indian Education'. Retrieved from : http://home.iitk.ac.in/~hcverma/Article/Macaulay-Minutes.pdf.

Sarah Elizabeth Titcomb (1889). *Aryan Sun-Myths : The Origin of Religions*. Nims and Knight Publication, New York.

রবীন্দ্রনাথের *কালান্তর* : বিষয়ভাবনার গুরুত্ব

সুলতানা রাজিয়া*

[সারসংক্ষেপ : *কালান্তর* গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রাজ্ঞ অভিব্যক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষ ও বিশ্বের সামসময়িক প্রসঙ্গ তাঁকে ভাবিয়েছিল, পারিপার্শ্বিকের নানা সংকট বা অসংগতিও। এক্ষেত্রে অন্য কারো যুক্তি অনুসরণ না করে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে তিনি তাঁর কথা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। *কালান্তরে* সংকলিত প্রবন্ধগুলোতে যুগগত সমস্যাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। শুধু ভারতীয় রাজনীতি নয় নিখিল বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরেছেন। সেসময় ভারতবর্ষের রাজনীতির পটভূমিকাও তৈরি হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে। তবে কেবল রাজনীতি নয় সমাজ সমস্যার নানান ভাবনা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর মননশীল লেখনীতে। 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলোর মতামতসমূহের কয়েকটি ভাবনাকে এই গবেষণা প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে (বিশ্বভারতী, ১৩৯৬) চোদ্দটি এবং সংযোজন অংশে এগারোটি সহ মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ 'কালান্তর' হিসেবে সংকলিত হয়েছে। অন্যদিকে ৩২টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *কালান্তর* (২০১৭) গ্রন্থে। এগুলো যথাক্রমে– 'কালান্তর' (১৩৪০), 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (১৩২১), 'লোকহিত' (১৩২১), 'লড়াইয়ের মূল' (১৩২১), 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪), 'বাতায়নিকের পত্র' (১৩২৬), 'শক্তিপূজা' (১৩২৬), 'সত্যের আহ্বান' (১৩২৮), 'সমস্যা' (১৩৩০), 'সমাধান' (১৩৩০), 'শূদ্রধর্ম' (১৩৩২), 'বৃহত্তর ভারত' (১৩৩৪), 'হিন্দুমুসলমান' (১৩২৯), 'নারী' (১৩৪৩), 'কর্মযজ্ঞ' (১৩২১), 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (১৩২৪), 'চরকা' (১৩৩২), 'স্বরাজসাধন' (১৩৩২), 'রায়তের কথা' (১৩৩৩), 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' (১৩৩৩), 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' (১৩৩৬), 'হিন্দুমুসলমান' (১৩৩৮), 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' (১৩৩৮), 'নবযুগ' (১৩৩৯), 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' (১৩৪৪)। এছাড়াও 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩২৪), 'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮), 'কনগ্রেস' (১৩৪৬), 'দেশনায়ক' (১৩৫৩), 'মহাজাতি-সদন' (১৩৪৬), 'প্রলয়ের সৃষ্টি' (১৩৪৪), 'আরোগ্য' (১৩৪৭) এবং 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮)। সব মিলে ৩৩টি প্রবন্ধ 'কালান্তর' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে।

'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলোর মতামতসমূহ কবির নিজস্ব। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীর বাইরে গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠের জন্য কিংবা অন্যের অনুরোধে। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* দ্বাদশ খণ্ডের পরিশিষ্টে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী* দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭২২-৭২৯)। যেমন, 'সত্যের আহ্বান' তিনি পাঠ করেন কলকাতার এক জনসভায়। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় এটি লেখা। 'সমস্যা'-ও এক জনসভার বক্তৃতা। 'সমাধান'-এ তিনি শিক্ষার ওপর জোর দেন। তবে যেকোনো শিক্ষা নয়। আত্মসচেতন হবার ও আত্মশক্তি অর্জনের শিক্ষা। 'শূদ্রধর্মে' ন্যক্কারজনক এক বাস্তব কাণ্ডে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

তিনি যে ক্ষুব্ধ হন, তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কর্মযজ্ঞ' ১৩২১-এ কলকাতা সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'-র সভায় দেওয়া তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার সারমর্ম। ১৯৩১ সালে হিজলি জেলখানার ওয়ার্ডার ও রক্ষীদের গুলিতে বেশ কিছু বন্দি স্বাধীনতা-সংগ্রামীর মৃত্যু হয়। প্রায় একই সময়ে চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী স্বাধীনতাকামীদের অভ্যুত্থান ঘটে। তাতে তাঁদের ওপর ব্রিটিশরাজের অকথ্য নির্যাতন নেমে আসে। এই দুই ঘটনার প্রতিবাদে ওই বছর ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা গড়ের মাঠে এক বিশাল প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় তিনি যে ভাষণ দেন, তার ওপর ভিত্তি করে 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' এই রচনাটি লেখা। 'নবযুগ' ও 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' কবির শান্তিনিকেতনে দেওয়া ভাষণের ওপর ভিত্তি করে রচিত। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি প্রথমে কালান্তরে ছাপা হলেও এটি পুস্তিকাকারে আগে ছেপে বের হওয়ার পরে তা 'কালান্তর' বই থেকে বাদ দেওয়া হয়। স্বাধিকার আন্দোলনে অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে গ্রেফতার হন। তার প্রতিবাদে কলকাতায় জনসভার আয়োজন করা হলে মাদ্রাজের বিষয় নিয়ে কলকাতায় মন্তব্য বে-আইনি, এই অজুহাতে তৎকালীন সরকার তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তারই প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে এই রচনা।

গান্ধীর কর্মপন্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদমুখর হয়েছেন *কালান্তর*-এর 'সত্যের আহ্বান' (কার্তিক, ১৩২৮), 'চরকা' (১৩৩২) ও 'স্বরাজসাধন' (১৩৩২)– এই তিনটি প্রবন্ধে। অর্থাৎ এখানে গান্ধীজির সঙ্গে মতাদর্শগত ব্যবধান নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন। ছয়টি রচনায় সরাসরি অথবা তির্যকভাবে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তাঁর মাথা-ব্যথার কারণ। নারী-প্রসঙ্গ এসেছে দু'টোতে। আত্মশক্তির উদ্বোধনের আহ্বান শোনা যায় বেশ ক'টিতে। এছাড়া আছে রায়তের কথা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, এবং বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আরও কিছু উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। তাঁর সব কথা এখনও প্রাসঙ্গিক' (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : চৌদ্দ)।

রবীন্দ্রনাথের দেশ-কাল চিহ্নিত করেছেন সৈয়দ আকরম হোসেন, যা 'কালান্তর' রচনার পটভূমি বিশ্লেষণেও প্রযোজ্য– 'দেশীয় ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তশৃঙ্খলিত সামন্ত অর্থনীতিনির্ভর বাংলার স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতার নবমানবের বিচিত্র কর্মকাণ্ড, উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন, হিন্দুমেলা, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রিয়া-কর্ম, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী প্রতিবাদ, অসহযোগ আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক সংকট, স্বরাজ-আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা– রবীন্দ্রজীবন পরিসরে বিশেষ গুরুত্ববহ' (সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৩৮৮ : ২৭)

নামকরণ

কালান্তর শব্দের অর্থ একটা যুগের অতীত হয়ে নতুন একটা যুগের বা কালের আগমন। রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৯২৯-১৯৩৪, এই পর্বে ...'বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখে ভারত আজ অত্যন্ত চঞ্চল; রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাকে 'কালান্তর' নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ একটি যুগের অবসানে নূতন যুগের আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণ' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৪১৭ : ৫২৬)। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'কবি এখন ভাবানুভূতির এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যখন একবার স্থির হইয়া এই ঐতিহাসিক বোধের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা

এ পর্যন্ত সঞ্চিত হইয়াছে। তাহার সবটা জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখার একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিল, এবং সে ইচ্ছা রূপান্তরিত হইল কালান্তরের সমাজ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে (১৯৩৭)' (নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৬৯ : ১৮২)। অপর একজন গবেষক বলেছেন, 'কালান্তরে এসে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে,...। কালান্তরের কোনো প্রবন্ধই শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ওপর থেকে এবং ভেতর থেকেও নিঃশঙ্ক চিত্তে তিনি বুঝে ওঠার চেষ্টা করেছেন। যা তার কাছে অসত্য বা অন্যায় মনে হয়েছে তার সঙ্গে এতটুকু আপস করেননি। কিন্তু এ কোনো অভাবিতপূর্ব ব্যাপার নয়। ব্যক্তি ও সমাজের বাস্তব সমস্যা নিয়ে, ও তাদের কল্যাণ ভাবনা নিয়ে তিনি আগেও সরব হয়েছেন। তর্ক-বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েছেন' (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : আট)

তিনি আরো লিখেছেন– 'কালান্তর রবীন্দ্র-মানসের একটি কালপর্ব নির্দেশ করে। এবং বইটির প্রকাশকাল মাথায় রেখে তাকে চিনে নিই। স্পষ্টত বলা না হলেও যেন এইটিই তাঁরা (গবেষকরা) বোঝাতে চান যে কবি এখানে ব্যতিক্রমী, সাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তর্কপ্রবণ হয়ে উঠেছেন, যা ওই বিশেষ সময়ে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সত্যান্বেষণের পরিণাম। এই সত্য অবশ্য অতি-প্রাকৃত নয়। দ্বন্দ্ব-মুখর আঙ্গিনায় প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা তাকে রূপ দেয়। তা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের শুধু নয়। সমষ্টিরও। এবং এই সমষ্টি তৎকালীন ভারতবর্ষীয় জনগণ, যাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধের বিস্তার উপমহাদেশের সীমানা ছাড়ায়। অনেক সময় নিজেদের দেখা য়োরোপের সাপেক্ষে। তাতে উত্তমর্ণ-অধমর্ণের আপেক্ষিকতা মানস-ভুবনে ছায়া ফেলে। সত্যান্বেষণের পশ্চাৎপট তারা চিনে নিতে ভুল করেন না। কবির সত্য দৃষ্টি ও সৎ বাক্য তাঁদের অভিভূত করে। কিন্তু কালের মাত্রাজ্ঞানে অতিসরলীকরণ যেন হানা দেয়। সংকলনের প্রবন্ধগুলোর প্রথম প্রকাশকালের দিকে তাকালে বিষয়টি বোধহয় স্পষ্টতর হয়' (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : নয়)

লেখাবাহুল্য, কালান্তরের প্রায় সব প্রবন্ধই সমসাময়িক কোনো ঘটনায় বা নির্দেশনায় তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পরিণাম। উর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যায় বসে, অথবা দিব্যচক্ষুতে বিশ্বদর্শন করে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে তিনি বাণী দেন, এমন নয়। কোনো কিছুই তর্কাতীত নয়। এবং এখানে সব রচনাই বস্তু-জগতের মুখাপেক্ষী। (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : এগারো)।

'কালান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত মুক্তবুদ্ধিকে আশ্রয় করেছেন' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ৭২)। নাম প্রবন্ধ 'কালান্তর' রচনার সমকালীন পটভূমি নিয়ে বলা হয়েছে এভাবে– ১৯৩৩ সালের আগের বছরগুলোতে 'রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রযোগে কিছু কিছু করিয়া সব খবরই জানিতে পারেন। সভ্যতা-সংস্কৃতি, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য– সব কিছুই এক মহাবিপর্যয় ও সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে, কবি মর্মে মর্মে ইহা উপলব্ধি করিয়া অশান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দেশের ও বিশ্বের সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া এই সময়ই তিনি সুবিখ্যাত 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন (পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৪০)' (নেপাল মজুমদার, ১৯৯১ : ৩০৯)। স্বকালের এই পটভূমি কমবেশি অন্যান্য প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। এমনকি 'কালান্তর'-এর পরে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। 'ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর চরম মত ব্যক্ত হয় ১৩৪০ এবং ১৩৪৮ সালে যথাক্রমে 'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ১২০)। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান

সম্পর্ক, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার প্রসঙ্গ এবং সংস্কার মুক্তির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনন্য সব বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় 'কালান্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায়। প্রধানত রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং স্বাধীনতা ও সংস্কার মুক্তির প্রসঙ্গ এই গবেষণা প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীরকম অসাধারণ সমাজ ও কালসচেতন ছিলেন, তা তাঁর প্রবন্ধসমূহে উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের সংজ্ঞানির্মাণের, তাদের কার্যক্রমের বর্ণনা দানের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের সত্তা এবং সমাজতাত্ত্বিকের তীক্ষ্ণ মেধা তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্যে লক্ষণীয় বিষয়। জাতিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা থেকে তিনি লক্ষ করেছেন পশ্চিমের দেশগুলো রাষ্ট্রতন্ত্র নির্ভর, প্রাচ্যের দেশগুলোর নির্ভর স্থল হলো সমাজ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুস্থ চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন জরুরি এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে এই সমন্বয়ের কথা চিন্তা করেছেন। সমন্বয় ও সামঞ্জস্য এই দুইনীতিকে তিনি তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তায় মান্য করেছিলেন, কিন্তু ইউরোপীয় 'নেশন সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না, বরং তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন 'ভারতবর্ষীয়' সমাজের ওপর। 'কালান্তরে'র (১৯৩৭) বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত ভাবনার কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশের পরিচয়টি পাওয়া যায়। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৫-৬৭৯)। তবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে আরও নানামুখী চিন্তার বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় 'রাজা-প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থে।

ভারতবর্ষে ছিল সমাজশাসন। পল্লি শাসিত হতো মাতুব্বরদের দ্বারা; জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপে। শিক্ষা ও চিন্তানুশীলনের জন্য যাত্রার আয়োজন করা হতো। ফলে পল্লি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু ইংরেজ এসে এই সমাজ শাসন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে যে 'নেশন' তত্ত্ব আছে তাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন ১৯০১ সালে। এদেশের ধর্ম, সমাজ কিছুই নেশনের প্রাধান্যকে স্বীকার করে না বলে তিনি পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রতন্ত্রকে পুনর্মূল্যায়ন করলেন স্বদেশের পটভূমিতে। তিনি স্বদেশের জন্য যে নেশন কামনা করেছিলেন তার নাম 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সমাজ ছিল সকলের চেয়ে বড়ো, সেই কল্যাণকামী সমাজকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। গবেষকের মতে, 'মানুষের পুঞ্জীভূত মানবিক গুণের সমাহার দিয়ে সামাজিক মানুষের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের মূল কথা' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৩ : ২৯)

রবীন্দ্রনাথ এই সমাজকে ব্যাপকতর অর্থে পল্লিসমাজ বলেছেন এবং পল্লিসমাজ গঠনই হলো তাঁর সমাজচিন্তার মূল দিক। পল্লি পুনর্গঠন করে তিনি যে একটি অত্যুন্নত রাষ্ট্রাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা সমকালে সম্ভব ছিল না। তিনি অনুভব করলেন যুগধর্মবশত সমাজ পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে, এদেশের সমাজও বদলাচ্ছে। তবে ইউরোপের নকলে পরিবর্তন তিনি চান না, ইউরোপের শিক্ষা চান। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৩-৫৪৮)। প্রবন্ধে প্রচলিত সমাজের নিয়ম রক্ষার বাড়াবাড়িকে আঘাত করে অগ্রসরতার স্বপক্ষে প্রবলভাবে মত দিলেন। সমাজে প্রাণ প্রবাহ বিস্তারের জন্য তিনি যৌবনের পক্ষে

যুক্তিবিস্তার করেছেন এবং কামনা করেছেন 'তারুণ্যের জয় হোক' বলে। নতুন সমাজ নির্মাণে যৌবনধর্মের ভূমিকা 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' (১৩২১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৮-৫৫৩) প্রবন্ধে বলেছেন মানুষের মধ্যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ব্যবধানটা 'সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ' দিয়ে ঢেকে দেওয়া। সমাজকে তিনি দুশ্রেণিতে বিভক্ত করলেন, 'ভদ্র সমাজ' ও 'লোকসাধারণ'। আত্মচেতনার অভাবেই লোকসাধারণ উৎপীড়িত হচ্ছে, জমিদার, মহাজন, মনিব, পুলিশ, গুরুঠাকুর, মুক্তার সকলের দ্বারা। এই উৎপীড়ন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দুই শ্রেণির মধ্যে যোগাযোগ কামনা করেছেন, 'অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই। লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫২)। লেখাপড়ার মাধ্যমে তারা পরস্পরকে বুঝবে ও বুঝাবে। তিনি অশক্তদের শক্তিলাভের প্রয়োজন বোধ করেছেন। অশক্তদের সম্পর্কে বলেছেন, 'রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মত হইবে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫২-৫৫৩)। এ উক্তির কাল ১৯১৪ সাল। এতদিন তিনি সব দায়িত্ব তুলে দিচ্ছিলেন সমাজের হাতে, এবার দিলেন রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরে।

'লড়াইয়ের মূলে' (১৩২১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৩-৫৫৫) প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের সমাজ বিশ্লেষণ করে যুদ্ধের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন– 'প্রভুত্বই যত-কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৪)। মানবতাবাদী দৃষ্টিতে তিনি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পূর্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ বাঁধত 'শস্ত্রে ও শাস্ত্রে'। কিন্তু বর্তমানে 'বৈশ্যরাজক' যুগের পত্তনে বাণিজ্যের সাথে সাম্রাজ্যের মিলনে বণিক মানুষকে পণ্যে পরিণত করতে চায়।

যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা বিমুখ রবীন্দ্রনাথ 'কর্মযজ্ঞ' (১৩২১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২৯) প্রবন্ধে মানুষের উন্নতি সাধন করতে চেয়েছেন প্রেমে। ইউরোপের যুদ্ধ তাঁর কাছে যন্ত্রপ্রাধান্যের ফল। ১৩২৪ সালে এ দেশের বিশৃঙ্খলার মূলে তিনি দেখলেন সরকারি যান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে। 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৫-৫৬৮) প্রবন্ধে তাই তাঁর কাম্য আনন্দ গৌরব প্রাণময় মানুষ। যান্ত্রিকতা বিদেশি সরকার কর্তৃক আরোপিত বলেই যে নিন্দনীয় তা নয়, দেশের নেতারাও যখন দেশবাসীকে যান্ত্রিকভাবে কাজ করতে আহ্বান করেন, তখনও তিনি তার বিরোধিতা করেন– 'দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়ভার দেশের বুকে চাপিয়া বাসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতি হিসেবে নিন্দনীয়' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৮)। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'য় সামাজিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে' (১৩২৪) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭) তা আরও প্রাবল্যের সাথে প্রকাশ করলেন। তিনি দেখলেন, দেশে আত্মবুদ্ধি-চেতনা ও যুক্তির অভাব। সবাই চিরাচরিত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি ইউরোপের মতো ধর্মতন্ত্র ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি কামনা করলেন। 'বাতায়নিকের পত্রে' (১৩২৬) ইউরোপের রাজনীতিকে তিনি বলেছেন, 'শক্তিপূজা' ভারতেও তার ঢেউ লেগেছে। কিন্তু তাঁর কাম্য–

শান্তি ও অমৃত। হানাহানির মূলে তিনি দেখলেন লোভ, 'লড়াইয়ের মূলে' যেমন দেখেছেন প্রভুত্ব। 'যতক্ষণ এই লোভ আছে, ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীসকনফারেন্সের এমন শক্তি নেই' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৭৪)

'সত্যের আহ্বানে' (১৩২৮) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৫) কামনা করলেন মৌমাছি তান্ত্রিকতামুক্তি, চিরাভ্যাসের গণ্ডিচ্ছেদন। তিনি স্বদেশ সৃষ্টি করতে চান 'হৃদয়বৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'ইচ্ছাশক্তি', অর্থাৎ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা। এই ত্রিশক্তির যোগই পূর্ণশক্তির যোগ, পলিটিকেল বা ইকনমিক যোগ, তাঁর কাছে, পূর্ণশক্তির যোগ নয়। যোগ সাধনের অধিকার তিনি মহাত্মাজির মধ্যে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর আহ্বান সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তাঁর চরকা কাটা নীতি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। যে কালে কলে কাপড় তৈরি হচ্ছে সেকালে চরকা কাটা অর্থহীন। আবার কাপড় পোড়াবার নীতিরও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন দু'কারণে। প্রথমত : চোখ বুজে হুকুম মানার বিপত্তি থেকে তিনি দেশকে উদ্ধার করতে চান, দ্বিতীয়ত : দেশের অধিকাংশ লোকের যেখানে কাপড় নেই সেখানে তিনি কার কাপড় পোড়াবেন? রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, সবচেয়ে বড়ো ও জরুরি লড়াই হচ্ছে মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যদি শিক্ষার সাহায্যে সবকিছু বুঝে নিতে না পারা যায় তাহলে মূঢ়তা আমাদের গ্রাস করবে।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা' করার কথা বলেছেন। 'সমস্যা' (১৩৩০) প্রবন্ধে তিনি স্বার্থপর জাতিচিন্তাকে নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন বিশ্বের সমস্ত মানুষকে এক করবার কথা। বিদেশি রাজা বড়ো সমস্যা নয়, তাঁর কাছে এদেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো 'ভেদবুদ্ধি'! কিন্তু এ সমস্যার সমাধান দিতে এসে দেখলেন 'অবুদ্ধির সমস্যা'টাই বড়ো। 'সমাধান' (১৩৩০) প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ জানালেন, 'অবুদ্ধির প্রভাবে মন দুর্বল, অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন শুধু নয়, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৯)। বিদেশি রাজার প্রস্থান বা চরকা এর সমাধান দেবে না। বুদ্ধির জাগরণে সমাধান ঘটবে। এর জন্য তিনি দরকার বোধ করলেন শিক্ষার।

'চরকা' (১৩৩২) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৩৮) প্রবন্ধে 'সত্যের আহ্বানের' মতো মনে করেছেন গান্ধীজির চরকা অযোগ্য, বুদ্ধিবিচারেও চরকা পরিত্যাজ্য, ভারতবর্ষের মিলনের উপায় হিসেবে তিনি কামনা করেছেন– ধর্মের ক্ষেত্রে মিলন হতে পারে না, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ঐক্যসাধনও সময় সাপেক্ষ। তাই জীবিকার ক্ষেত্রে মিলপত্তন করতে হবে। স্বরাজ সৃষ্টি বিষয়ে তিনি 'স্বরাজসাধন' (১৩৩২) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৬) প্রবন্ধে পূর্বের মতো আত্মশক্তির উপর জোর দিলেন। স্বরাজ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন আপন দেশকে 'আপনি সৃষ্টি করে তোলবার' অধিকার। চরকার সুতোকাটায় স্বরাজ আসবে না, স্বরাজ আসবে 'প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে' রায়তদের সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাদের বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি ও ধনহীনতার সম্পর্কে তিনি আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছেন। 'নবযুগ' (১৩৩৯) প্রবন্ধে তিনি মিলনের বাণী প্রচার করলেন, কেননা, মিলনই সভ্যতা। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৪) রবিজীবনীতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ চরকা নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক-প্রসঙ্গে 'চরকা' প্রবন্ধটি রচনা করলেন' (প্রশান্তকুমার পাল, ২০০৩ : ২৩২)। 'চরকা' প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধে গান্ধীজির আন্দোলনের অপর একটি অবাস্তব দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সমাজচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য ভারতবর্ষীয় সমাজ। ভারতবর্ষীয় সমাজের রূপ কী, কী করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে, এ বিষয়ে তিনি অক্লান্ত চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষ চিরদিন চেয়েছে সমন্বয়, মানবতা তাঁর ধর্ম, সৈন্যপণ্য নিয়ে সে বাহাদুরি করেনি। মানবীয় গুণচর্চার অবকাশ নেই বলে তিনি রাষ্ট্রকে মেনে নিতে পারেননি। ভারতীয় সমাজে ত্যাগ, মৈত্রী, কষ্টসহিষ্ণুতা, সমস্ত বৈষম্যের মধ্যেও একটি মিলনসূত্র আবিষ্কারে সদা তৎপরতা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য স্বীকার করেও এসমাজ ঐক্য সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখেছে। এজন্যে এই সুসমন্বিত শ্রেণিবদ্ধ সমাজ রবীন্দ্রনাথের কাম্য। 'চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীন দেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে' (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৬৪)। সমাজকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার মর্মবিন্দু বলে নির্দেশ করেছেন, আর তাকেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার নেশননির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না, এদেশে নেশন ছিল না, যা ছিল তা সমাজ, সমাজ সমস্ত কল্যাণাধার। কবি 'পূর্বদিগন্তের মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করে দেখেছেন যে সমাজশক্তিই এ অঞ্চলের কর্তৃশক্তি, রাষ্ট্র চিরকাল ঐ সমাজেরই অধীন' (ক্ষুদিরাম দাস, ১৯৫৮ : ১৯৫)। দেশের উন্নতি বলতে তিনি বুঝেছেন সমাজের উন্নতি। সমাজ যদি উন্নত হয়, তার মধ্যে যদি আবার প্রাণ জাগানো যায় তাহলে দেশের মুক্তি ঘটবে, এটা ছিল তাঁর উপলব্ধি। বিদেশি শাসন তাঁর কাছে বড়ো সমস্যা ছিল না, পল্লির পতনই বড়ো সমস্যা। পল্লির উন্নতিবিধান তাঁর স্বদেশচিন্তার মূলকথা। এমনকি গ্রামের শিশুদের শিক্ষার জন্যও তিনি চিন্তা করে গেছেন।(বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০২ : ৬৪)

*রবীন্দ্র-রচনাবলী*র চতুর্দশ খণ্ডে সংকলিত 'পল্লীপ্রকৃতি' (১৩৯৬ : ৩৫১) এবং 'সমবায়নীতি' (১৩৯৬ : ৩৩৩) এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি দেশ সেবায় রাজনীতি থেকে দূরবর্তী, সমাজগঠন তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে এ সমাজ গঠিত হবে নিজেদের সেবা, প্রেম ও মুক্তবুদ্ধির দ্বারা। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, 'রবীন্দ্রনাথ মূলত সমাজচিন্তাবিদ, গৌণত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এবং কোনো ক্রমেই রাজনীতিবিদ নন। তাঁর চিন্তার বিপুল স্থান অধিকার করে আছে সমাজ, সমাজের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ প্রবল, রাষ্ট্রের প্রতি নয়' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ৭৩)।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক

'কালান্তর' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ জীবনবোধের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার উচ্চারণ। ১৯১৪-১৯৩৭ সালে লিখিত প্রবন্ধগুলোর বস্তুসম্পদের মূল্য বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে চিহ্নিত করতে চাইছেন। এর ভেতর ভারতবাসী ও ইংরেজ সম্পর্ক বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'সাহিত্যে, মননে, কর্মে, ধর্মোপলব্ধিতে, সমাজসেবায় যতই বাঙালি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, ততই পশ্চিম-পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই সংযোগবাসনা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য' (শিপ্রা সরকার, ২০০৮ : ২৮)। পূর্বেই বলা হয়েছে, রাজনীতিবিদ না হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উদারমানবতাবাদী রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তাবিদ। এজন্যে তাঁর কাছে উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত শাসকের সঙ্গে স্বদেশবাসীর সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়।

কবি বাল্যকাল থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বলপ্রয়োগ ও দখলদারি নীতিকে ঘৃণা করে এসেছেন। 'পথ ও পাথেয়', 'সদুপায়', 'দেশহিত', 'ছোটো ও বড়ো', 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ',

'বাতায়নিকের পত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধে তা প্রকাশ করেছেন। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশরাজের দেয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করে বীভৎস পাশবিকতার প্রতিবাদ করলেন তিনি। অন্যায় অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামশীল পরাধীনলাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর জন্য কাতর রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বিশ্বে রলাঁ, বারবুস ও গোর্কির মতোই ভূমিকা পালন করেছেন। পক্ষান্তরে গান্ধীজির কাছে ইংরেজের পৈশাচিক দলননীতি ও পাঞ্জাবের ঘটনাবলিকে একান্তই আভ্যন্তরীণ, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হয়েছে। বরং তিনি খিলাফত সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ২৪ নভেম্বর (১৯১৯) সভাপতি হিসেবে নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনের কয়েকমাস পর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মরণ দিবস উপলক্ষ্যে কবি ইংরেজিতে একটি ভাষণ লিখে জিন্না সাহেবকে পাঠান। তার একটি অংশ– 'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবে এক মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ...তারা তাদের অভিপ্রায়মতো দুনিয়াটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলেছে' (উদ্ধৃতি, নেপাল মজুমদার, ১৯৯১ : ৪২)। 'কালান্তর' (১৩৪০) প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজের আগমনকে ইতিহাসের বিচিত্র ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমদের কাছে এসেছে যে আর কোন বিদেশি জাত কোন দিন এমন করে আসতে পারেনি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৮)। য়ুরোপের চিত্তদূত ইংরেজ লেখকের মতে আমাদের জ্ঞানের বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, উনিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতাকামীদের 'প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের অসাধারণ আস্থা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। ঊনবিংশ শতকে স্বাধীনতার সাধনা শুরু হয়েছিল কিন্তু 'য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে আমাদের 'রাষ্ট্রজাতিক রথ' এবং এতে সহায়তা করবে ইংরেজ। কিন্তু আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান শর্ত 'ল' এবং 'অর্ডার'– বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। অতএব স্বপ্নভঙ্গ হলো। তিনি যে য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিলন কামনা করেছেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৩১৫) প্রবন্ধে ইউরোপের যে আলোক শিখার প্রশংসায় তিনি মুখর হয়েছেন, বাস্তবে তাকে দেখলেন : 'য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪১)। তিনি দেখলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইংরেজ কর্তৃক আফিমক্রিয়ায় চীনের ধ্বংস, পারস্যে অত্যাচার, কংগোতে অত্যাচার, আমেরিকায় নিগ্রোদের লাঞ্ছনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্যক্ষ করলেন কোরিয়া, চীন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, তুরস্ক ও ইউরোপের অত্যাচার। তাঁর বিশ্বাস পরিবর্তিত হলো– 'একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২)। ইতালি-জার্মানি সর্বত্র বর্বরতা তাঁকে একটি বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিলো– 'মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা?' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২) তিনি ইংরেজের পীড়নে হাতজোর করে 'দিল্লীশ্বরো' বা 'জগদীশ্বরো' বলতে অনিচ্ছুক, এজন্যে মাথা তুলে ইংরেজকে বিচার করার কথা ব্যক্ত করে প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন। আসলে 'সাহিত্যের ইংরেজ মহান উদার কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অমানুষিক' (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৭৬)। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, ইংল্যান্ড ভারতকে দেখে রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির

মতো, ভারতের হৃদয় দেখে না। বরং সরকার অর্থনৈতিক শোষণে বেশি উৎসাহী। 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৩০০) প্রবন্ধে কবি বলেছেন– শাসক চরিত্রের দুটি রূপ– স্বদেশে (লন্ডনে) সংগীত শিল্পকলা শিষ্টাচার; বিদেশে (ভারতে) উলঙ্গ তরবারি এবং অসংকোচ একাধিপত্য। ভারতবর্ষে শাসক ইংরেজ অত্যাচারী, তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। তবে বিলেতের ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণ ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'অপমানের প্রতিকার' (১৩০১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪২-৬৪৭) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ইংরেজ প্রতিনিয়ত এদেশবাসীকে অপমান করছে। শিক্ষিতরা প্রতিকারের চেষ্টা করছে। এজন্য জাতির ঐক্যের প্রয়োজন। 'সুবিচারের অধিকারে' (১৩০১) এসব কথাও তুলে ধরেছেন তিনি। 'ছোটো ও বড়ো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৫) কিছু অংশ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করলেও রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে ভারতবাসী ও ইংরেজের সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইংরেজদের দু'শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। একদল প্রবলতার পক্ষে, অপরদল মনুষ্যত্বের পক্ষে। প্রথম দল ছোটো রূপে বাস করেন বিলেতে। ভারত শাসন করছে প্রবলতার পক্ষাবলম্বী দল– অর্থাৎ ছোটো ইংরেজ। শাসকরূপে এদের চরিত্র হলো ভারতবাসীর উপর আমলা সম্প্রদায়ের মত কর্তৃত্ব করা। কারণ বড়ো ইংরেজ সাগর পারে ব্যবসা করে এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতকে স্পর্শ করে না; ছোটো ইংরেজ এদের মাধ্যমরূপে কাজ করে।

বড়ো ইংরেজের খবর ভারতবাসী জানে বইয়ের পাতার মাধ্যমে, বড়ো ইংরেজ ভারতবর্ষকে জানে অফিসের দপ্তর ও জমাখরচের খাতার মাধ্যমে। তবু লেখকের বিশ্বাস 'বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে' আর 'বড়ো-ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬০)। তারা ন্যায়, সভ্যতা, স্বাধীনতা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী; ছোটো ইংরেজ তাঁদের বিপরীত।

রবীন্দ্রনাথ ছোটো ইংরেজের সঙ্গে তাঁর একটি বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, 'ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর'। অথচ তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন-উপর 'দাবি' করেছেন। অথচ এই ইংরেজ আমাদের ভাষা জানে না, 'তাদের কাছে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়'।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসনপ্রণালির সমস্যা উদ্‌ঘাটন করেছেন। দেশের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে দেশের মানুষের দায়িত্বের যোগ ও শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব কামনা করে তিনি সেই সমস্যার সমাধানও কামনা করেছেন। পরিশেষে তিনি বর্তমানের ইংরেজ শাসনের চেহারা যাই হোক না কেন পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের প্রত্যাশা করেছেন। তিনি নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন : 'আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে; অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৮)। 'ছোটো ও বড়ো'প্রবন্ধে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন কাম্য হলেও রবীন্দ্রনাথ 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (১৩২৪) প্রবন্ধে লক্ষ করলেন, ইংরেজ শাসনের দেড়শ বছরেও উভয়কে মেলাতে পারেনি। পশ্চিমের বর্বরতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি ইউরোপকে মৃত্যুশেলবিদ্ধ আখ্যা দিলেন। ইউরোপের কোনো দানের ক্ষমতা নেই বলে তিনি চাইলেন– 'ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব

না– কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৩৭)। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিকৃত চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ পেল 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' (১৩৩৮) প্রবন্ধে। হিজলী কারার দুজন রাজবন্দিকে রক্ষীরা খুন করলে রবীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন– 'বিদেশী রাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭২)। রাজবন্দির হত্যাকাণ্ড এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করা রাজাপ্রজার সুসম্পর্কের জন্যে ইতিবাচক দিক নয়। এজন্যে তিনি গবর্মেন্ট এবং দেশাবাসীকে অনুরোধ করেছেন– 'অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনি শান্ত হোক' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৩)। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। প্রচলিত দণ্ডনীতিতে তিনি দেখেছেন মানুষের প্রতি অপমান এবং 'আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা'র দৃশ্য। তাঁর ভাষায়– 'আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ডপ্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান-প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাঞ্ছিত করে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৭)। এর মূল কারণ ভারতবাসীর ইংরেজের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন।

চীনযাত্রা কালে হংকং বন্দরে চীনা ফেরিওয়ালাকে বেণী ধরে টেনে লাথি মারার ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষের অবজ্ঞা এবং তার আনুষঙ্গিক নিষ্ঠুরতা স্থায়ীভাবে এদেশের আবহাওয়াকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে। অথচ অপরাধীকে দণ্ড দেবার সভ্যনীতি আমরা ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। সেই ইংরেজ আজ বন্দিদের 'উপরে শাসনের ঝাল-মসলা প্রচুর করে তুলে তার তীব্রতা বাড়িয়ে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৮)। তুলেছে। লেখক একে সভ্যনীতি বলতে নারাজ। রবীন্দ্রনাথ দণ্ড প্রয়োগকে মান্য করেন কিন্তু অতিকৃত দণ্ড প্রয়োগকে বলেন বর্বরতা। এজন্য তিনি হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে পরিশোধ করতে না বলে সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্কারের ধারায় বিচারের কথা বলেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি নির্জনকারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসনকে সমর্থন করেন না বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে বলেছেন– 'যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসন মঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নীচে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করব' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৯)। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সর্ববিষয়ে উন্নতি চেয়েছেন। এজন্যে ইংরেজের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীরও সেবা কামনা করেছেন। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে ইংরেজের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। স্বদেশবাসীকে নিয়ে তিনি উন্নত মহৎ দেশের স্বপ্ন দেখেছেন। এজন্যই প্রাচ্যের কুটিরে মহামানবের আবির্ভাব গান গেয়েছেন। কবি ভাবগত ক্ষেত্রে ইংরেজের অগ্রগতি গ্রহণ করলেও ভারতে ইংরেজ প্রশাসনের পীড়নের বিপক্ষে ছিলেন। কারণ ইংরেজরা এদেশে শাসন করতে এসে কোনো মানবিক সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তোলে নি যা মুসলমান শাসন আমলে হয়েছিল। এজন্যে প্রীতির অভাবে ইংরেজকে নির্দয় করেছে। ফলে দেশের মানুষকে অবাঞ্ছিত শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, মনুষ্যত্বের অপমান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর সপক্ষে থেকে নির্ভীকভাবে ইংরেজদের নির্যাতনের বিরুদ্ধতা করেছেন।

'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথ কীরকম অসাধারণ সমাজ ও কালসচেতন ছিলেন, তা তাঁর প্রবন্ধসমূহে উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। 'কালান্তর' (১৩৪০) প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষীয় সমাজ, ইংরেজদের আগমন এবং

সমকালীন রাজনীতির বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতবর্ষে ছিল সমাজ শাসন। পল্লির চণ্ডীমণ্ডপেই ছিল সমস্ত কিছুর বিকাশের ধারা। কিন্তু চিন্তানুশীল, গল্প-গুজব, তাস-পাশা, দিবানিদ্রা ইত্যাদির সংকীর্ণ পরিসরের বাইরে 'মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, ...এ আমাদের গোচর ছিল না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৭)। ভারতবর্ষে বাইরে থেকে প্রথম আগমন ঘটে মুসলমানদের, কিন্তু তারাও 'আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ'। মূলত ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আমাদের মধ্যে নবযুগের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'য়ুরোপের চিন্তাদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৮)। তারা আমাদের দেখিয়েছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ। সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁরা নিয়ে এলো ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ। এতে ন্যায়ের কথা আছে, আছে কোনো বিচারে অন্যায়কারীর দণ্ড লঘু হবে না। তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে 'আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলাম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৯)

এভাবে ইংরেজ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বিশ্বের সাথে, শিখিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে। কিন্তু এসমাজ বড়ো কঠিন সংস্কারের শিকড়ে বাঁধা। শিক্ষিতজনের অনেকে 'রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করবার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে', অন্যদিকে আবার তারাই ধর্মনির্ভর ও ভাগ্যনির্ভর হয়ে 'আত্মাবমাননা স্বীকার' করে।

তবু প্রতিদিন আলোর দিকে আমাদের যে অগ্রযাত্রা তাতে রয়েছে 'য়ুরোপের প্রভাব'। বরং যেখানেই আমরা ইউরোপীয় শিক্ষা এড়িয়ে চলতে চেয়েছি সেখানেই ঘটেছে 'আমাদের পরাভব'। রবীন্দ্রনাথ এ সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন– 'এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরাজনীতির প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, 'বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতির রথ চলবে সামনের দিকে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪১)। এবং এতে সহায়তা করবে ইংরেজ। কিন্তু দেখা গেল ইংরেজ শাসনের প্রধান শর্ত "ল' এবং 'অর্ডার' বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। ফলে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধন-উৎপাদন সমস্তই তলিয়ে গেল 'ল' এবং 'অর্ডারে'র প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। ... নবযুগের সূর্য-মণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ। তিনি যে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিলন কামনা করেছেন, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক শিখার প্রশংসায় তিনি মুখর হয়েছেন, বাস্তবে তাকে দেখলেন, 'য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪১)। তিনি দেখলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইংরেজ কর্তৃক কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড এক সঙ্গে বর্ষিত হলো চীনের মর্মস্থানের উপর, পারস্যে অত্যাচার, কংগোতে ধ্বংসক্রিয়া, আমেরিকায় নিগ্রোদের লাঞ্ছনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন কোরিয়া, চীন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, তুরস্ক ও ইউরোপের 'নির্বিচার নিদারুণতা'। তাঁর বিশ্বাস পরিবর্তিত হলো– 'একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে

উঠছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২)। ইতালি জার্মানি সর্বত্র 'উন্মত্ত দানবিকতা' তাঁকে একটি বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিলো– 'মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা?' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২)। ইউরোপের এই পাশবিকতায় রবীন্দ্রনাথ হাতজোর করে 'দিল্লীশ্বরো বা জগীশ্বরো বা' বলতে অনিচ্ছুক। বরং মাথা তুলে তিনি তাদের বিচার করার কথা ভেবেছেন এবং অভিসম্পাত করেছেন 'অশ্রদ্ধেয়' বলে।

'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে'র মতো ইংরেজের প্রতি তাঁর আস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দেখিয়েছেন, যে 'দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪২)। অথচ ভারতের মতো 'অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪২)।

ইংরেজের যন্ত্রশক্তির ব্যবহার থেকে ভারত বঞ্চিত। অথচ জাপান যন্ত্রচালনার দ্বারা সম্পদবান হয়ে উঠেছে সর্বতোভাবে। ভারতবর্ষের এই নিশ্চলতার কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজকে দায়ী করেছেন– 'ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোন অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪৩)

রবীন্দ্রনাথ জাপানে যেমন দেখেছেন 'স্বজাতির মধ্যে সভ্য শাসনের রূপ', তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ায় তিনি দেখেছেন শিক্ষাবিস্তারের 'অকৃপণ অধ্যবসায়' এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যকার 'শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা'। আসলে 'সভ্যতার সংকট'-এ 'কবি চিরদিনই মানুষের বৃহত্তর ও মহত্তর– তাহার অপরাজেয় সংগ্রামী-সত্তার জয়গান করিয়াছেন' (নেপাল মজুমদার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯১ : ২৮৭)। কিন্তু ইংরেজের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন 'পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে' রাখার প্রবণতা। চীন, স্পেন যে প্রবণতার বিষে জর্জরিত। অথচ তিনি একসময় যখন ইংরেজকে 'মানব হিতৈষীরূপে' দেখেছেন তখন ভক্তি করেছেন। প্রথমে ইংরেজের ওপর কবির যে অপরিসীম বিশ্বাস ও আস্থা ছিল, কালক্রমে তা ভেঙে যায়। প্রথম বিলাতবাসে আকৃষ্ট কবি দ্বিতীয়বার বিতৃষ্ণ। ব্রিটিশদের বিষয়ে ১৮৯১ সালে যে সংশয় শুরু হল তা 'সভ্যতার সংকট'-এ (১৯৪১) চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৭৬)।

বস্তুত মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সর্ববিষয়ে উন্নতি কামনা করেছেন। 'স্বদেশের জন্যে কেবল স্বাধীনতা চাননি, চেয়েছেন সর্ববিষয়ক উন্নতি' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ১৪৫)। এজন্যে ইংরেজের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনগণের সেবাও তিনি প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংরেজদের 'নখদন্ত বিকাশে' মানবাত্মার অপমানের ফলে তিনি তাদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। স্বদেশবাসীর কল্যাণের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের 'দারিদ্রলাঞ্ছিত কুটিরে' মহামানবের আবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছেন এভাবে–

ওই মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
(*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪৫)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি সবকিছু ধারণ করতে হবে দেশীয় ঐতিহ্যের মূল্যবোধ দিয়ে। প্রাচ্যের সাধনা আত্মার সাধনা, সত্যের সাধনা। পাশ্চাত্যের সাধনা ধনের। তাদের মধ্যে রয়েছে আগ্রাসী স্বভাব। তিনি মনে করেছেন আত্মার চর্চা ও জ্ঞানের চর্চার সেতুবন্ধন ঘটালে উন্মেষ ঘটে মানবতার। যে আত্মার চর্চা অর্থাৎ মানবতার অভাবে ইংরেজ 'বিভিষিকা বিস্তার করতে উদ্যত' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪৪)। মনুষ্যত্বের এই অপমান থেকে উদ্ধার করে আলোর পথ দেখাবে পূর্বদেশের বৃদ্ধ। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় মানবতার সারসত্তার নবজন্ম চিত্রিত হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অভিব্যক্ত হয়েছে যে, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনাই স্বাধীনতার সাধনা। দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, অন্য জাতি এসে দেশ শাসন করবে সেটাই কেবল পরাধীনতা নয়, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলেও তা পরাধীনতা। দেশের স্বাধীনতা চিন্তায় তাঁর জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনার প্রসঙ্গ এসেছে এবং স্বাধীনতার কথা তিনি যখন বলেছেন, তখন ইংরেজ শাসন চলছিল, কাজেই তাঁর আলোচনায় তৎকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। 'কালান্তর'-এর 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', 'ছোটো ও বড়ো', 'বাতায়নিকের পত্র', 'সত্যের আহ্বান' ইত্যাদি প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত ভাবনা প্রকাশ করেছেন। 'সম্প্রদায়-ভেদ ও জাতিবর্ণ-ভেদ, অশিক্ষাজনিত কুসংস্কার ও সনাতনী প্রথার অন্ধ দাসত্ব, জঘন্য স্বার্থবুদ্ধি ও ঈর্ষা-দলাদলি-চক্রান্তের নীচতা থেকে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের অভিলষিত প্রাথমিক স্বাধীনতা' (ড. ক্ষুদিরাম দাস, ১৯৫৮ : ১৯৪)

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন স্ব-অধীনতা। নিজেদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরতা হচ্ছে পরাধীনতা। বিদেশি রাজা বড়ো কথা নয়। পরাধীনতা অর্থে তিনি পরমুখাপেক্ষিতা বুঝিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন আত্মশক্তিতে সুগঠিত হলে তবেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়। 'আত্মশক্তি' (১৩১২) প্রবন্ধে তিনি আত্মশক্তিসাধনের কথা বারবার বলেছেন। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৩-৫৪৮) প্রবন্ধে তিনি দেখালেন তৎকালীন সময়ে 'স্বদেশ প্রেমের বান' ডেকেছিল 'বান শব্দটার মধ্যে একটা প্রাণ প্রবাহ আছে' কিন্তু পরস্পরের ভিতর ব্যবধানের প্রাচীর থাকায় সেই 'বান'টা মিলনের পক্ষে খুব একটা কাজ করেনি। এই প্রবন্ধে সামাজিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭) প্রবন্ধে তা আরো প্রাবল্যের সাথে প্রকাশ করলেন। তিনি দেখালেন দেশে আত্মবুদ্ধি, চেতনা ও যুক্তির অভাব। সবাই চিরাচরিত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি ইউরোপের মতো ধর্মতন্ত্র ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি কামনা করলেন। তিনি সমকালের মানুষের মানসিকতা ভেবে প্রায় প্রায় শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে

দেখিয়েছেন– 'অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৫৮)। জ্ঞানকে জীবনের জন্য আপন করতে হবে। দেবতা জেনে সরস্বতীর চরণে ফুল জল দিয়ে প্রণাম করলেই চলবে না, জ্ঞানে যা পাই, যাকে সত্য বলে জানি তাকে বাস্তবে জীবনের কর্মের সাথে গ্রহণ করলেই প্রকৃতভাবে ঘটে জীবনের উত্তরণ, আত্মশক্তি সাধন।

'ছোটো ও বড়ো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন স্বাধীনতার জন্য কোনো 'শর্ট-কাট' পথ নেই। এ প্রবন্ধে তিনি হোমরুল সমর্থন করেছেন, অথচ তিনি মনেপ্রাণে এ স্বাধীনতার পক্ষে নন। কিন্তু ইংরেজরা হোমরুল দেয়নি। তারা এদেশের সমাজ শাসন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যেহেতু সমাজের শাসন নষ্ট হয়ে গেছে এখন আছে বন্ধন, আচারসর্বস্ব কতগুলো নিয়ম। ধর্মের যে আচার-বন্ধন তা মানুষের মনকে বিবেচনা করে না, বাধা সৃষ্টি করে সামাজিক মিলনে। কবির মতে ধর্ম যতদিন আচার সর্বস্ব থাকবে ততোদিন মিলন সম্ভব নয়। 'আমাদের নালিশটাই যে এই কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই'– শাসনকর্তা ইংরেজ, রবীন্দ্রনাথ যাদেরকে ছোটো ইংরেজ বলে দেখেছেন, এই ছোটো ইংরেজদের সাথে বিরোধে 'দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল' তখন তিনি আশা করেছিলেন আমাদের সমস্ত 'যুগসঞ্চিত অপরাধ', 'দুঃসহ নৈরাশ্য' বীভৎস অন্ধকার কোণ ছেড়ে পালাবে। সেই আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা'। 'পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তিকে' আশ্রয় করে দেনাপ্রীতির নামে সমস্ত দেশকে কলঙ্কিত করেছে– এর মধ্যে মহৎ আত্মত্যাগের পরিচয় যে ছিল না তা নয়। কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তিনি এভাবে– '...পোলিটকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়ে বাধাগ্রস্ত করিব না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৪)। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়– সংকটময় দুর্গমপথ অতিক্রম করে দেশের কল্যাণ করতে পারে 'দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৪)। 'বাতায়নিকের পত্র' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৮) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন 'যে দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮২)। ধর্মের আচারমগ্নতা এদেশের মানুষকে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পৃথক করে রেখেছে। মূঢ়তায় জড় হয়ে থাকার কারণে এদের কোনো ব্যক্তিগত অভিরুচি নেই, স্ব-ইচ্ছা নেই, স্ব-অধীনতা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৩)। সাধনার দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা অন্তরের মূলগত এই আচ্ছন্নতা দূর করতে পারলেই স্ব-অধীনতা লাভ সম্ভব।

'সত্যের আহ্বান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৫) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সস্তায় বাজিমাত হয় না। 'মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করে নিতে হবে' এবং এই লক্ষ্যে ধ্যান, কর্ম ও সত্যের সম্পৃক্তির মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করতে হবে। স্বদেশ সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর অভিমত– 'দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এই জন্য যে

দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৭)।

এই সৃষ্টি সাধিত হয় 'হৃদয়বৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'ইচ্ছাশক্তি' অর্থাৎ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা। এই ত্রিশক্তির যোগই পূর্ণশক্তির যোগ, পোলিটিকাল বা ইকনমিক যোগ, তাঁর কাছে, পূর্ণশক্তির যোগ নয়। যোগ সাধনের অধিকার তিনি মহাত্মাজির মধ্যে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর আহ্বান সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তাঁর চরকাকাটা নীতি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। যে কালে কলে কাপড় তৈরি হচ্ছে সেকালে চরকা কাটা অর্থহীন। আবার কাপড় পোড়াবার নীতিরও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন দু'কারণে। প্রথমত, চোখ বুজে হুকুম মানার বিপত্তি থেকে তিনি দেশকে উদ্ধার করতে চান; দ্বিতীয়ত, দেশের অধিকাংশ লোকের যেখানে কাপড় নেই সেখানে তিনি কার কাপড় পোড়াবেন? মহাত্মাজি বলেছেন– প্রেমের সত্যে আমরা এক হব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিমত, প্রেমই একমাত্র সত্য নয়, প্রেমের সঙ্গে বুদ্ধির সত্য যুক্ত না হলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হবে না। (সত্যের আহ্বান, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৯৫-৫৯৬) তাঁর মতে, সবচেয়ে বড়ো ও জরুরি লড়াই হচ্ছে মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যদি শিক্ষার সাহায্যে সবকিছু বুঝে নিতে না পারা যায় তাহলে মূঢ়তা আমাদের গ্রাস করবে। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা, প্রেম দ্বারা, কর্ম দ্বারা দেশকে গড়ে নিতে হবে, আত্মা দিয়ে জানতে হবে।

'সমস্যা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৯৭) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের সত্য মিলনে 'অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা'। অবুদ্ধি হলো পরাধীনতা। আচারসর্বস্বতা, অহেতুক অকল্যাণের ভয় অবুদ্ধির প্রকাশ। 'সমাধান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৩৯) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বুদ্ধিরূপের কর্ষণ করলেই সর্বজনীন স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। অর্থাৎ কোনো ভৌগোলিক পরিসরের নয় 'রাষ্ট্রিক বা সামাজিক' ভাবে স্বাধীনতা পেতে হবে। এর মূলে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতার জন্য আন্তরিকভাবে ভেবেছেন। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজে' সমাজোন্নয়নের পদ্ধতি দান করেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। বিদেশি শাসন তার কাছে বড়ো সমস্যা ছিল না, অবুদ্ধিই ছিল বড়ো সমস্যা। জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে মনের মধ্যে যে অবরোধ আছে তা থেকে মুক্ত হলেই পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মনের অন্তঃপুরে অন্ধকারের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টাতেই সম্ভব দেশ ও সমাজের সত্যিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

অন্ধসংস্কার মুক্তি

জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টাতেই সমাজ ও দেশের যথার্থ মঙ্গল বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯১৪-১৯৩৭ সালে লিখিত 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলোর বস্তুসম্পদের মূল্য বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, অন্য জাতি এসে শাসন করবে সেটাই কেবল পরাধীনতা নয়, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলেও তা পরাধীনতা। তিনি বলেছেন জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অন্ধসংস্কার থেকে

মুক্তিলাভের চেষ্টাতেই সমাজ ও দেশের যথার্থ মঙ্গল সম্ভব– এর মূলে তিনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। 'কালান্তর', 'লোকাহিত', 'সত্যের আহ্বান', 'সমস্যা' এবং 'শিক্ষার মিলন', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭) ইত্যাদি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

'কালান্তরে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' (১৩১২) ও 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) নামে প্রবন্ধ লিখেছেন। 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে তাঁর লক্ষ্য সমাজ গঠন এবং তিনি দেশসেবায় রাজনীতি থেকে দূরবর্তী। তিনি বলেছেন এ সমাজ গঠিত হবে নিজেদের সেবা, প্রেম ও মুক্তবুদ্ধি দ্বারা। 'লোকহিত' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৮) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষার দ্বারা সংঘবদ্ধ হলে মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার করায়ত্ত করতে পারবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে জমিদারকে তার কর্তব্য করতে বলা, মহাজনকে সুদ কমাতে বলা আর পুলিশকে অন্যায় করতে বারণ করা নিতান্ত দুর্বলতার নামান্তর। আমাদের বাস্তবঘনিষ্ঠ সামাজিক জীবনে ধর্মের দোহাই দিয়ে সবকিছুর শাসন চলে না। সামাজিক এই সমস্ত বাধা অতিক্রমণের জন্য রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছেন সকল মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে। জনবিচ্ছিন্ন থেকে তাদের কল্যাণের চেষ্টা করা বা নাইট স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষাদান হয় না। শিক্ষাটা হতে হবে সর্বজনীন, আদান-প্রদানের সহজ সম্পর্কের নিবিড়তায়। 'তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই। লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫১-৫৫২)

শিক্ষার মাধ্যমেই 'আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে' পাওয়া সম্ভব। এই 'বৃহৎ মানুষ' হচ্ছে সবকিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা মানবতা। কাজেই নিয়মের ভেতর, শিক্ষার ভেতর, এই বৃহৎ মানবতার বোধ থাকতে হবে এবং এই মানবতার বোধ বাইরের মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

'সত্যের আহ্বান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৫) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সস্তায় বাজিমাত হয় না। 'মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করে নিতে হবে' এবং এই লক্ষ্যে ধ্যান, কর্ম ও সত্যের সম্পৃক্তির মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করতে হবে। স্বদেশ সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর অভিমত– 'দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তি সম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এই জন্য যে, দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৭)। এ সৃষ্টি সাধিত হয় 'হৃদয়বৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'ইচ্ছাশক্তি' অর্থাৎ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা। এই ত্রিশক্তির যোগই পূর্ণশক্তির যোগ, পলিটিকেল বা ইকনমিক যোগ, তাঁর কাছে, পূর্ণশক্তির যোগ নয়। যোগ সাধনের অধিকার তিনি মহাত্মাজির মধ্যে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর আহ্বান সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তাঁর চরকা কাটা নীতি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। যে কালে কলে কাপড় তৈরি হচ্ছে সেকালে চরকা কাটা অর্থহীন। আবার কাপড় পোড়াবার নীতিরও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন দু'কারণে। প্রথমত, চোখ বুজে হুকুম মানার বিপত্তি থেকে তিনি দেশকে উদ্ধার করতে চান; দ্বিতীয়ত, দেশের অধিকাংশ লোকের যেখানে কাপড় নেই সেখানে তিনি কার কাপড় পোড়াবেন? (এ গবেষণা প্রবন্ধে

আগেও অন্য প্রসঙ্গে এই একইকথা বলা হয়েছে)। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, সবচেয়ে বড়ো ও জরুরি লড়াই হচ্ছে মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যদি শিক্ষার সাহায্যে সবকিছু বুঝে নিতে না পারা যায় তাহলে মূঢ়তা আমাদের গ্রাস করবে।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা' করার কথা বলেছেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি স্বার্থপর জাতির নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন বিশ্বের সমস্ত মানুষকে এক করবার কথা। তাঁর মতে এ দেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো 'ভেদবুদ্ধি'– 'ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৬)

এই সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে তিনি দেখেছেন মানুষের সত্যমিলনে 'অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা'। অবুদ্ধি হলো পরাধীনতা। আচার সর্বস্বতা, অহেতুক অকল্যাণের ভয় হলো অবুদ্ধির প্রকাশ। শাস্ত্রের সবকিছু মানা যাবে না, শাস্ত্রকে বিচার করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। স্বাধীন জ্ঞানশক্তি দিয়ে বুদ্ধির চাষ করতে হবে। 'সমাধান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৯-৬১১) প্রবন্ধে বলেছেন, গুরু, পুরোহিত, বিধানদাতার কথায় থেমে থাকা যাবে না। বুদ্ধিরূপের কর্ষণ করলেই সর্বজনীন স্বাধীনতা। অর্থাৎ কোনো ভূখণ্ডের স্বাধীনতা নয় 'রাষ্ট্রিক বা সামাজিক'ভাবে স্বাধীনতা পেতে হবে। এর মূলে রয়েছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বুদ্ধির চর্চাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। বিপদমুক্তির জন্য অলৌকিক পন্থা ভাবনা, ভাগ্য নির্ভরতা, গুরুর চরণ বন্দনা ইত্যাদিতে রয়েছে কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা। আত্মবুদ্ধির মুক্তি যদি আসে তাহলেই সম্ভব সমাজ ও দেশের কল্যাণ। তাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত শিক্ষাকে এড়িয়ে কোনো 'শর্টকার্ট' পথ নেই।

'শিক্ষার মিলন' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩০৩–৩১৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্ব ব্যাপারকে আয়ত্ত করার পরম কৌশল বিজ্ঞান চর্চার সিদ্ধিলাভে নিহিত। বুদ্ধি যদি ভীরু হয়, যথার্থভাবে চর্চিত হয়ে ঔজ্জ্বল্যলাভ না করে, তীক্ষ্ণ না হয় তাতে দুর্বলতা থাকে, বিশ্ব নিয়মকে জানা যায় না। বিশ্ব নিয়মকে বুঝবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা চলছে যুগ যুগ ধরে, বিজ্ঞানীরা যে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেছেন তা নয়। বিশ্বের চলার ছন্দে রয়েছে ত্রুটিহীনতা, আমাদের বুদ্ধি দিয়ে এই বিশ্বনিয়মকে জানতে হবে। 'বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে, এই জন্যে এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত– এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩০৫)।

পশ্চিমদেশে পলিটিক্যাল শাসনে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে বুঝেছে 'রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষে বা সম্প্রদায় বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়' প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এই নিয়মের সম্মতির সম্পর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেছেন স্বরাজটা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। রাজার বদল হলেই স্বরাজ আসে না। ভারতবর্ষের সমস্যা শিক্ষাতে এরা পিছিয়ে। অতীতের বিদ্যার আস্ফালন না করে পাশ্চাত্যের অগ্রসর বিদ্যার বিষয়টিকে আত্মস্থ করতে হবে। পাশ্চাত্যে আছে বিজ্ঞানের চর্চা, প্রাচ্যে আছে দর্শন– এদুয়ের মিলিত রূপেই মুক্তি। 'ন্যাশনালিজম সম্পর্কে তীব্র সমালোচনায় সামরিক শক্তি ভরণপোষণের ঘোর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ' (অশোক সেন, ১৪২১ : ১৪৯)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশনালিজম সত্য নয়'। ... দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনালিজম। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*,

ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩১৪)। তিনি উপলব্ধি করেছেন বিশ্বমুখিতার প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বমুখিনতার শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বিষয়। এজন্যে তিনি 'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে' অন্তরের কামনা ব্যক্ত করেছেন। বিদেশি অতিথির আগমনে জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান প্রদানে পূর্ণতা পাবে মনুষ্যত্বের।

'কালান্তর' প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের শিক্ষার প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। ইউরোপ সম্পর্কে তাঁর অভিমত 'প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৯)। ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আমদের মধ্যে নবযুগের সূচনা হয়। ইউরোপের চিত্তদূত ইংরেজ আমাদের দেখিয়েছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ।

পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে হয়, সাহিত্যের মাধ্যমে তারা নিয়ে এল ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ, এতে ন্যায়ের কথা আছে। কোনো বিচারেই অন্যায়কারীর দণ্ড লঘু হবে না। কিন্তু এ সমাজ বড়ো কঠিন সংস্কারের শিকড়ে বাঁধা। 'পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়েনি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। ইংরেজ শিখিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে। 'তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। ইউরোপের যে নবযুগ, ক্রম-অগ্রযাত্রা তা এসেছে শিক্ষার গুণে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন 'সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা' করতে। 'সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে... মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব– নবযুগের উদবোধন করে আমরা জরামুক্ত হব' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩১৬)।

শিক্ষার সাধনার দ্বারা এদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হতে পারে। আবার রবীন্দ্রনাথ নারীদেরকে বলেছেন হৃদয়কে মুক্ত করতে, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করতে, তাহলে নারীও হয়ে উঠবে সৃষ্টিশীল।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনিয়মের কথা বলেছেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধেও বিশ্বনিয়মকে বলেছেন 'যথাতথ'। 'বিশ্বের আগোগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে'– এই বৃহৎ নিয়মকে জানার মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানের চর্চা, 'বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার' ক্রম-অগ্রসরতার আশ্রয়। তিনি সমকালের মানুষের মানসিকতা ভেবে প্রায় প্রায় শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন– 'অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭)। জ্ঞানকে জীবনের জন্য আপন করতে হবে। দেবতা জেনে সরস্বতীর চরণে ফুল জল দিয়ে প্রণাম করলেই চলবে না, জ্ঞানে যা পাই, যাকে সত্য বলে জানি তাকে বাস্তবে জীবনের কর্মের সাথে গ্রহণ করলেই প্রকৃত ভাবে ঘটে জীবনের উত্তরণ।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে ভেবেছেন। ১৯০৪ (১৩১১) সালে 'স্বদেশী সমাজে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন, ১৩৩২ : ৫৫-৬৭) সমাজোন্নয়নের পদ্ধতি দান করেন, এবং পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। বিদেশি শাসন তাঁর কাছে বড়ো সমস্যা ছিল না, অবুদ্ধিই ছিল বড়ো সমস্যা। জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে মনের মধ্যে যে

অবরোধ আছে তা থেকে মুক্ত হলেই পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মনের অন্তঃপুরে অন্ধকারের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব দেশ ও সমাজের সত্যিকার মঙ্গল।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

কালান্তরে যে ছ'টি লেখায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ও অভিমত ক্রম অনুযায়ী প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো– লোকহিত (ভাদ্র, ১৩২১), ছোটো ও বড়ো (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪), সমস্যা (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), হিন্দু-মুসলমান (শ্রাবণ, ১৩২৯), হিন্দু-মুসলমান (শ্রাবণ, ১৩৩৮), হিজলী ও চট্টগ্রাম (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)। এই প্রসঙ্গে সনৎকুমার সাহা তুলে দিয়েছেন নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : উনিশ-বিশ)

১. বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড, ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই। ('লোকহিত')

২. এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ, সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না। ('ছোটো ও বড়ো')।

৩. যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘ কাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। ('সমস্যা')

৪. ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের একদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে।... হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। ... অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কাটিয়ে বেরিয়ে আসব,...। ('হিন্দু-মুসলমান–১')

৫. যে দেশ প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য...

... বিশেষ ধর্মের আদি প্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে, এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়। মেরেছে প্রাণে, মানে, বুদ্ধিতে, শক্তিতে, মানুষের মহোকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার ধর্মের দামে। হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়।... ধর্ম আমাদের মেলাতে পারেনি, বরং হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে।...

ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়।... ('হিন্দু-মুসলমান-২')

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দেখলে বোঝা যায়, 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলোতে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত নিঃসন্দেহে এখনও পর্যন্ত মূল্যবান। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত গভীর, আন্তরিক সদিচ্ছাপূর্ণ চিন্তা করেছেন। তিনি প্রখর দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মিলন না হবার কারণসমূহ অবলোকন করেছেন এবং সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কেও তাঁর সৎ মন্তব্য ছিল। সমকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে 'কালান্তরে'র 'ছোটো ও বড়ো' (১৯১৭), 'বাতায়নিকের পত্র' (১৯১৯), 'হিন্দু-মুসলমান' (১৯২২), 'সমস্যা' (১৯২৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। এছাড়া 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও গণসংযোগের প্রশ্নে' অংশে নেপাল মজুমদার জানিয়েছেন, দাঙ্গা দেখে তিনি বিচলিত হয়ে লেখেন 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (সমূহ গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধটি। (নেপাল মজুমদার, ১ম খণ্ড, ১৯৯১ : ২৮৮-২৯৫)

'সুবিচারের অধিকার' (১৮৯৪) প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের জন্য সরকারের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিকে দায়ী করেছেন তিনি। তৎপূর্বে 'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কংগ্রেসে মুসলিম সম্প্রদায় যেন যোগ না দেয়, সে প্ররোচনা যুগিয়েছে সরকার। তবে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১০) রচনা থেকে ইংরেজকে বিরোধের মূল বললেও নিজেদের দোষত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি। 'এতে তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের আসল কারণটি কোথায় তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এ বিচ্ছেদ হল জাতীয় পাপ এবং এই পাপের নিরাকরণ না করে জাতীয় আন্দোলনে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না' (ড. ক্ষুদিরাম দাস, ১৯৫৮ : ১৯৮)।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে তারপর সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে কবি 'ছোটো ও বড়ো' (১৯১৭) প্রবন্ধে ঘটনার জন্য ধর্ম ও সরকারের উসকানিকে দায়ী করেছেন। আবার ১৯৩০ সালে দাঙ্গার পিছনে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও অশিক্ষা আবিষ্কার করেছেন তিনি। মূলত ভারতবর্ষে সরকারি ভেদনীতির কারণে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৩০০), 'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০), 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১) প্রবন্ধে সরকারের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিকে বিরোধের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারের হিন্দুদের দমন করে মুসলমানদের সহযোগিতা করার নীতি বিরোধ উসকে দিয়েছে। তিনি ১৯৩৫ সালে ২৭ মার্চে অমিয় চক্রবর্তীকে বলেছেন, 'যদি উভয় সম্প্রদায় না মেলে তাহলে ভারত স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসিতে জলভরা (রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড)' (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৬৩)।

মূলত 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের মূলে দেখালেন দুটি বস্তু– ধর্ম ও সরকার। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হোমরুল (স্বায়ত্তশাসন) সমর্থন করেছেন, অথচ তিনি মনেপ্রাণে ঐ স্বাধীনতার পক্ষে নন। কিন্তু ইংরেজরা হোমরুল দেয়নি। তারা এদেশের সমাজ শাসন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যেহেতু সমাজের শাসন নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আছে বন্ধন, আচারসর্বস্ব কতগুলো নিয়ম। ধর্মের যে আচার, বন্ধন তা মানুষের মনকে বিবেচনা করে না, বাধা সৃষ্টি করে সামাজিক মিলনে। ১৯১৭ সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে হিন্দুরা গরু কোরবানি উপলক্ষ্যে মুসলমানদের উপর জুলুম করে, ২৮ সেপ্টেম্বরে শাহাবাদ জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়, ২ অক্টোবরের মধ্যে জেলার সর্বত্র দাঙ্গা বিস্তৃত হয়। ৯ অক্টোবর গয়া জেলার তিরিশটি গ্রাম লুণ্ঠিত হয়। এ দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, এদেশের ধর্ম আচার সর্বস্ব অসহনশীল, হিন্দুকে দোষী করলেন তিনি– 'নিজে ধর্মের নামে পশু হত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৬)।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সাল থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বৃদ্ধি পেতে দেখেছেন। তখন থেকে এই বিরোধের মূলে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্প্রেম নীতিকে চিহ্নিত করেছেন। সরকার সুকৌশলে 'ঈর্ষা' বপন করেছে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৬২)। তাঁর মতে ধর্ম যতদিন আচারসর্বস্ব থাকবে ততোদিন মিলন সম্ভব নয়। 'বাতায়নিকের পত্র' (রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড, ১৪২০ : ১১-১৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের আচারমগ্নতাকে নিন্দে করেছেন প্রবলভাবে। এ প্রবন্ধে তিনি আত্মসমালোচনা করে বলেছেন, হিন্দু সমাজ কি বাস্তবিকই মুসলমানকে আন্তরিকভাবে বুকে টেনে নিয়েছে? একচালের নিচে বসে উভয় সম্প্রদায়ের আহার চলে না। 'পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, ...। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮২)।

'সমস্যা' (১৯২৩) প্রবন্ধে তিনি দেখালেন, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত করার প্রয়াসের ভিত্তিই অবাস্তব। এর প্রমাণ খিলাফত আন্দোলন, গান্ধীজি যা সমর্থন করেছিলেন। বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু সমাজকে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিয়েছে। নিম্নবর্ণের মানুষ হিন্দু সমাজের কাছে 'মানুষ' হিসেবে সম্মান পায় না। কিন্তু প্রেমকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে তা গ্রহণ করার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। আমাদের বুদ্ধি এবং কর্মের পথে আছে অবুদ্ধির খুঁটি পোঁতা। পাঠান, মুঘল সবাই এদেশে এসে শাসন চালিয়েছে ঐ অবুদ্ধির খুঁটির প্রভাবে। হিন্দুরা ইংরেজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে গেছে, আর মুসলমান জমিদারদের আলস্যের কারণে অর্থনৈতিক চিন্তার স্থবিরতার ফলে সম্পদের ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অসাম্যের। সুইজরল্যান্ডে অনেক জাতির বাস। 'সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই– ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০১)

রবীন্দ্রনাথ এ দেশে 'অসবর্ণ বিবাহের' কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু 'অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দু সমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০১)

তিনি দেখালেন উভয় সম্প্রদায় ধর্মরজ্জুতে বাঁধা, মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক যোগের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। 'আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৬)। তিনি লক্ষ করলেন, তাদের মিল হয় একমাত্র 'তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে', দেখালেন এ মিলন অসত্য, এ জন্যেই 'বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড,

১৩৯৬ : ৬০৬)। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মিলেছে, কেননা ইংরেজ সাম্রাজ্যের দুঃখ মুসলমানের কাছে বাস্তব। 'মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৬)– হিন্দু জাতি জন্মগতভাবে এক, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা তাদের বিভক্ত করেছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিবেচনা-বিশ্লেষণ করে ধর্মকে পালনের পক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৭ থেকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানের বিভেদের জন্যে একটি বস্তুকেই প্রধানত দায়ী করলেন, সেটি ধর্ম। ১৯২২ সালে কালিদাস নাগের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হলো, 'কালান্তর' গ্রন্থে পত্রটি 'হিন্দু-মুসলমান' নামে মুদ্রিত। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬১৯) প্রবন্ধে দুই ধর্মের স্বপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করে তিনি দেখালেন, এদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা অত্যল্প। এ বিশ্লেষণে তিনি দেখিয়েছেন– খ্রিষ্টান ও মুসলমানরা স্বধর্ম পালন করেই তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিকৃত করতেও এরা উদ্যত। তাই এদের সঙ্গে মিলনের উপায় ওই ধর্মাবলম্বন। খ্রিষ্টানরা আধুনিক যুগের বাহন, এই জন্যে তাদের মধ্যে মধ্যযুগীয় গণ্ডির আবেষ্টন নেই। 'অপরপক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২০)। তবে পার্থক্য এখানে যে, অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের বিরোধ সমর্থক নয়, অনেকটা অসহযোগিতামূলক। এ ধর্মের বড়ো ত্রুটি এর আচারসর্বস্বতা। তাই তাঁর মতে 'মুসলমান ধর্ম' গ্রহণ করে মুসলমানদের সঙ্গে সহজে মেলা যায়, কিন্তু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুর সঙ্গে সহজে মেলা যায় না। কেননা আহারে বিহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু ধর্ম সারাক্ষণ নিষেধ করে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, খিলাফত আন্দোলনের সময় হিন্দুকে মসজিদ বা অন্যত্র যতখানি টেনেছে, হিন্দু ততোখানি টানতে পারেনি। তিনি নিজের কাছারিতেই দেখেছেন, মুসলমান প্রজাদের বসতে দেয়া হয় জাজিমের এক প্রান্ত তুলে। তাঁর মতে আচার এবং ধর্মমত এদের মিলনের অন্তরায়– '... ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২০)। এত বৈপরীত্য নিয়ে 'এরা কি করে মিলবে'– ভেবে রবীন্দ্রনাথ যেমন হতাশ হয়েছেন আবার আশাও ছাড়েননি। তিনি ইতিহাসচারী হয়েছেন। হিন্দু যুগের পূর্ববর্তী কালে এদেশে যারা এসেছিল গ্রীক পারসিক তারা মিলতে পেরেছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম যখন এদেশে প্রবল হলো তখন 'দুর্লঙ্ঘ্য আচারের আকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২০)। সেই থেকে নিষেধ ও প্রত্যাখ্যানের ফলে লাঞ্ছিত হয় মানবমূল্য বোধ। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রয়োজন বোধ করলেন 'মনের পরিবর্তন, যুগের পরিবর্তন', সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির এবং ইউরোপের মতো উভয়ের মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আগমন। নিষেধের বেড়াতে মনকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। আমাদের ভিতরে মূলগত যে বাধা, নিষেধ আছে তা শিক্ষায়, সাধনায় ত্যাগ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতবর্ষ মিলনতীর্থ, এখানে সবার মিলন ঘটবে, এই ছিল তাঁর কামনা। কিন্তু ধর্ম তা হতে দেয়নি। এই সমস্যার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি ধর্ম-সমাজের আচার-বিধিকে

বহুল পরিমাণে দায়ী করেছেন। এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি শিক্ষা, সর্ববিষয়ে উভয়ের কাম্য এবং সামাজিক দেওয়া নেওয়াকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সমস্যাকে যুগপরিবর্তনের হাতে ছেড়ে দেন ১৯২২-এ। তিনি বোধ করেছেন, বিশ শতকেও আমরা মধ্যযুগের অন্ধতায় ভুগছি, তাই তিনি নবযুগের আলো চেয়েছেন। 'হিন্দু মুসলমান সমস্যা' (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, ১৪১৭ : ৪৪১-৪৪৭) সুদিনে দুর্দিনে একে অন্যের পাশাপাশি থাকাকে অন্তরের দাবি ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ। (অশোক সেন, ১৪২১ : ৫৬)

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ধর্ম-সমাজের আচার-বিধিকে বহুল পরিমাণে দায়ী করেছেন এবং শেষপর্যন্ত নবযুগের উপরে এই সমস্যার সমাধান ন্যস্ত করেছেন। কালান্তরের বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে মন্তব্যটি পরীক্ষা করা হলো। স্মরণীয়, 'হিন্দুমুসলমান সমস্যাটিকে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দেখেন নি। তিনি উভয়ের সামাজিক বিরোধের কারণগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন এবং মিলনের পথ সন্ধান করেছিলেন নিশীথের পথযাত্রীর মতো' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ১০৯)।

উপসংহার

বস্তুত 'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাষ্ট্র, সমাজ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, স্বাধীনতা, শিক্ষা, সংস্কারমুক্তি এককথায় সমাজ ও রাজনীতি ভাবনার আকরগ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে দেখা যায়, একদিকে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেছেন অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন; আবার তার আগে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এর নিন্দা জানিয়েছিলেন। উপরন্তু গান্ধীবাদ এবং অসহযোগ আন্দোলনের সবকিছু তিনি মেনে নিতে পারেননি। তবে তিনি সবসময়ই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ বাংলার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন, গ্রামকে ব্যাপক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এক্ষত্রে আমাদের সামাজিক রোগ তথা অন্ধ সংস্কার মুক্তির পথে শিক্ষার প্রসারকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধসমূহ রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মতামত অভিব্যক্তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত– তাঁর বক্তব্যসমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক।

সহায়কপঞ্জি

অশোক সেন (১৪২১)। *রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ক্ষুদিরাম দাস (১৯৫৮)। *সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ*। ইউ এন ধর য়্যান্ড সন্স প্রাঃ লি, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা*। নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

নেপাল মজুমদার (১৯৯১)। *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, ১ম-২য়-৩য়-৬ষ্ঠ খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪১৭)। *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

প্রশান্তকুমার পাল (২০০৩)। *রবিজীবনী*, নবম খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-ভাবনা : পল্লিশিক্ষা, জীবনানন্দ জসীমউদদীন এবং*। অনন্যা, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৩)। *কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা*। গ্লোব লাইব্রেরি, ঢাকা।

মিল্টন বিশ্বাস (২০১১)। *রবীন্দ্রনাথ ও ব্রিটিশরাজ*। মূর্ধন্য, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৩২)। *সংকলন*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৬)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

শিপ্রা সরকার (২০০৮)। *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সনৎকুমার সাহা (২০১৭)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, *কালান্তর*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৩৮৮)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হুমায়ূন আজাদ (১৯৭৩)। *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি অগ্রন্থিত চিঠি

সংকলন ও ভূমিকা : ভূঁইয়া ইকবাল*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত চিঠি লিখেছেন, তার সংখ্যা এখনো নির্ণয়ের অপেক্ষায় আছে। এক হিসেবে কবির সাড়ে সাত হাজার বাংলা চিঠির হদিস পাওয়া গেছে (গৌরচন্দ্র, ২০১৮ : ১–৯২৭)। এসব চিঠির সিংহভাগই নানা সাময়িকপত্রে, সংকলনে কিংবা অন্যদের বইয়ে সংকলিত/উদ্বৃত। বাংলা লেখা চিঠির বাইরে আছে ইংরেজিতে লেখা অসংখ্য পত্র।

বেশ কিছু চিঠি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন আরকাইভসে সংরক্ষিত, যেগুলো এখনো প্রকাশ লাভ করেনি। এছাড়া রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়নি; প্রাপক বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছেও অনেক চিঠি আছে, যেগুলোর কোন হদিস নেই। বিদেশে নানা গ্রন্থাগারে ও আরকাইভ্সে সংরক্ষিত, যেগুলো এখনো প্রকাশ লাভ করেনি। এছাড়া রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়নি; প্রাপক বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছেও অনেক চিঠি আছে, যেগুলোর কোনো হদিস নেই।

বিদেশে নানা গ্রন্থাগারে ও আরকাইভ্সে কবির চিঠি সংরক্ষিত, যার কিছু-কিছুর প্রতিলিপি, আমার জানামতে, মার্টিন কেম্পশ্যেন ও উমা দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেক রবীন্দ্রানুরাগী রবীন্দ্রভবনে উপহার দিয়েছেন। আমি নিজেও মুনীর রানার সহযোগিতায় ইন্টারনেট থেকে কয়েকটি চিঠি রবীন্দ্রভবনকে দিয়েছি।

প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, রবীন্দ্রবীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা ইত্যাদি অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকায় অপ্রকাশিত রবীন্দ্রপত্র প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকাতেই কবির দু-হাজার দু-শো চিঠি মুদ্রিত হয়েছে (১৯৩৩–৯২)।(শ্যামাপ্রসাদ, ১৯৯০)

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে কবির জীবিতকালেই কয়েকটি পত্রসংকলন বেরিয়েছে : *ছিন্নপত্র* (১৩১৯ ব.), *ভানুসিংহের পত্রাবলি* (১৩৩৬ ব.) এবং *পথে ও পথের প্রান্তে* (১৩৪৫ ব.)। কবির প্রয়াণের পর বিশ্বভারতী চিঠিপত্র নামে পত্রসংগ্রহের প্রকাশের সূচনা করে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। ঊনবিংশ খণ্ডের প্রকাশকাল ১৪১১। ৬২ বছরে বিশ্বভারতীর মাত্র উনিশটি খণ্ড মুদ্রণের কৃতিত্ব। বিগত ১৫ বছরে বিশ্বভারতী কয়েকটি খণ্ডের পরিবর্ধিত সংস্করণ ছাপালেও তাদের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়– একথা বলা যাবে না। বিশ্বভারতী রবিন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রকাশনায় সামর্থ্যহীনতা প্রমাণ করে ক্ষান্ত হয়নি। রবীন্দ্রভবনের দু-এক জন কর্মী অন্যদের কাজেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন। যেমন, একবার হুকুম জারি করা হয় যে, কবির কোনো লেখার একটি লাইনও অনুলিপি করা যাবে না। কপিরাইট সংক্রান্ত বাধা দূর হওয়ার পর অন্যান্য প্রকাশক এগিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রপত্র প্রকাশনায়।

বিশ্বভারতীর উনিশ খণ্ড ছাড়াও প্রকাশ পেয়েছে কুণাল সিংহ-সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথের চিঠি : পারুল দেবীকে* (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭); আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০০); প্রমথনাথ বিশীকে লেখা পত্রাবলি *শুভাকাঙ্ক্ষী* (রবীন্দ্রভাবনা, বিশেষ সংখ্যা ১৯৭৯); প্রশান্তকুমার পাল-সম্পাদিত *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৪১১ ব.); অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত *নিজের কথা* (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৮); সমীর সেনগুপ্ত-সম্পাদিত *বিদ্বজ্জনেদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি* (কলকাতা : পত্রলেখা, ২০১১); গৌরচন্দ্র সাহা-সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথের চিঠি/ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে* (কলকাতা : পত্রলেখা, ২০১৩); রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী-সম্পাদিত ভক্ত ও *কবি* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭); বাংলা একাডেমি-প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র* (ঢাকা, ১৯৮৪) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রপত্র সংকলন ও সম্পাদনায় অনাথনাথ দাস, আনিসুজ্জামান, আবুল আহসান চৌধুরী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ কুণ্ডু, কানাই সামন্ত, কুনাল সিংহ, গোপালচন্দ্র রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সরকার, পুলিন বিহারী সেন, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, উমা দাসগুপ্ত, চিন্ময় গুহ, প্রশান্তকুমার পাল, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সলিম ঘোষ, সুতপা ভট্টাচার্য, চিত্রা দেব, সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুনীল দাস, সনৎকুমার বাগচী, ভবতোষ দত্ত প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন।

কবিপ্রয়াণের পর বিশ্বভারতী খণ্ডে-খণ্ডে *চিঠিপত্র* নামে পত্রসম্ভার প্রকাশের উদ্যোগ নেয় (১৩৪৯ ব.)। প্রথম খণ্ডের সূচনায় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন : রচিয়তার চিরন্তন অধিকার বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত প্রথম মুদ্রিত তিনটি পত্র সংকলনের "বহু পত্রের বহু স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন।" পরে প্রকাশিত পত্র সংকলনে পরিবর্তন-পরিবর্জনের ধারা বর্জিত হয় বলে দাবি করলেও দেখা যায়, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা মুসোলিনি সম্পর্কে একটি চিঠি ছাপার পর ওই দ্বিতীয় খণ্ড বাজার থেকে প্রত্যাহার ও বিক্রয়-বিতরণ বন্ধ করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ড *চিঠিপত্রে*র পরবর্তী মুদ্রণে চিঠিটি বাদ পড়ে। পুলিনবিহারী সেন একটি চিঠিতে আয়েত আলী খান সম্পর্কে কবির প্রতিকূল মন্তব্য থাকায় ওই চিঠি সংকলন করেননি।

বিশ্বভারতীর প্রকাশিত *চিঠিপত্র* পত্রমালার প্রথম খণ্ডে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, দ্বিতীয় খণ্ডে জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ, তৃতীয় খণ্ডে পুত্রবধু প্রতিমা দেবী, চতুর্থ খণ্ডে কন্যা মাধুরীলতা, মীরা, দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী, পঞ্চম খণ্ডে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রাদি সংগৃহীত।

এখনো কবির অনেক চিঠি নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে অগ্রন্থিত অবস্থায় লোকলোচনের আড়ালে রয়ে গেছে। এখানে কয়েকটি অগ্রন্থিত চিঠি সংগ্রন্থিত হলো। এসব চিঠির রচনাকাল বিশ শতকের প্রথম তিন দশক। প্রথমটি লেখা হয় ১৯০২ সালে, শেষটি ১৯৩০-এ। প্রথম চিঠির প্রাপক ত্রিপুরার প্রিন্স ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ; দ্বিতীয়, সপ্তম-অষ্টম পত্রের প্রাপক রবীন্দ্রকাব্যের অখণ্ড সংস্করণের (১৯০৩) সম্পাদক ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনালগ্নের অধ্যক্ষ (১৯০৪) মোহিতচন্দ্র সেন, তৃতীয়–পঞ্চম চিঠি লিখেছেন কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, শ্রীনিকেতনের এক সময়ের অধ্যক্ষ, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে; নবম পত্র এক সময়ের কলাভবনের অধ্যক্ষ, শান্তিনিকেতনের সচিব সুরেন্দ্রনাথ করকে।

শ্রীনিকেতনে কবির সহায়ক উইলিয়াম পিয়র্সনকে লেখেন ১৯১৩-র ৬ আগস্ট। একটির প্রাপকের নাম ও তারিখ উল্লেখ নেই।

সব চিঠিরই কেন্দ্রীয় বিষয় কবি-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা।

পত্রাবলি

পত্র : এক

আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই– তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হোক অন্তরে সেই দিক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ় রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বানিজ্যব্যবসায় আসবাব-আয়োজনের প্রাচুর্য্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। ২৪ শে চৈত্র ১৩০৮।

(ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণকে লিখিত।)

প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়েই অর্থাৎ লেখাপড়া, রসচর্চ্চা, অশনবসন, চরিত্রচর্চ্চা, ভক্তিসাধন প্রভৃতি সব তাতেই আপনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখবেন– আপনি তাদের বিধাতার প্রতিনিধি হবেন, প্রত্যক্ষ আপনার সঙ্গে তাদের সর্ব্বাংশের সম্বন্ধ থাক্‌বে এই আমার ইচ্ছা- বলা সহজ, করা কঠিন, তবু এইটেই আমাদের বিদ্যালয়ের একমাত্র আইডিয়াল। হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করতে হয় কলের সাহায্যে নয় এইটে আদত কথা। কলিকাতা, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

(মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত।)

পত্র : দুই

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois.
U.S.A

কল্যাণীয়েষু,

সন্তোষ, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পাওয়া গেল। তুমি ছেলেদের নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়েছিলে শুনে খুব খুশি হলুম। ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের যোগ যত ব্যাপক হয় ততই ভালো। আমি দূরে এসে আমাদের বিদ্যালয়ের আনন্দচ্ছবি আরো যেন নিবিড় করে দেখতে পাচ্চি। যত দিন যাচ্চে ওখানে মধু জমে উঠ্‌ছে; কারণ মানুষের জীবন আপনার সমস্ত সঞ্চয় আপনার মধ্যেই তো সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলে না; তার উদ্বৃত্ত অনেক; যেখানে সে থাকে সেখানে তো আপনার অনেকটা প্রাণসামগ্রী ছড়িয়ে ফেলে জড়িয়ে তোলে; সে সমস্তই অহরহ জমে জমে ওঠে; বিশেষত মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন তার জীবনের এই বাড়তি জিনিষ আরো বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হোতে থাকে। আমাদের ওখানে দেড়শো দুশো ছেলের প্রাণের

আনন্দ প্রতিদিনই নানাভাবে ওখানকার বাতাসের সঙ্গে মাটির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে– ওখানে একটি অদৃশ্য আনন্দনিকেতন সৃষ্টি করে চলেছে– কত তরুণ হৃদয়ের রঙীন সূতোয় ওখানে একটি অপরূপ চাঁদোয়া বুনে চলেছে; তার শোভা যে কী আশ্চর্য্য তা একটু দূরে থেকে আরো স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। ওখানকার এই সৃষ্টিকার্য্য যে কী সুদূরব্যাপী ও সুমহৎ তা অভ্যাসের জড়ত্ববশত একদিনো যেন তোমরা ভুলে যেয়ো না– তোমরা সত্য হও এবং চারিদিকে উৎসারিত হতে থাক– প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা তোমাদের ধ্যানদৃষ্টি যেন আবৃত না হয়– বাধা বিরুদ্ধতাকেই তোমরা যেন বড়ো করে দেখো না। ৭ই পৌষ উত্তীর্ণ হয়েছে– তোমরা নূতন বৎসরে প্রবেশ করেছ– এবার আর একবার তোমাদের সত্যরূপকে মনের সামনে নির্ম্মল করে উজ্জ্বল করে সুস্পষ্ট করে দেখো, তার আনন্দ মূর্ত্তির সামনে প্রাণপাত করে আর একবার নতুন করে তোমাদের জীবনকে উৎসর্গ করো, অন্তরের মধ্যে কোথাও কোনো ভীরুতা কোনো সংকোচ রেখো না, এবং বাইরের দিকে যে সমস্ত কর্ম্মের আবর্জ্জনা জমেছে সেগুলোকে যতদূরে পারো ঝাঁট দিয়ে ফেলে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে মুক্ত কর এবং সুন্দর করে তোলো। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

ইতি স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত)

পত্র : তিন

ওঁ

C/o. Messrs Thomas Cook and Son
Ludgate Circus, London
২৩শে বৈশাখ ১৩২০

কল্যাণীয়েষু–

সন্তোষ, তোমরা এখন ছুটি ভোগ করচ। হয়ত ২০ শে জ্যৈষ্ঠের কাছাকাছি আমার এই চিঠি পাবে। সেখানকার সেই রৌদ্রদগ্ধ মাঠের উপর খরতর গ্রীষ্মের মূর্ত্তিটি কি রকম তা ঠিকটি এখানে উপলব্ধি করাই শক্ত। কেননা আজ ২৩ শে বৈশাখে এখনো আমাদের ঘরে আগুন জ্বলচে। আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, মোটা কাপড়গুলোর বোঝা এখনো নামাতে পারিনি। এখানে মানুষকে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যেই প্রস্তুত হতে হয়, সহজে কিছু হবার জো নেই। আমাদের দেশে প্রস্তুত না হওয়াটাই হচ্ছে দরকার, গায়ের চাদরটা পর্য্যন্ত খুলে ফেললে তবে প্রাণ বাঁচে। সেই অভ্যাসের মানুষকে এ সব দেশে ধরে রাখা বড়ো নাকাল।

ক্ষিতিমোহন বাবুকে এ দেশে আনবার আয়োজন আমি ঠিক করেই রেখেছি। আর একটু হলে এই গরমির ছুটির পরেই তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা করছিলুম। কিন্তু আমার হঠাৎ এই সুবুদ্ধি এল যে আমি ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁকে বিদ্যালয় থেকে তুলে আনা উচিত হবে না। তোমাদের ওখান থেকে এখন অনেক পুরাতন শিক্ষক চলে এসেছেন, অনেক নূতন লোক নিযুক্ত হয়েছেন। এই নূতন আগত আগন্তুকদের আমাদের আশ্রমের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে

নেবার জন্যে পুরাতন ধারাটিকে প্রবল রাখা দরকার। নইলে ইস্কুলের ভাবটিই আশ্রমের ভাবটিকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠ্‌তে চাইবে। ইস্কুলে যাঁরা পড়াচ্চেন তাঁদের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু আশ্রমে যাঁরা সাধনা করচেন তাঁদের প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। সে প্রয়োজনটাকে চোখে দেখা যায় না এবং হিসাবের খাতার মধ্যে ধরে দেখানো শক্ত, তাতে তোমাদের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ফলের কোনো তারতম্য হবেনা, কিন্তু তার ওজন নেই বলে যে তার প্রয়োজন নেই তা নয়। আমাদের বিদ্যালয়ে যে জিনিষটা দেখা যায় না সেইটেই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। সন্তোষ, সেইটিকে তোমরা স্পষ্ট করে দেখ, সেইটির প্রতি তোমাদের বিশ্বাসকে অবিচলিত করে ধরে রাখ এবং, তার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবশতই তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ছোট খাটো খিটিমিটি গুলোকে কাটাগাছের মত একেবারে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে দাও। আপনাকে জয় করার দ্বারাই চারিদিকের সকলকে জয় কর। তোমরা সকলে এখনো মনে প্রাণে সম্পূর্ণ মিলতে পারনি এইখানেই তোমাদের গভীর দীনতার পরিচয় রয়ে গেছে।

যখন ক্ষিতিমোহন বাবুকে বিদ্যালয় থেকে কিছুকালের জন্যেও চলে আসতে হবে তখন শাস্ত্রী মশায়কে ফিরে পেতে পারলে আমাদের উপকার হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়ত আগামী পূজোর ছুটির পরে তাঁকে দরকার হবে। এখন থেকে এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কতকটা এগিয়ে রেখে দিলে ভাল হয় না? তা হলে আগে থাকতে তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারবেন।

তোমাদের বিদ্যালয়ের ব্যয় সংক্ষেপের জন্যে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছ তাতে খুব উপকার হবে আশা করচি। কেননা, এ উপকারটা ভিতরের দিকের উপকার। ব্যবস্থার শৈথিল্যে যে কেবলমাত্র অপব্যয় ঘটে তা নয় মনের উপর নিয়ত তার দৃষ্টান্তের ফল অত্যন্ত খারাপ। ও জিনিষটা একেবারে বিষের মত চরিত্রের মূলে গিয়ে আঘাত করে । এ দেশে ঘরে দ্বারে পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই যে একটি জাগ্রত উদ্যোগকে দেখতে পাই তাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। কেন না এই শক্তির পিছনেই সৌন্দর্য্য– উদ্যোগিনঃ পুরুষ সিংহমুপৈতী লক্ষ্মীঃ– এরই সহচর হচ্চে সুখ স্বাস্থ্য কল্যাণ। একবার আমাদের দেশের বাবুদের কর্ম্মশালা এবং আমাদের গিন্নিদের ঘরকরনার কথা স্মরণ করে দেখ। সর্ব্বদাই গোলমাল চলচে অথচ শোভা নেই শৃঙ্খলা নেই। যেখানে বাস করচি সেখানে অযত্ন মূর্ত্তিমান, অথচ নাবার খাবার সময় নেই। নাকের সামনেই দুর্গন্ধ, চোখের সামনেই কুদৃশ্য। নিজেকে আমরা যেন চব্বিশ ঘণ্টা অপমান করচি। আমরা পরের কৃত অবমাননায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করি। কিন্তু অহোরাত্র আত্মাবমাননার হাত থেকে যে দিন আমরা নিজেদের উদ্ধার করব সেই দিন আমরা রক্ষা পাব। বিদ্যালয়ে আহারশালায় শয়নাগারে মাঠে ঘাটে আমরা ভদ্রতাকে যে বিধিমতে লাঞ্ছিত করচি সেইটে থেকে যদি বিদ্যালয়কে বাঁচাতে পার তাহলে দেখবে ব্যয় সংক্ষেপও হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও বিকাশ ঘটবে। বিদ্যালয়ে সম্প্রতি খুব একটা অস্বাস্থ্যের আমদানি হয়েছে এটার সঙ্গে কি কোমর বেঁধে লড়াই করবে না। যেখানে যেখানে একটুও জল জমচে জঞ্জাল জমচে সেখানে দৃষ্টি দাও– তোমরা নিজের হাতে যা করতে পার সেই দিকে চেষ্টা প্রবর্তন কর– আরো বেশি টাকা আরো বেশি সুবিধার জন্যে দুর্ব্বলভাবে অক্ষমভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকোনা। কোমর বেঁধে দাড়াও, ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটাও, কোদাল দিয়ে কোপাও, জল দিয়ে ধোও, আগুন দিয়ে পোড়াও, দুদিনের আকস্মিক উৎসাহ নয় প্রতিদিনের অক্লান্ত উদ্যমকে জাগিয়ে রাখ। তোমরা দুশো লোকে যদি মন দাও তা হলে কি যে না করতে পার তা ত ভেবে পাইনে। তোমরা ভূবনডাঙার উপকার এবং সাঁওতালপাড়ার উন্নতি করতে চাও কিন্তু যখন তোমাদের নিজের শ্রীহীনতার দিকে তাকাও

তখন নালিশ করতে থাক যথেষ্ট মালি নেই মজুর নেই টাকা নেই। নেই যেটা সেটা হচ্চে চিত্ত,– বিত্ত নয়, সেই চিত্তকে সম্পূর্ণ সজাগ করে তোলবার জন্যেই বিধাতা তোমাদের দুঃখ দিচ্চেন–সেই জন্যেই তোমাদের তহবিল শূন্য, তোমাদের হাসপাতাল পূর্ণ। এ জন্যে তোমরা তোমাদের প্রত্যেককে দায়ী করে প্রত্যেকের উপরে দায়িত্ব দাও– প্রত্যেকে যদি একটুখানি করেও ভার নেয় তাহলে বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড ভার লাঘব হয়। ইতি

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত।)

পত্র : চার

ওঁ

508 High St.
Urbana, Ill.

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, ঘোরাফেরা সেরে আবার কাজে বসতে হবে। এবার আমাকে একটু বিশেষ উঠে পড়ে লাগতে হবে– অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করবার আছে। তোমাদের চিঠির বরাদ্দ হয় ত কিছু কমিয়ে আনার প্রয়োজন হবে। দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কি করা যাবে তারই নানা সংকল্পে মন প্রতিদিন পূর্ণ হয়ে উঠচে। অবশ্য সংকল্পের মুকুল যত ধরে ফল তত ফলে না কিন্তু তবু এই মুকুল ধরানোর বসন্ত-উৎসবও ত কম আনন্দের নয়। সিউড়ির মেলাতে জয় লাভ করে তোমরা পুরস্কৃত হয়ে এসেছ শুনে আমি খুব খুসি হলুম। তোমার গোপালগুলিও গুণিজনের সম্বর্দ্ধনালাভ করে তোমার গোষ্ঠের মুখোজ্জ্বল করেছে এও শুভ সংবাদ। তোমাদের ছেলেরা সবজির বাগান করেছে এ খবরটি পেয়ে আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি যখন ফিরে যাব তখন আশা করচি আমি দেখতে পাব আমাদের বিদ্যালয়ের চারিদিকের ভূমি প্রসন্ন এবং গাছপালা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে– তখন আশ্রমের কোথাও কোনো অনাদরের চিহ্ন দেখতে পাব না। ততদিনে তোমাদের রাস্তাগুলি পরিপাটি এবং গাছের তলা পরিষ্কৃত হয়ে গেছে। সব চেয়ে আমি আশা করে আছি আমাদের আশ্রমবাসীদের সমস্ত দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি সুবিহিত সুশৃঙ্খল হয়ে এসেছে। ছাত্ররা যাতে নিজের চেষ্টায় সমস্ত কর্ম্মকে প্রণালীবদ্ধ করে তুল্‌তে পারে সেইদিকে তাদের উৎসাহিত কোরো। বাইরের শাসনে নয় কিন্তু নিজের কর্ত্তৃত্বে তারা সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করবে এইটেই সব চেয়ে প্রার্থনীয়। কি করলে সব চেয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে এই সমস্যা সমাধানের ভার তাদের উপরেই দাও এবং তাদের ব্যবস্থামত চলবার জন্যে তোমরাও প্রস্তুত হও। সমস্ত জিনিষ গড়ে তোলবার ভার তাদের হাতে দিতে থাক– কেননা এই গড়ে তোলাই যে একটা মস্ত শিক্ষা, এবং এটা বিশেষভাবে ছাত্রদেরই জন্যে আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মনে তোমরা কোনো সঙ্কোচ রেখো না– এই ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীকে যদি তোমরা পাকা করে তুলতে পার তবে সে একটি মস্ত জিনিষ হবে। শিবাজি যেমন তাঁর গুরুর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর রাজ্যভার ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি আমাদের ছাত্ররা গুরুর প্রতিনিধি হয়ে বিনম্রভাবে যখন শাসন বিস্তার করতে শিখবে তখন আমরা ধন্য হব। প্রথমে অনেক বাধা

ও বিশৃঙ্খলতা ঘটতে পারে কিন্তু তাতে তোমরা ভয় কোরো না– ভুল করতে দাও তাহলেই ভুল সমূলে নষ্ট হবে– ভুল থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে ভুলকেই বাঁচিয়ে রাখা হয় একথা নিশ্চয় মনে জেনো।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত।)

পত্র : পাঁচ

ভারতবর্ষে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো সঙ্গতি না থাকে তবে মনটা নিতান্তই থাকা চাই তা যদি থাকে তবে এমন পুণ্যস্থান আর নেই। তাই আমাদের প্রত্যেকের উপরে ভারতবর্ষের এই দাবী যে ভারতবাসীর মনকে জাগাও, প্রাণবান সর্বত্রগামী আনন্দময় মনকে বিশ্বের অভিমুখে পূর্ণ বিকশিত করে তোলো– কারখানা ঘরে তাদের মজুরী যদি না জোটে হাটবাজারে তাদের মূল্য যদি না মেলে বিশ্বে তাদের চেতনা যেন সংকীর্ণ না হয়। ভাগ্য তাদের চারিদিকেই বঞ্চনা করেছে এইজন্যে যাতে তারা নিজের অন্তরতম সহজ সম্পদকে নিজের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে পারে এজন্যে তাদের শিশুকাল থেকে উদ্যোগী করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয় যেন সেই শুভ চেষ্টার স্থান হয় এই কথা তোমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ওখানকার ছোট বড় প্রত্যেক কাজই যেন জীবনের কাজ হয় এই আমার ইচ্ছা। কল সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে– আমাদের ছেলেগুলোকে পিণ্ড পাকিয়ে সেই কল রাক্ষসের নৈবেদ্যরূপে যেন সাজিয়ে না দিই তাদের বাঁচিয়ে তোল, বাঁচিয়ে রাখ– বিশ্বজগতে তারা যেন নিজের জীবন দিয়ে গ্রহণ করে জলেস্থলে আকাশে এবং বৃহৎ লোকালয়ে তারা যেন নিজের প্রাণের আলিঙ্গন বিস্তীর্ণ করে দিতে পারে, তাদের অনুভূতির প্রবাহ কোথাও থেকে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে না আসে। তাদের পুড়িয়ে গলিয়ে পিটিয়ে ইস্কুলের ছাঁচে ঢেলে যেন কলের পুতুল ক'রে তুলো না। সে রকম পুতুল তৈরির কারখানা অসংখ্য আছে আমাদের বিদ্যালয় তা নয় বলেই যেন আমরা গৌরব করতে পারি। সভ্যজগতে আজ এই মস্ত একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে সজীব মানুষ অন্য দিকে সভ্যতার কল এই দুয়ের মধ্যে কার জিত হবে? এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটছে না। কিন্তু এ কথা তো ভুললে চলবে না যে মানুষই কলকে চালাবে, কল তো মানুষকে চালাবে না। অতএব মানুষের শিক্ষা যদি কলের শিক্ষা হয় তাহলে মনুষ্যত্বের গোড়ায় কোপ মারা হয়। এই বিপদের কথা লোকে বুঝতে পারছে কিন্তু কী করলে এর কিনারা হতে পারে তা কেউ ভেবে পাচ্ছে না।

আমরা ভূমার বক্ষের মধ্যে ছেলেদের মানুষ করে তোলবার আয়োজন করছি এই কথাটা যেন সর্বতোভাবে সত্য হয়– আমাদের তপোবন থেকে কলকে খেদাও, ওখানে প্রাণকে আন। ইতি ৩০ শে জানুয়ারি ১৯১৩

(শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপককে লিখিত।)

পত্র : ছয়

আমার মনে হচ্চে ছেলেদের মুখরোচক খাবারের জন্যে কিছুমাত্র ভাবতে হয় না যদি তাদের best sauce এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুব কসে পরিশ্রম করিয়ে ক্ষুধার মুখে বেশ শাদাসিধা খাবার দিলে সেটা রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর হবেই। পূর্বে ওরা যখন সকালে বিকালে খুব কসে কোদাল পাড়ত তখন খাবার নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করত না এবং মোটা রুটি ও ডাল আশ্চর্য পরিমাণে খেতে পারত। ওদের শরীর তখন এখনকার চেয়ে ভাল ছিল। আমার তাই মনে হচ্চে সকালে কোনো এক সময়ে অন্তত দশ মিনিট কাল সব ছেলেকে মাটি খুঁড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যাতে সকলে সেটা রীতিমত করে এবং ফাঁকি না দেয় দেখবেন। বিকালে যে সব ছেলে ফুটবল না খেলবে তাদেরও এই রকম ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখবেন না। কারণ পরিশ্রম কালে বা বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজলে কোন অসুখ করেনা, বরঞ্চ নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে। দুই একজন ছেলের এক আধদিন একটু আধটু সর্দি হলেই ভয় পেয়ে যাবেন না। বরঞ্চ কড়া রৌদ্রটা খালি মাথায় ভাল নয়, রৌদ্রের সময় সব ছেলে যদি চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে শেখে তাহলে কোন ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু বৃষ্টির সময় বাইরে ব্যায়াম সেরে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি গা ভাল করে মুছে শুকনো কাপড় পরলে অসুখের কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সতর্ক হতে হবে যাতে খেলে এসে গায়ে জল না বসায়। দু একটি করে ছেলেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, বৃষ্টি হলে বেশ দ্রুতপথ চালনা করে চলবেন, দুচারদিন এমন করলেই রৌদ্রবৃষ্টি বেশ সয়ে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোটা নানা কারণে বিশেষ হিতকর। ইতি ১৮ই আষাঢ়

(স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত)

পত্র : সাত

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই আমি সব চেয়ে গুরুতর বলে মনে করি। আপনাকে যেমন করে হোক শিক্ষক তৈরি করে নিতে হবে। আপনার চালনা অনুসারে শিক্ষকেরা কাজ করে যাবে– আপনি তাদের কাজ সর্বদাই পরীক্ষা করবেন। পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেও ভেবে রাখবেন। যে সমস্ত বই তৈরি করা আবশ্যক তার প্রতিও কি দৃষ্টি দেবেন না?

(স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত)

পত্র : আট

একটা কথা মনে রেখো, আমি নন-কো-অপারেশনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মত প্রচার করতে চাইনে। ও-সমন্ধে তোমাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে তাতে লেশমাত্র ক্ষতি নেই– কেবলমাত্র কথা এই– আমাদের শান্তিনিকেতন পলিটিক্সের বাইরে। ৬ই মে ১৯২১

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত)

সহায়কপঞ্জি

গৌরচন্দ্র সাহা (২০১৮)। *রবীন্দ্রপত্র প্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী*। আশাদীপ, কোলকাতা।
শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯০)। 'অগ্রন্থিত রবীন্দ্র-পত্রাবলী : একটি সমীক্ষা'। *দেশ*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯০ এবং *দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

Revisiting Bilateral Trade Deficit between Bangladesh and India

Sharmin Sultana*

[Abstract : The study has been designed to revisit the reasons behind the bilateral trade deficit between India and Bangladesh using the latest available data. Both qualitative and quantitative methods have been used to explore the reason. The concept of Revealed Comparative Advantage theory and different trade indices has been used here to analyze the trade structure. The study has found that export structure of Bangladesh is not diversified. Complementarity between Bangladesh and India is very low. The study suggests that Bangladesh should diversify its product, reform exchange rate policy, and tariff policy to reduce its bilateral trade deficit with India.]

Key words : Bilateral Trade Deficit, Revealed Comparative Advantage, Export Intensity Index, Import Intensity Index

1. Introduction

The economy of Bangladesh is now considered as one of the most emerging developing economies. Bangladesh is going to celebrate its 50 years of independence. From 1971, economy of Bangladesh faces several ups and down. In spite of all the hurdles, economic growth of Bangladesh is remarkable. Within these fifty years, GDP growth rate increases significantly. Literacy rate and life expectancy improve remarkably. Bangladesh shows a great performance in case of poverty reduction, gender equality, health, quality education, and maintaining standard of living etc. At different times different schemes has been taken to pave the way of development. As remittance and export are the two major sectors of earnings, a large number of policies have been taken and agreement has been signed to improve the relationship with trading partners and neighboring countries. In 2020, subsidy has been declared for remittance earner to increase the remittance earning. Most of the remittances come from Middle East countries. Bangladesh major export partners are European Union, USA, China, India and most of the imports come from Thailand, India, China, Indonesia and Singapore. Among South Asian nations, India is the major trading partner of Bangladesh. Bangladesh shares five borders with India which is almost 4,096 kilometer long.

The relationship between Bangladesh and India always faces ups and down in different period of time from 1971. Various trade agreements have been signed

* Lecturer, Department of Economics, Rabindra University, Bangladesh.

between these two nations for the betterment of their development and trade. The very first agreement was signed in 1972. The last renewal of India-Bangladesh Trade Agreement was took place in June, 2015, at the visit of PM of India in Bangladesh for 5 years with the condition of auto renewal. In between different trade agreements was taken and renewed several times. The purposes of all of these agreements are to improve the trade relationship between Bangladesh and India. If the trade relationship between two neighboring countries is strong, it will help in development of both of these countries. Despite all of these agreements, Bangladesh always faces a huge amount of trade deficit. But bilateral trade takes place for the mutual betterment of both of the countries. Therefore, if one country always faces a deficit, it will eventually affect the long term relationship between these two countries. Bangladesh and India trade relationship is now in a situation that it is not beneficial for any of the country to run huge trade imbalance. Therefore, it is must to find out the reasons behind this trade deficit. Different studies have been conducted to find out the reasons of this deficit. Different researchers have tried to focus on different point of view. Some of them have used exchange rate as a main focus. Some have shown the impact of purchasing power parity in deficit. But most of the studies are not up to date.

Therefore, the objective of the study is to revisit the recent bilateral trade deficit pattern and explore the reasons that trigger this deficit using the most latest available data. Here larger data set has been used to show the trend. In this study, the basic reasons of bilateral trade deficit between Bangladesh and India are analyzed by figuring out the characteristics and structures of import and export of Bangladesh. The findings of the study may help in future policy implication.

2. Literature Review

As Bangladesh and India are neighboring countries, trade relationship between them plays an important role in their development. It is important not only for economic development but also for different political benefits of these two nations. Therefore, the trade relationship between them always captures the attention of researchers. At different period of time, different studies have been conducted on Bangladesh India bilateral trade.

Hossain and Rashid (1999) conducted an empirical study and concluded that bilateral trade between Bangladesh and India is not competitive at all because of the existence of trade barriers. They explained the role of these trade barriers in increasing trade deficit of Bangladesh.

Rahman (2005) in his study claimed that narrow productivity; bilateral exchange rate, tariff and non-tariff barriers were the reasons of trade imbalance between Bangladesh and India.

Bhuyan (2006) claimed that concentrated production structure of Bangladesh was probably the main cause of the trade imbalance between Bangladesh and India.

Basu and Datta (2007), using the Bangladesh- India trade data from 1990-2001 performed a study to find out India-Bangladesh trade relation. The study found that because of largeness and diverse resource of India, it always enjoys trade surplus. It also found that the export of Bangladesh falls short to compensate import because of dissimilarity with import demands of India with export supply of Bangladesh.

Rather and Gupta (2014), in their study highlighted that even in case of informal trade between Bangladesh and India, trade market was dominated by India. Import from India was much higher than the export to India.

Ali and Medhekar (2016), using time series forecasting from (1991-2014) indicates that although import of Bangladesh from India exceeds export of Bangladesh to India, it has a long term positive impact as it helps to attain sustainability in long run by improving product quality. The study also emphasized duty free export to increase the number of export.

In a nutshell, various researches have been performed regarding bilateral trade of Bangladesh and India. The result of all of these studies slightly differs from one another. It may be mainly because the methods and techniques used in these studies are different. Besides, in some studies data are used from 1970s. At that time, trade of Bangladesh was not remarkable. Therefore, using this kind of information may lead to spurious result. For that reason this study chooses to use the data from 1989 to 2016. This will help to avoid any kind of spurious result and revisit the recent trend.

3. Data and Methodology

28 years of data from 1989-2016, have been taken into consideration in this study. To conduct this study secondary data has been collected mainly from the website of World Integrated Trade Solutions (WITS). Some data has been collected from other different sources like Ministry of Finance and Export Processing Bureau. In the data set, there is some missing information. Interpolation method has been used to calculate those missing data.

Both qualitative and quantitative techniques have been used to conduct this study. To find out the root causes behind the bilateral trade deficit, different trade indices have been used to explore the structure of Bangladesh import and export. Two most widely used intensity index named-export intensity index and import intensity index has been used to calculate extend of trade flow between Bangladesh and India. The formulas used for calculating these indices are :

- Export intensity index–

$$x_{BI} = \frac{\frac{X_{BI}}{X_B}}{\frac{M_I}{M_W - M_B}}$$

Here, x_{BI} = Export intensity index of trade of Bangladesh with India
X_{BI} = Export of Bangladesh to India
X_B = Total exports of Bangladesh
M_I = Total imports of India
M_W = Total world imports
M_B = Total imports of Bangladesh

- Import intensity index–

$$m_{ij} = \frac{\frac{M_{BI}}{M_B}}{\frac{X_I}{X_W - X_B}}$$

Here, m_{BI} = Import intensity index of trade of Bangladesh with India
M_{BI} = Import of Bangladesh from India
M_B = Total imports of Bangladesh
X_I = Total exports of India
X_W = Total world exports

These two methods have been used to figure out the export and import pattern between two nations. Then, based on the concept of comparative advantage given by David Ricardo, formula of Revealed Comparative Advantage (RCA) theory has been also used here to explore the trade complementarity between Bangladesh and India.

- Here, RCA is defined as–

$$RCA_{Bj} = \frac{\frac{X_{Bj}}{X_B}}{\frac{X_{Wj}}{X_W}}$$

Where, RCA_{Bj} = revealed comparative advantage of country B in product j

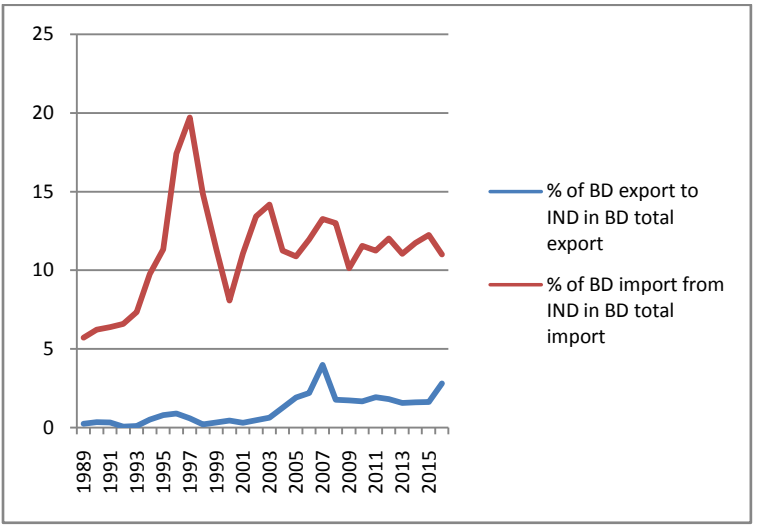
X_{Bj} = export of commodity j by country B
X_B = total export of country B
X_{Wj} = world trade of commodity j
X_W = total world trade

Different descriptive statistical analysis has also been performed with the data using statistical software to find out the characteristics of trade.

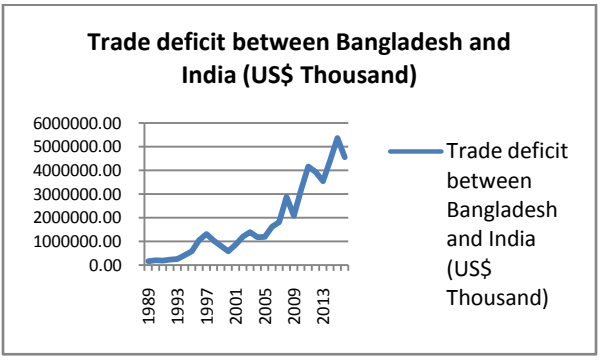
4. Analysis and Findings

4.1. Patterns of Bilateral trade between Bangladesh India

After liberation war, Bangladesh faced a huge economic challenge. Production system was damaged and the country needed a large amount of consumer goods. At that time, India expanded its hand to help Bangladesh. Gradually economy of Bangladesh started recovering. From the very first, imports of Bangladesh from India always exceed exports of Bangladesh to India and the result is trade deficit. In the year 1989, export of Bangladesh to India was $3321.42 (in thousand)which increased in a very slow pace over the period. At that time, import from India was $168698.56 (in thousand). Because of this huge gap, Bangladesh faced a large amount of trade deficit which was $165377.14 (in thousand). In 1990, export of Bangladesh increased by a small amount and became $5455.04 (in thousand). But import from India increased comparatively more which was $213135.87 (in thousand). Therefore in 1990, the trade deficit became $207680.84 (in thousand). So the trade deficit increased by 25.58%. In 2015, export of Bangladesh was $517890.71 (in thousand), import was $5882080.04 (in thousand) and therefore trade deficit was $5364189.32 (in thousand). In 2016, trade deficit became $4550000 (in thousand). Line graphs have been drawn to show the export, import and trade deficit pattern of Bangladesh.



Graph-1 : Export and import pattern of Bangladesh with India



Graph-2 : Pattern of Trade deficit between Bangladesh and India

The first graph reflects the huge gap between Bangladesh import from India and export to India. Using this gap second graph has been drawn to show the pattern of deficit. The export of Bangladesh always follows a steady pattern where imports have ups and down. Trade deficit of Bangladesh follows an increasing pattern except some year.

4.2. Revealed Comparative Advantage

Various studies have been conducted on bilateral trade deficit between India and Bangladesh. All of the studies found different reasons behind this trade deficit. The term trade basically arises because one country cannot produce everything efficiently. Therefore, by exchanging the products among them, they can make themselves better off. A country will exchange those products to other countries in which they have comparative advantage. Therefore, trade took place based on the concept of comparative advantage. Here, formula of Revealed Comparative Advantage (RCA) has been used to find out the dissimilarity between Bangladesh's export and India's import. Revealed comparative advantage identifies the product in which a country has comparative advantage to produce. The RCA of Bangladesh for the products which are mostly demanded by India is–

Product Group	Import product share of India (%)	RCA of Bangladesh
Capital goods	20.32	0.21
Consumer goods	10.85	4.64
Intermediate goods	34.41	0.62
Raw materials	31.64	0.76
Chemicals	9.53	0.48
Fuels	26.78	0.12
Mach and Electronics	17.38	0.09
Metals	6.82	0.8
Stone and Glass	15.85	0.02

Table-1 : Product list of large import share of India and their RCA (Year-2015, source-WITS)

The value of Revealed comparative advantage varies from zero to infinity. If the value of RCA is one or more than one, it indicates that the country has revealed comparative advantage in producing this product. If the value is less than one, it means the country does not have any comparative advantage in producing that good. The second column of table-1 shows import product share of India and the third column of table-1 shows the value of revealed comparative advantage of Bangladesh to produce that product. It can be seen that India's import demand does not match with the Revealed comparative advantage of Bangladesh. Here, India imports almost 34% intermediate goods in 2015, but the value of RCA for Bangladesh is 0.62. It means Bangladesh is not efficient enough to export intermediate goods. Again, India imported 31.64% of raw materials in 2015, where Bangladesh RCA value is 0.76 for raw materials. This indicates that Bangladesh does have comparative advantage to export raw materials. Similar things happen with the other import demand of India except consumer goods. Only in case of consumer goods, the value of RCA is 4.64. Therefore, complementarity between Bangladesh and India is very low. This is one of the reasons behind this huge trade deficit of Bangladesh with India. On the following table, import share of India in case of those goods on which Bangladesh has Comparative advantage is given–

Product Group	**Import product share of India (%)**	**RCA of Bangladesh**
Animal	0.04	81.12
Food Products	0.52	5.96
Footwear	0.14	13.93
Hides and Skins	0.26	11.99
Minerals	2.20	1.61
Textiles and Clothing	1.50	37.71
Transportation	3.32	1.01
Vegetable	4.88	1.24

Table-2 : Product list of high RCA value of Bangladesh and their Import share of India (Year-2015, source-WITS)

Bangladesh has huge comparative advantage on animal exporting and textiles and clothing. Import demand of India was very less for these products. India has also comparative advantage for these similar products. Because of this mismatch between import demand and comparative advantage, Bangladesh cannot export much to India. This triggers the trade deficit.

4.3. Export Intensity Index

Export intensity index basically shows whether the trade flow between two partner countries is small or large. It indicates whether a country is trading more with its partner country than it should be. Export intensity index can be obtained

by calculating the share of one country's export with partner country in its total export and then dividing this share by the import share of partner country with world except that country.

The value of export intensity index varies from 0 to 100. The value 0 indicates that nothing is exported from one country to other. It means there is no trade relationship between them. Larger value of export intensity indicates that one country is exporting more to other country. If the value is close to 100, it means a country exports significant amount of products to its partner country. If the value exceeds 100, it means amount of exports between two partner countries is more than it should be if considered its share in world trade.

Export intensity index from 1989-2016 is given in the following table–

Year	**Export Intensity Index of Bangladesh with India**
1989	4.018
1990	4.766
1991	6.820
1992	7.808
1993	9.337
1994	13.906
1995	16.699
1996	25.947
1997	29.993
1998	23.508
1999	16.749
2000	13.444
2001	17.251
2002	19.351
2003	20.164
2004	15.132
2005	12.434
2006	13.169
2007	13.910
2008	12.596
2009	7.908
2010	8.811
2011	7.513
2012	8.358

2013	6.887
2014	7.686
2015	8.358
2016	8.952

Table-3 : Export Intensity Index of Bangladesh with India

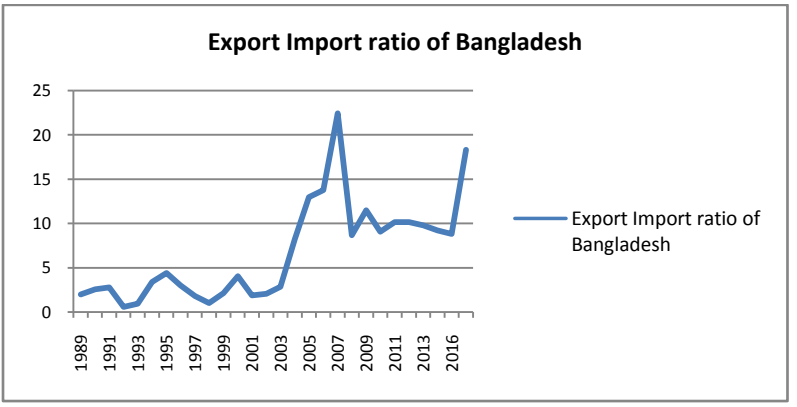
In 1989, the value of export intensity index of Bangladesh with India was 4.018 which indicated that Bangladesh exported an insignificant amount of products to India. Then it started increasing. In 1997, it became very high which were 29.993. After that it started decreasing again. From 2009 to 2016, it followed a steady patternand varied within 6 to 8.

4.4. Import Intensity Index

Trade intensity index can be used to find out both export and import orientation of a country with its partner country. In 1990, import intensity index is 8.75. In 1995, it increased to 25.36 which were very high. It indicates that Bangladesh import a significant amount of products from India. In 2000, it slightly reduced to 17.001 which again increased in 2001 to 20.11. In 2003, import intensity index of Bangladesh with India was 20.61. Therefore, it can be seen that import relationship between Bangladesh and India was always strong. India occupies a large portion of Bangladesh import market.

4.5. Export-Import Ratio

Export import ratio of Bangladesh also reflects the trade condition. In 1989 it was 1.97% which means export was very low compare to import. Although situation was improved in between 1990-2003 by a small amount, it was not remarkable. In 2015, export import ratio of Bangladesh became 8.80% and in 2016, it increased drastically to 18.31%.



Graph-3 : Export-Import ratio of Bangladesh

In this line graph, it can be seen that export import ratio followed an up-down pattern from 1989 to 2003 but the changes were not huge. After 2003, it started increasing drastically. It became in its peak on 2007. After that, it started falling again. From 2009 to 2015, it was quite stable. In 2016, it again started increasing.

4.6. Product Concentration ratio

In 1989, 54% export of Bangladesh was intermediate goods, 38% was consumer goods, 40% was textiles and clothing, 23% was chemicals, 20% was vegetables. Export structure of Bangladesh, except some exception, did not change much over the period. It was not diversified. Export share kept changing among these certain goods and services. In between 1989-2015, sometimes Bangladesh started exporting some new goods which did not last long. From 1993-2003, Bangladesh started exporting chemical to India largely. In 1995-97, chemical export occupies above 90% of total export to India. But from 2004, it started decreasing. In 2015, it was only 2.14% and in 2016, it was 2.24%. Export of raw materials also changes over the periods. Although export of consumer goods was large in 1989, it started reducing from 1990. Then after 2001, it again started increasing. Export of intermediary goods also faced ups and down over the period. In 2015, 56% of Bangladesh export to India was occupied by consumer goods, 63% by textiles and clothing, 21% by raw materials, and 19% by intermediate goods. In 2016, there was no remarkable change in the ratio of exported product. Although the percentage of product's export changed, products pattern did not change. So, the export of Bangladesh is highly concentrated. Previously export of Bangladesh was concentrated to leather, fertilizers, chemicals etc. Now-a-days, Bangladesh's main exports product to India are- made up textiles articles, apparel and clothing accessories, cotton, textiles fibers, paper yarn and woven fabrics of paper yarn, mineral fuel, mineral oil, bituminous substances, minerals, raw hides , skins, leather, animal vegetables fat, footwear, lead and articles, fish, dairy product etc. In table-4, a brief scenario of Bangladesh product's share in export has been shown :

Product Group	**Indicator**	**1989**	**1995**	**2000**	**2005**	**2010**	**2015**	**2016**
Capital goods	Export Product Share (%)	4.96	0.03	6.06	3.41	2.77	2.94	2.98
Consumer goods	Export Product Share (%)	38.21	6.56	8.24	18.78	38.58	56.22	57.10
Intermediate goods	Export Product Share (%)	54.64	92.54	83.03	42.76	18.23	19.07	18.91
Raw materials	Export Product Share (%)	2.00	0.76	2.32	35.04	40.42	21.75	20.45

Chemicals	Export Product Share (%)	23.99	91.41	76.18	25.71	1.08	2.14	2.24
Hides and Skins	Export Product Share (%)	9.68	0.64	2.69	1.66	4.33	3.15	3.10
Textiles and Clothing	Export Product Share (%)	40.04	0.09	10.15	39.92	57.74	63.16	68.76
Vegetable	Export Product Share (%)	20.24	0.53	1.79	12.56	6.26	6.47	6.23

Table-4 : Mostly exported product of Bangladesh and their share in export

5. Importance of Bangladesh-India Bilateral trade

5.1. Export share and its role

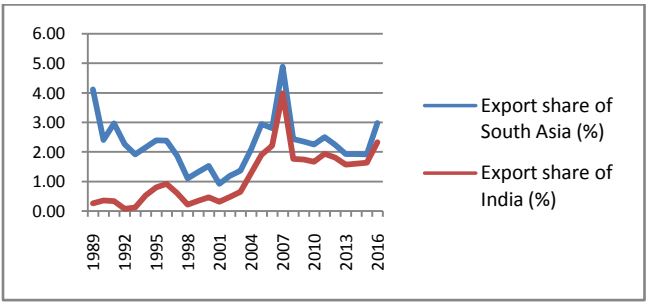
Export of Bangladesh to India is very less. In 1989, only 0.25% export of Bangladesh entered into India's market. In 2015, it increased to 1.63% which met up only 0.13% of India's import demand. In 2016, it drastically increased to 2.32% which met up almost 1% of India's import demand. Although this amount is very low, it is a matter of hope that it has been increasing day by day. The amount of product Bangladesh exported to India does not have a large impact on any of these countries trade market. Following table show the contribution of Bangladesh export from 1989-2016 both in the trade market of Bangladesh and India.

Year	**% of Bangladesh export to India in Bangladesh's total export**	**% of Bangladesh export in India's import**
1989	0.250	0.015
1990	0.350	0.023
1991	0.325	0.028
1992	0.066	0.005
1993	0.107	0.010
1994	0.519	0.051
1995	0.792	0.074
1996	0.908	0.082
1997	0.595	0.058
1998	0.205	0.024
1999	0.334	0.035
2000	0.453	0.047
2001	0.306	0.033

2002	0.469	0.044
2003	0.637	0.056
2004	1.273	0.106
2005	1.905	0.126
2006	2.205	0.145
2007	3.985	0.240
2008	1.762	0.087
2009	1.735	0.101
2010	1.661	0.091
2011	1.935	0.102
2012	1.808	0.091
2013	1.561	0.082
2014	1.601	0.098
2015	1.632	0.133
2016	2.321	0.197

Table-5 : Role of Bangladesh export in trade market of Bangladesh and India

In 1989, among South Asian countries Bangladesh's export share of India was very small. In Bangladesh's total export, 4.11% was exported to South Asia, where the share of India was only 0.25%. But it is increasing day by day. In 2000, it was 0.45% out of 1.52% of total export to South Asia. In 2005, Bangladesh exported to South Asia 2.94% of its total export where share of India was 1.90%. In 2015, total export to South Asia was 1.91% and total export to India was 1.63%. In 2016, total export to South Asia was 2.97% where share of India is 2.32%. Export of Bangladesh to India is increasing in a very slow pace. But it is hopeful that the percentage is increasing. The trend of rise in export share of India among the export share of South Asian nations in Bangladesh trade market is shown by the following graph–



Graph-4 : Export share of South Asian Nations and India in Bangladesh export market

5.2. Import share and its role

Among different countries of world, India occupies a large amount of import market of Bangladesh. Every year Bangladesh imports a huge amount of products from India. It has been seen that in 1989, almost 5.71% of imports of Bangladesh came from India. Day by day, it is increasing. In 1996 and 1997, the percentage became very high. At that time almost 17.39% and 19.69% imports came from India. Then it started reducing. But most of the time, it was above 10%. In 2015, almost 12.24% import of Bangladesh took place with India which was almost 2.22% of India's export. In 2016, 12.44% of import came from India. The contribution of Bangladesh import from 1989-2016 both in the trade market of Bangladesh and India has been presented by the following table–

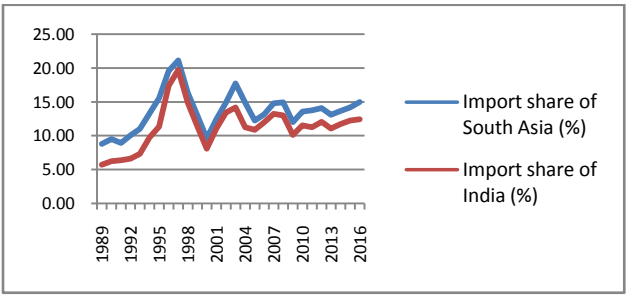
Year	% of Bangladesh imports from India in Bangladesh's total import	% of Bangladesh import in India's export
1989	5.71	0.99
1990	6.21	1.19
1991	6.37	1.12
1992	6.58	1.10
1993	7.34	1.16
1994	9.75	1.66
1995	11.31	1.94
1996	17.39	3.23
1997	19.70	3.84
1998	14.83	3.13
1999	11.31	2.24
2000	8.07	1.45
2001	11.06	2.03
2002	13.41	2.47
2003	14.17	2.42
2004	11.24	1.68
2005	10.86	1.37
2006	11.96	1.55
2007	13.24	1.60
2008	12.98	1.74
2009	10.12	1.33
2010	11.54	1.60
2011	11.23	1.54
2012	12.02	1.51
2013	11.04	1.16
2014	11.73	1.54
2015	12.24	2.22
2016	12.44	2.31

Table-6 : Role of Bangladesh import in trade market of Bangladesh and India

From 1989 to 2016, majority of Bangladesh imports were intermediate goods, textiles and clothing, raw materials, consumer goods, capital goods, vegetables, mechanical and electronics, chemicals etc. In 2015 almost 41% was intermediate goods, 33% was textiles and clothing 21% is raw materials, 20% was consumer goods and 17% was capital goods. The ratio was almost same in 2016. Among

products Bangladesh mostly imports cotton, man-made filaments, textile materials, man-made staple fibers, organic chemical, minerals, mineral oil, fuel, iron and steel, articles of iron and steel, knitted and crocheted fabrics, cereals, edible vegetables, coffee, tea, mate, spices, machinery and machinery appliances, nuclear reactors, boilers, electrical machinery and appliances, vehicles and parts of accessories, plastics and articles, chemical products, tanning and dyeing extracts, residuals and waste from food industry, oil seeds, milk and milk products, dairy products etc.

Among the South Asian countries, most of the import of Bangladesh comes from India. To be precise, in 1989 in total import of Bangladesh 8.79% of imports came from South Asian's countries where 5.71% was from India. In 1990, imports from South Asian's countries were 9.49% where 6.21% was from India. Day by day it is increasing. In 2015, import share of South Asian countries was 14.18% where import share of India was 12.24%. In 2016, import share of South Asian countries increased to 14.95% where import share of India was 12.44%. A line graph has been drawn to show the import share of India and South Asian countries in Bangladesh total import.



Graph-5 : Import share of South Asian Nations and India in Bangladesh import market

In the above graph, it can be seen that the line of import share of India is almost close to the line of import share of South Asia. Therefore, among the South Asian countries, India has a large contribution in Bangladesh import.

6. Conclusion

This study has been conducted to explore the reasons behind the huge bilateral trade deficit between Bangladesh and India. By analyzing the trade structure of Bangladesh, it has been found that the export structure of Bangladesh is more concentrated. The value of trade intensity indices of Bangladesh indicates that trade relationship between India and Bangladesh is stronger in case of import. Bangladesh export fewer products to India as it does not have comparative advantage. Therefore, to reduce the trade deficit, Bangladesh should diversify its production. Special attention should be given to the exchange rate policy. Tariff policy with India should be more liberal. Bangladesh is going to enter into the list

of middle income nations. Therefore, the benefit that is taken by Bangladesh in trade as a LDC country will no longer exist. It will make the trade situation of Bangladesh more complicated. However, at that situation, it will be tough for Bangladesh to continue this huge trade deficit with India. So, the present situation of Bangladesh necessitates the emergence of awareness as focus of attention followed by some effective pursuits to improve the bilateral trade deficit situation with India for its sustainable development.

References

A. Hossain and S. Rashid (1999), "The political Economy of Bangladesh's Large and Growing Trade Deficits with India," *The Pakistan Development Review*, 38(1).

A.R. Bhuyan (2006). "Bangladesh-India Trade Relation Prospects of a Bilateral FTA," *Thoughts on Economics*, 18(2).

M. M. Rahman (2005). "Bangladesh-India Bilateral Trade : Cause of Imbalance and Measures for Improvement". Working Papers-1, University of Sydney, School of Economics.

M.M Ali and A. Medhekar (2016). "Bilateral Trade through Official Channel between India and Bangladesh : An Analysis with the Use of Time Series Forecasting Models." *Journal of Economic Cooperation and Development*, 37, 3 (2016).

Mohammad Rahman. (2008). "The foreign trade of Bangladesh: its composition, performance, trend, and policy". *Journal of Bangladesh Studies*, 9.

S. Basu and D. Datta (2007). "India-Bangladesh Trade Relations : Problems of Bilateral Deficit." *Indian Economic Review*, New Series, 42(1).

World Bank (2006). "India-Bangladesh Bilateral Trade and Potential Free Trade Agreement". *Bangladesh Development Series*, Paper No.–13, The World Bank Office, Dhaka, December.

Z. A. Rather, and D. Gupta (2014). "India-Bangladesh Bilateral Trade : Problems and Prospects". *International Affairs and Global Strategy*, 22.

www.hcidhaka.gov.in

https://www.trademap.org

https://wits.worldbank.org

https://mea.gov.in

Possibilities and Obstacles of Archaeological Tourism in Bangladesh : A Case Study of Nabaratna Temple Compound

Md. Rifat-Ur-Rahman*

[Abstract : In the global context, tourism is an effective currency earning industry. In Bangladesh, tourism has not yet been established as a well-planned industry. The development of the tourism industry is closely linked to the development of the country's economy and cultural diversification. However, the cultural heritage of this country is neglected both quantitatively and immeasurably. But, in terms of tradition, Bangladesh is much more prosperous than many nations in the world. There are so many archaeological sites are identified all over the country without being proper preservation. Therefore, many archaeological sites are facing destruction due to a lack of proper preservation. However, with proper conservation and development of infrastructural facilities, the archaeological sites of Bangladesh can be a tourist attraction for both national and international tourists. There is ample opportunity to develop the archaeological tourism industry of the country. One such aesthetic and potential archaeological site is the Nabaratna temple located in the Sirajganj district. In the present study, the possibilities and obstacles of archaeological tourism around the Nabaratna temple have been presented.]

Key Words : Archaeological Tourism, Nabaratna Temple, Cultural Heritage Management

The importance of the tourism industry is immense among the lucrative sectors of the world today. This industry refers to a place where visitors travel for recreation or gather knowledge (Mathienson and Wall 1982 : 87). The visitor gains entertainment and gets an idea of the region's people, society, and culture (Cooper, 2008; Holloway & Taylor, 2006). The people of a region can be economically self-sufficient through the tourism industry. In addition, the tourism industry is a service sector where to attract visitors, and one has to ensure their food, accommodation and recreation (Machintosh and Goeldner 1986 : 50). Nowadays, many countries have managed their domestic and foreign exchange earnings by improving the quality of the tourism industry (Nasser, 2003, pp. 467-479). The industry is directly linked to the development of communication systems, hotel and restaurants system, banking, tourist guide and recreation (Poria et al. 2003 : 89; Silberberg, 1995, pp. 361–365). Looking at our neighbouring country India, it can be seen that their archaeological sites are

* Lecturer, Department of Cultural Heritage and Bangladesh Studies, Rabindra University, Bangladesh.

considered as one of the sources of revenue as they have taken appropriate measures to attract tourists (Bhatia 2012: 45). Since our country is rich in natural beauty and cultural heritage, there is a tremendous possibility to develop the archaeological tourism industry.

The role of the community is much more critical in the development of the tourism industry based on cultural heritage. Suppose the tourism industry, based on the region's cultural heritage, can be developed by giving importance to the community. In that case, the area will be formed as an Innovative Habitat through which local and foreign visitors will be able to entertain and gain knowledge. At the same time, a new way of earning money for local people will be opened. Thus the cultural tourism industry will also play a significant role in economic growth (Advisory Council on Historic Preservation, 2002).

In the global context, cultural heritage management has emerged as a challenge for many communities. Standard quality accommodation, good quality food, communication system, security, etc., are essential elements for the expansion of tourism. In this case, the community has to be hospitable; particular attention has to be paid so that the tourists are not dissatisfied in any way (Nasser, 2003, pp. 467-479).

Tourists visit European cultural heritage tourism industries, especially festivals, banquets, music, theatre shows, village and rural life such as farm or Sunday market, local production, general sightseeing, rural buildings and environment, historical and religious monuments or famous people's homes (Barre, 2002, pp. 126-130). To brand a heritage, people from all over the world need to visit the area. European cities usually present their cultural cities in this way. Therefore, enthusiastic people from various parts of the world became interested in seeing those heritages (Evans, 2003, pp. 417-440). Heritage refers to the culture, performing arts, museums, archaeological sites, etc. Besides, people are curious about history, archaeology, archaeological sites, art, lifestyle, architecture, scenery etc. Tourists see these traditions to fulfil their aspirations (McCain & Ray, 2003, pp. 713-717).

According to Rosenfeld, the expansion of the cultural heritage tourism industry requires assessing the significance of a place or heritage, emphasis on quality, comprehensible to visitors, historical buildings, monuments, museums, archaeological sites and historical sites for visitors. Besides, festivals, crafts, ethnic heritage, music, ethnic music etc., need to be presented. The culture of minorities also needs to be given to visitors (Rosenfeld, 2008, 6-7). Cultural heritage is generally analyzed from these three dimensions; cultural, political and economic. From a financial perception, it is possible to achieve economic growth through proper management (Tunbridge & Ashworth, 1996).

On the other hand, information technology is required to present the heritage to the public. The heritage site manager will demonstrate the informative image of

the site in a global context. Even if it is far away, interested tourists can get an idea of the heritage of a place (Pearce, 1982, pp. 145-164). With the advent of the Internet worldwide these days, tourists will be more inclined to travel if site-related data is available on the Internet (Hurbert, 2001 pp. 312-333).

Based on cultural heritage, the tourism industry has been discussed academically all over the world for the last few decades. In the current context, cultural heritage is seen as one of the significant components of the tourism industry that inspires consumers to explore and travel to cultural heritage (Swarbrooke, 1994, pp. 222-229). The tourism industry based on cultural heritage is essential in many ways; firstly, it has a positive economic and social value; secondly, it plays a role in creating identity and preserving heritage; thirdly, it harmonizes people and their culture (Nuryanti, 1996, pp. 249-260).

Simultaneously, investing in the development of tourism infrastructure around the country's archaeological sites is likely to become one of the primary sources of incomes for the country (Richards and Munsters, 2010: 3). In this study, Nabaratna Temple in Sirajganj district has been selected as a case study to pursue the possibilities and obstacles of archaeological tourism. The research work was carried out using primary and historical sources. And the methodologically archaeological survey and questionnaire-based interviews were conducted. Identifying the possibilities and the obstacles of archaeological tourism in the country is the main objective of this study.

1. Research Methodology

This study is primary data-based research. Besides, historical sources were used to understand the historical context of the Nabaratna temple. Methodologically, an archaeological survey was conducted, and interviews were taken on 200 visitors from local and other districts through the questionnaire. Of these, 72 were college and university students, 40 teachers from different schools, colleges and universities. Twenty-four people engaged in the agriculture profession, 30 people engaged in small and medium trade. There were also 30 unemployed youths and four rickshaw pullers.

2. Objective

The objective is to identify the possibilities and the obstacles of the country's tourism industry. Review what steps should be taken to develop archaeological tourism in the country by formulating a specific policy to identify the obstacles and presenting the need to preserve the archaeological sites for visitors and future generations.

3. Study Area

Sirajganj is located in the northern part of Bangladesh. This district is significant for its cultural and natural heritage. The location of Nabaratna temple is at

Hatikumrul village under Ullapara upazila in Sirajganj district. Locally the temple is also known as Dolmancha. The main spire of this three-storied temple is nine. That is the reason to call it as Nabaratno temple. To the east is the entrance, to the north is the staircase, inside is the roof covered with a round shape dome above the main building. The central chamber is thought to have been used for worship. The reason for choosing the Nabaratna temple as the subject of this research is the aesthetic construction style of the temple. It is also speculated that this may the largest Nabaratna temple found in Bangladesh.



Figure 1 : Nabaratna Temple. Source: Author.

The plaques are carved by gods and goddesses, full of medieval artwork, quite aesthetic and of high quality. There is also a *Dochala* temple and a *Shiva-Parbati* temple in the open space in front of the Nabaratna temple.

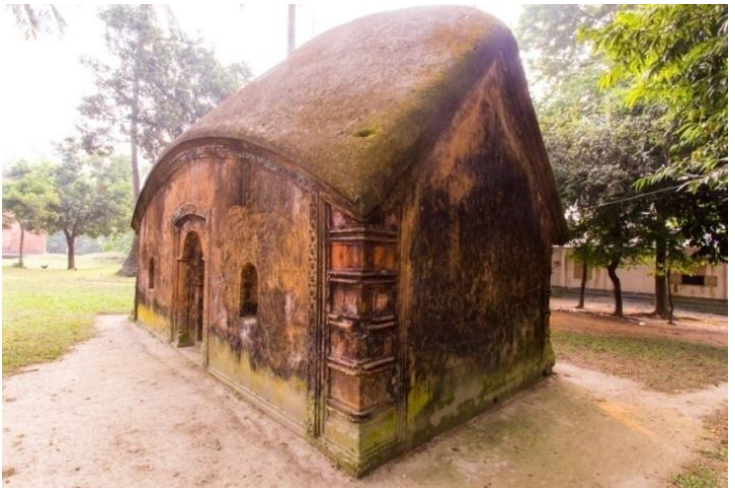


Figure 2 : Dochala Temple. Source: Author.



Figure 3 : Shiva-Parbati Temple. Source: Author.



Figure 4 : Shiva Temple. Source : Author.

Four temples, including the Nabaratna temple, are unique archaeological sites built in terracotta poetry. There is no defensive wall around the complex.

4. Archaeological Significance

The Nabaratna temple is an archaeological site protected by the Antiquities Preservation Act of 1968. However, every archaeological site is undoubtedly significant. In terms of the features, the Nabaratna temple is a unique artistic specimen of Bangladesh.



Figure 5 : Notice for preservation. Source : Author.

The area of the temple is about 16 square meters. It is built on a high altar; the temple is around 15.5 meters long and 13.25 meters wide on each side. The main room is inside this square temple, the sanctum sanctorum with two verandas. There are 6 entrances on the outside of the veranda and 5 entrances on the inside. It is estimated that the temple had nine pinnacles; hence it is known as the Nabaratna temple. The bricks and terracotta plaques of the temple are made of various ornaments. The temple is full of medieval works of art, decorated with flowers, birds, plants and deities.

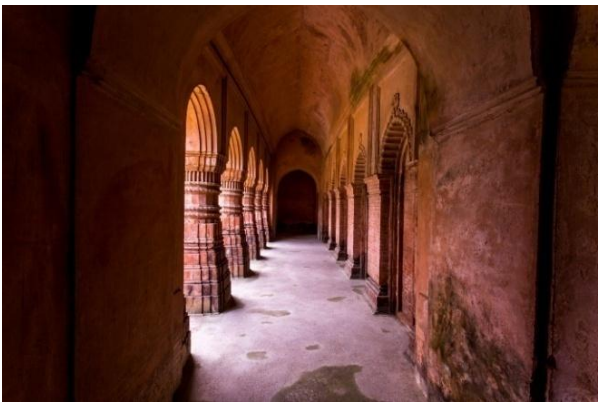


Figure 6 : Inside of the temple. Source : Author.



Figure 7 : Aesthetic artwork of terracotta. Source : Author.

It is assumed that Ram Nath Bhaduri, an official of Nawab Murshid Quli Khan built this temple during 1704 AD-1728 AD. During the reign of Nawab Murshid Quli Khan of Murshidabad in 1722, *Suba-Bangla* was divided into 13 Chaklas, 24 *Government* and 8 *Mahals*. Ram Nath Bhaduriwas probably a Zamindar (landlord). Since the construction period of Nabaratna temple is not known exactly, it is difficult to estimate the construction period of the other three temples as well. However, evaluate by the construction materials; it can be assumed that the Nabaratna temple and the other temples are contemporary.

5. Result and Discussion

During the archaeological survey, a questionnaire-based interview was conducted on visitors from local and other districts. The questions were mainly about their perception of the Nabaratna temple, about the prospects of archaeological tourism, about the significant issue for the development of tourism, their observation, obstacles to the development of archaeological tourism. The answers of the interviewees mentioned below:

5.1. Concept Rate about Nabaratna Temple

According to the first question of the interview, the result was about 50 of the interviewees know the Nabaratna temple very well. 60 people know something. 6o people have no idea, and 30 people have no interest in knowing.

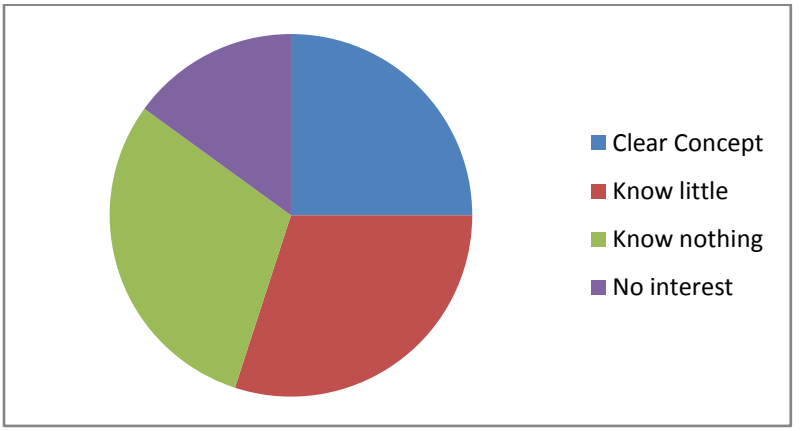


Figure 8 : Concept rate about Nabaratna temple.

There are some descriptions of the historical context of the Nabaratna temple on the signboard in front of the temple for the visitors. But in the development of the tourism industry, the scope of knowledge of the visitors can be further expanded through skilled guides. If there were tourist guide facilities, the visitor of any profession could know the details about the archaeological background of the Nabaratna temple.

5.2. Possibilities for Archaeological Tourism

When asked about the development of archaeological tourism around the Nabaratna temple, 40 of the interviewees said that the potentiality is much higher. 60 people said there is little possibility to develop archaeological tourism. 50 people said there is no possibility and 50 peoples have no idea about it.

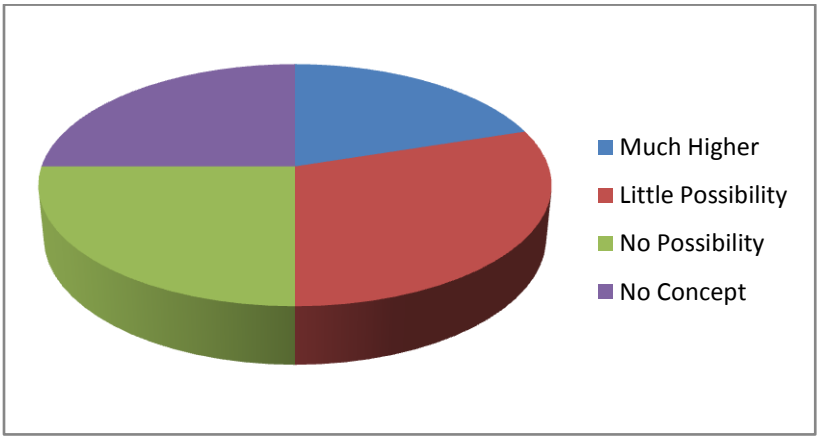


Figure 9 : Possibilities of Archaeological Tourism.

In the context of this question, it has been noticed that there is not much awareness among the people for the development of archaeological tourism industry in Bangladesh. Of the 200 interviewees, 50 have no idea about archaeology. Therefore, Bangladesh Parjatan Corporation (Bangladesh Tourism Corporation) needs to take the initiative to spread the idea among the people.

5.3. The important issues for the Development of Tourism Industry

In response to the question of what is important in the Nabaratna temple for archaeological tourism. 76 people said that there should be security measures. 60 people said that there should be accommodation and food facilities. 24 said that there should be a playground for the children and 40 said that there should be restroom for the visitors.

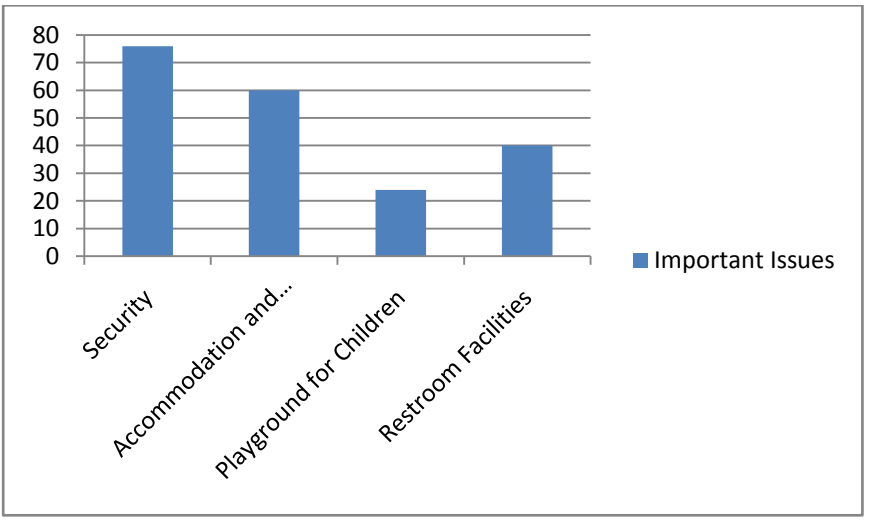


Figure 10 : Required facilities to develop tourism.

Visitors come from far and wide to see this temple. According to the visitors, there should be proper security, accommodation and food facilities, playground for children and restroom facilities for the visitors.

5.4. Obstacles to the Development of Archaeological Tourism

What are the main obstacles in the development of archaeological tourism- 60 visitors respond that there is no accommodation facility. 44 people felt that there was a lack of adequate security. 24 people said that there is no good food service. 50 people said that there is no entertainment other than visiting the archaeological site, and 22 said that there is no restroom facility for the visitors.

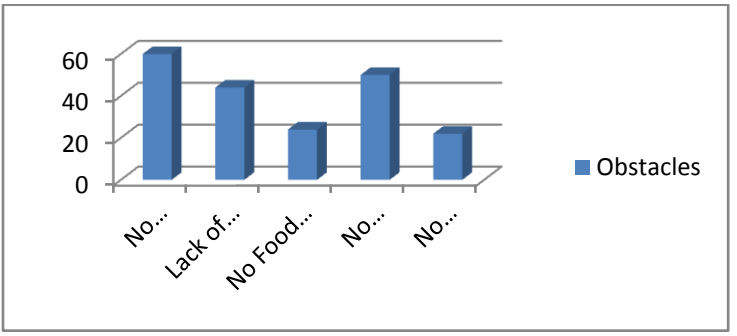


Figure 11 : Obstacles to the Development of Archaeological Tourism.

Some obstacles have been observed in the development of the archaeological tourism system of the Nabaratna temple. Visitors said in interviews that there is no accommodation for overnight stays, there is a lack of security, no good quality food shops, no arrangement for entertainment and no restroom facilities. The visitors think that it is important to consider the above issues to develop a tourism system around an archaeological site.

6. Recommendation

One of the special features of the Nabaratna temple is that there are three other aesthetic temples here. All temples are located in an open space. There is no protective wall around the four temples. However, during the fieldwork, it was observed that the locals did not much damage the site. The potential for archaeological tourism is greatly enhanced when the locals themselves take the responsibility of taking care of the archaeological site. Based on the data collected from the research, some recommendations for the development of Nabaratna temple based archaeological tourism are mentioned:

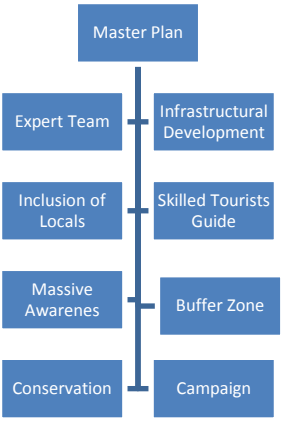


Figure 12 : Recommended Master Plan.

6.1. Expert Team

The issue of archaeological tourism is completely new in the context of Bangladesh. In order to present this new issue as a sustainable one, it is necessary to ensure the proper preservation of the archaeological site and the formulation of its tourism-based infrastructure. An expert team consisting of archaeologists, tourism management experts, cultural heritage management experts and archaeological site conservation experts should be formed. Firstly, an initiative should be taken to protect the archaeological site properly. Secondly, an expert team can be formed to make sustainable archaeological tourism.

6.2. Infrastructural Development

Among the most important aspects of the development of the tourism industry are the developments of communication system, accommodation, food facilities, restroom facilities, etc. The road to the Nabaratna temple though built. However, there is no overnight stay facility in the vicinity of the site. There is no good quality food shop and restroom. These issues need to be considered seriously in the development of archaeological tourism. Visitors come to this place from far and wide within the country, and even if someone from abroad comes to visit, it must be ensured that they can spend the night safely around the site. These issues are also reflected in the questionnaire-based survey on visitors.

6.3. Inclusion of Locals

Local people live in the vicinity of Nabaratna temple. If the locals do not know about the importance of the site, they will not take the initiative to protect the heritage. Besides, if arrangements are made for poor people to earn money on the basis of archaeological sites, they will be encouraged to preserve the archaeological site on their own initiative. In that case, the initiative can be taken to train local peoples as a tourist guide, arrange stalls to sell handicrafts to those who can make handicrafts etc. For example, Sirajganj is famous for its loom industry. So, visitors can visit the Nabaratna temple and buy the loom product simultaneously if there is a stall for loom product. As a result, employment opportunities would be possible for the locals through the Nabaratna temple based tourism.

6.4. Skilled Tourists Guide

Notably, there is no tourist guide in the Nabaratna temple. Visitors cannot get a good idea about the history and heritage of Nabaratna temple due to lack of tourist guide. In that case, an initiative should be taken to provide tourist guide facility for the visitors. It is highly recommended selecting a guide from the local village. As a result, visitors will get an idea about the historical context of Nabaratna temple. In addition, the guide must be well trained and be able to communicate with foreign visitors when they come from abroad.

6.5. Buffer Zone

Nabaratna temple is protected by the Antiquities Preservation Act, 1968. In addition to this temple, there are three other temples located around the Nabaratna temple. In order to properly preserve all the four temples, mechanical vehicles and noise pollution should be prohibited within the radius of at least one kilometer from the centre of the Nabaratna temple. There is a risk of an archaeological site being damaged by mechanical vehicles are much higher. In that case, car parking has to be arranged outside the buffer zone. The unnecessary movement inside the protected compound should be strictly prohibited.

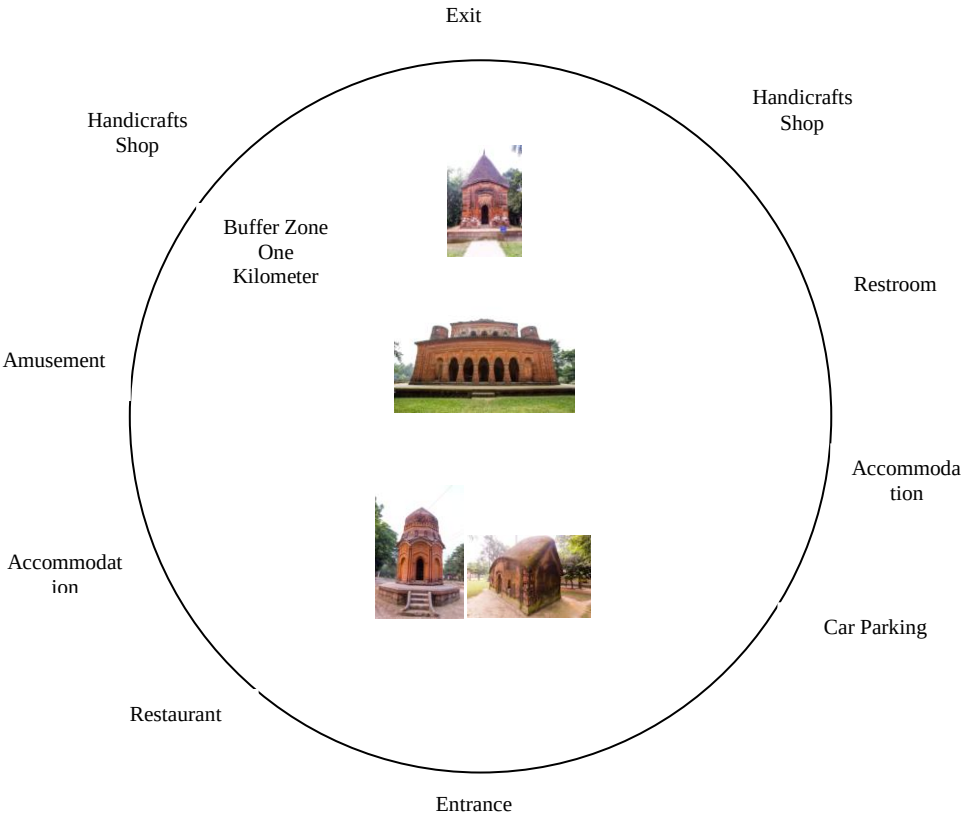


Figure 13 : Hypothetical Buffer Zone of Nabaratna Temple Area.

6.6. Massive Awareness

The local school, college, madrasa, needs to arrange awareness program to make the local awareness about the preservation of the heritage. Nabaratna temple

based seminars, symposium should be organized. Leaflets, handbills need to be distributed among the local people to raise awareness. The initiative should also be taken to raise awareness among the visitors. Dustbin should be provided for the disposal of dirt inside the buffer zone. A massive awareness program should be initiated to build sustainable archaeological tourism.

6.7. Conservation and Preservation

It was observed that cracks have appeared in several places on the surface of the Nabaratna temple. Therefore, more visitors should not be allowed to enter the temple at once. Also, the damaged part needs to be restored. Few terracotta plaques are fully destroyed of the *Shiva* temple. Replica plaques can be arranged in the destroyed part of the temple. Damaged parts need to be repaired. However, the characteristics of the archaeological site cannot be distorted.

6.8. Campaign

A campaign program should be initiated to promote the importance of the archaeological heritage of Bangladesh. Electronic and print media such as Bangladesh Television, Bangladesh Betar, other private TV and radio channels and national dailies can promote the archaeological tourism of this country. In addition, domestic and international flights of Bangladesh Biman should have interesting souvenirs and magazines related to Bangladesh's archaeological tourism so that passengers become interested to know and see the archaeological site of the country.

7. Conclusion

Bangladesh has plenty of opportunities to develop archaeological tourism. In that case, a sustainable master plan should be initiated. As a result, the country's archaeological resources will be protected and earning source will be generated. Moreover, these archaeological sites can be one of the primary sources of income (Ivanovic, 2008: 27). A large number of tourists from home and abroad will visit the archaeological sites of the country if the visible obstacles remove properly. And since the people of this country are known as a hospitable nation in the world, it will also play a special role in the development of the archaeological tourism industry.

References

A. K. Bhatia (2012). *Tourism Development Principles and Practices*,Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Advisory Council of Historic Preservation. (2002), *Heritage Tourism and the Federal Government*, Federal Heritage Tourism Summit, Report of Proceedings, Washington DC.

Alister Mathieson & Geoffrey Wall (1982).*Tourism: Economic, Physical and Social Impacts*, New York: Longman House.

Chris Cooper (2008). *Tourism: Principles and practice*, London: Pearson Education.

David T. Herbert (2001). *Literary places, tourism and the heritage experience*, Annals of Tourism Research 28(2).

Garry McCain &Nina M. Ray (2003). *Legacy Tourism: the Search for Personal Meaning in Heritage Travel*, Tourism Management, 24.

Graeme Evans (2003). *Hard-branding the cultural city-from Prado to Prada*, International Journal of Urban and Regional Research, 27:2.

Greg Richards and W. Munsters (2010). *Cultural Tourism Research Methods*. CAB International, UK.

Hervé Barré (2002). *Heritage Policies and International Perspective: Cultural Tourism and Sustainable Development*, Museum International, 54:1-2.

J. Christopher Holloway and Claire Humphreys (2006). *The business of Tourism*, London: Pearson Education.

J. E. Tunbridge & G. L. Ashworth (1996). *Dissonant Heritage: the Management of the Past as a Resource in Conflict*, John Wiley & Sons, Chichester.

Milena Ivanovic (2008). *Cultural Tourism*. Juta and Company Ltd.

Noha Nasser (2003). *Planning for Urban Heritage Places: Reconciling Conservation, Tourism, and Sustainable Development*, Journal of Planning Literature, 17:4.

Philip L. Pearce (1982). *Perceived changes in holiday destinations*, Annals of Tourism Research, 9.

Raymond A. Rosenfeld (2008). *Cultural and Heritage Tourism*, Eastern Michigan University, USA.

J. Swarbrooke (1994). *The Future of the Past: Heritage Tourism into the 21st Century*, in A. V. Seaton (ed.), Tourism, The State of the Art, John Wiley & Sons, Chichester.

Ted Silberberg (1995). *Cultural Tourism and Business Opportunities for Museums and Heritage Sites*, Tourism Management 16:5.

W. R. Mcintosh & R. C. Goeldner (1986).*Tourism: Principles, Practices and Philosophies*, John Wiley & Sons, New York.

WienduNuryanti (1996). *Heritage and Postmodern Tourism*, Annals of Tourism Research 23(2).

Yaniv Poria, Richard W. Butler & David Airey (2003).*The core of heritage tourism, Annuals of Tourism Research*, Elsevier Science Ltd.

Forecasting Inflation Rate of Bangladesh : ARIMA and VAR Model Comparison

Pinke Rani Dey*

[Abstract : Policymakers need to monitor inflation closely since it is considered as one of the major social problems. Although forecasting inflation is not so easy, it needs to perform a successful monetary policy for a country. Economists use different types of approaches to forecast a time series variable. Here, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model and Vector Autoregressive (VAR) model are used to forecast the inflation rate of Bangladesh. In this paper, within-sample forecasting is performed using ARIMA and VAR model; where the comparison based on the different evaluation criteria suggests that VAR model approach is better than ARIMA model.]

Keywords : Inflation, forecasting, ARIMA, VAR, model comparison

1. Introduction

The phenomenon of inflation is characterized by a rising price level. From an elementary demand-supply model, we know that price rises in response to excess demand. Therefore, inflation is related to excess demand. An excess demand situation arises due to both from the changes in supply or demand. Policymakers need to monitor inflation closely since it is considered as one of the major social problems. Although forecasting inflation is not so easy, it is important to perform a successful monetary policy for a country. Economic growth with a stable price level is an important policy goal of a developing country. Since there is a trade-off between inflation and unemployment in the short run of an economy, sometimes the government becomes unable to maintain a stable rate of inflation, which reduces the purchasing power of money and living standards. High inflation can lead to uncertainty making domestic and foreign investments reluctant to invest in the economy. Because the real return falls with a persistent rise in the price level, sensible spending and saving decisions by economic agents are hindered by it and also discourages saving. Thus, inflation worsens the country's terms of trade by making domestic goods and services costly relative to foreign goods and services.

According to the theory of adaptive expectations, people form their expectations of inflation based on past and recently observed inflation rates. Expectation of the future rates of inflation affects the decision of economic agents. It is claimed by Milton Friedman (1970) that "Inflation is always and everywhere a monetary

* Lecturer, Department of Economics, Rabindra University, Bangladesh.

phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output" (p. 24).On the other hand, conforming to neo-Keynesians, through the inflationary gap, prices are expected to change due to the changes in real income (aggregate demand).Traditionally, the wage/price (Phillips curve) approach was used to explain inflation, and also it has been claimed to explain both demand-pull and cost-push inflation.

This paper attempts to evaluate some of the inflation forecasting models used in time series econometrics. There are several factors that affect the rate of inflation of a country. Changes in the money supply play a very important role in changing the inflation rate. If the money supply grows faster than the rate of real output in the economy then it causes creating inflation. This is the case where aggregate demand increases while aggregate supply remains static. The most obvious asset is a currency, sum of outstanding paper money, and coins. The second type of asset used for the transaction is demand deposits, traveller's check, money market deposits, and other checkable deposits. The combination of all these is referred to as broad money (M2). Where, M2 is a wider categorization than M1, because it includes highly liquid assets, not only cash. The relationship between inflation and money supply can be explained by the Quantity Theory of Money proposed by Irving Fisher (1911), postulates that the quantity of money paid for goods and services must be equal to the value of money. That is, changes in the quantity of money affect inflation rate by changing the overall price level in the economy. This relationship can also be shown by the following equation of exchange :

$$MV = PT$$

Where, M = money supply, V = velocity of money, P = price level, and T= number of transactions. However, the value of transactions (PT) is proportional to the value of output (PY) since higher level of production implies larger number of transactions in the economy.

An increase in the price of factors of production can influence an economy by a supply shock. Changes in oil price affect the cost of production of the goods made with petroleum products. Therefore, the rate of inflation and oil prices are assumed to change in the same direction. Bangladesh is highly dependent on oil imports from the rest of the world. Since oil is used from the production level to the transportation of goods, it affects the final cost of a good or service which accelerates the rate of inflation. Using two sample periods of 1962-1980 and 1981-2000, Hooker (2002) tried to figure out the relationship between inflation and oil price. It was shown that the impact of oil price on inflation was significant for the first sample and insignificant for the second sample period. For selected emerging Asian countries, Chou and Tseng (2011) examined the effect of oil prices on the rate of inflation. After the short run and long run breakdown of the pass-through effect of oil price on inflation, the result found that this effect was significant for the long run, while insignificant in the short-run. The study of Sek & Wong (2015) postulated that oil price has a direct impact on the low oil

dependency group and an indirect impact on the high oil dependency group in determining domestic inflation.

The inflation-exchange rate relationship has significant importance for emerging countries. There is an indirect effect of exchange rate on the rate of inflation by changing the import cost of goods and services. An appreciation of domestic currency makes foreign goods cheaper relative to domestic goods. Hence, the price of imports will fall which decelerate the inflationary pressure. However, the depreciation of domestic currency causes to increase the prices of imported goods. On the other hand, domestically produced goods may also become more expensive as the domestic producers face weaker competition from abroad. Woo (1984) explained four channels through which the exchange rate influences domestic inflation. First, the domestic inflation rate is directly affected by the price of imported goods. Second, the price of imported goods immediately affects the cost of domestic goods. Third, fluctuations in the exchange rate have an immediate effect on the current account which affects the total demand in the economy. Fourth, the price of foreign commodities will increase.

Inflation and interest rates are inversely related. A lower interest rate stimulates investment and consumer spending, causing the economy to grow and higher inflation. That is, a lower interest rate means a lower price for holding money or loaning money, which in turn increases the demand for loans by the individuals and businesses. With a higher demand for loans, banks increase their money supply, leading to higher rate of inflation. The opposite holds true for a higher rate of interest. The opportunity cost of holding money and the cost of borrowing money rises with an increase in interest rate. It also reduces the aggregate demand and causes lower output and inflation in the economy. Besides, higher interest rate attracts foreign investors to invest more in domestic economy, leading to an appreciation of domestic currency and lower rate of inflation thereby. Another definition arises from Fisher. Fisher effect shows that higher inflation means a higher nominal interest rate and vice versa. Booth and Ciner (2001) performed a co-integration analysis to test the relationship between interest rate and inflation rate for 9 European countries and the USA. The result shows a long-run relationship between these two variables. A similar finding was mentioned in the study of Brazoza and Brzezina (2001); and Fave and Auray (2002).

2. Literature review

The objective of this study is to forecast inflation by using a univariate and vector autoregressive model (VAR). Therefore, the literature review mainly focuses on the influential papers concerning inflation forecasting.

Taslim (1982) found that an increase in the money supply contributes significantly to increase the rate of inflation. The wage variable seems to function essentially as a transmitter of inflationary impulse rather than being the cause of

it. The domestic currency can devaluate in any amount due to an equal proportionate increase in the inflation rate. Robinson, W.(1998) forecast the inflation rate of Jamaica using the VAR model, augmented by an error correction term. Where the VAR model revealed some interesting that is an expansionary monetary policy has an unambiguous effect on prices and has at least two months lag effect. Exchange rate stabilization was considered as the most effective way of short term stabilization. Faisal F. (2012) conducted a study to forecast Bangladesh's inflation rate where the Box-Jenkins ARIMA time series model was applied. The validity of the model was tested using standard statistical techniques, and the best model was proposed on the basis of various diagnostic and several evaluation criteria. But the main disadvantage of the ARIMA model is that it ignores many explanatory variables that extremely affect the inflation rate. Suliman & Mc Cann (1991) showed that the existence of feedback causality between money and real income (aggregate demand) indicates that changes in aggregate demand affect prices through their impact on the money supply. It was also found that any increase in producer prices through higher wages is passed immediately to consumer prices. Mehra (1991) argued that the long-run movements in the rate of growth in prices and labour costs are correlated over time. But the presence of this correlation appears due to Granger-causality running from inflation to wage growth, not from wage growth to the rate of inflation. Hoa (2017) used univariate and VAR (vector autoregressive) models to forecast the inflation rate in Vietnam. Where univariate model only uses the inflation rate series to forecast it, and the multivariate model requires other variables to perform inflation forecast, such as quarterly series of real GDP, exchange rate, commercial banks' lending rate, oil price, etc.Zardi(2017)used univariate models as Random Walk, SARIMA, a Time-Varying Parameter model, and a suite of multivariate autoregressive models as Bayesian VAR and Dynamic Factor models to forecast the inflation rate of Tunisia. The results reveal that the forecast combination leads to a reduction in forecast error compared to individual models.

To forecast the inflation rate of Albania, Sinaj (2014) used ARIMA and VAR models and obtained data of 17 years period about CPI, M2, and interest rate. Results gained by this analysis indicate a significant relation between CPI, M2, interest rates, and a statistically significant autoregressive relation to the CPI with time delay. Alnaa and Ahiakpor (2011) used monthly inflation data of Ghana from 2000 : 6 to 2010 : 12 to forecast the inflation rate of Ghana. They used the ARIMA model, and ARIMA (6,1,6) was the best-fitted model in this study. This paper completely ignores the importance of many variables that are influencing to cause inflation. Okafor, C., & Shaibu, I. (2013) also applied the ARIMA model to forecast the inflation rate of Nigeria. Bokhari, S. M., & Feridun, M. (2006) forecast the inflation rate of Pakistan using ARIMA and VAR models. Results indicate that the VAR model does not perform better than the ARIMA (2, 1, 2) model.

A comparative model analysis to forecast the rate of inflation is totally absent in Bangladesh. This paper will contribute to forecast rate of inflation by considering univariate and multivariate model.

3. Data and Methodology

A long time series data is required for univariate time series forecasting. It is usually recommended to have at least 50 observations. This study researches on monthly inflation data based on consumer price index (CPI), which have been collected from 2002M1 to 2020M6 for Bangladesh. The VAR model includes money supply, exchange rate, oil prices, financial interest or lending rate. Data on money supply, exchange rate, and interest rate or lending rate are collected from "International Financial Statistics (IFS)", a data section of IMF. While the data on crude oil prices are collected from "U.S. Energy Information Administration (eia)".

3.1 ARIMA model

The Box-Jenkins methodology (Anderson, 1976) indicates a set of procedures that are used for identifying, fitting, and checking autoregressive integrated moving average (ARIMA) models with time series data. ARIMA methodology is not attached within any fundamental theory of economics or structural relationship. The forecasts from the fitted models are based purely on the memory of past behaviour and previous error terms of the series of interest (Hanke & Winchern, 2008). In making forecast, the Box-Jenkins (ARIMA) model technique completely ignores independent variables. ARIMA models have three model parameters, a parameter for AR(p) process, one for I(d) or integrated process, and another one for MA(q) process; all these combining and interacting among each other are rearranged into the ARIMA (p,d,q) model.
ARIMA (p,d,q) can be written as;

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + u_t + \alpha_1 u_{t-1} + \cdots + \alpha_q u_{t-q}$$

Where, Y_t= rate of inflation; β_0,β_i, and $\alpha_i$are the parameters to be estimated; $u_t =$ error term. Before applying this equation to a time series, however, the assumption is that the series is non-stationary. So, some steps must be taken to convert the series into a stationary one. Using univariate models to perform forecasting is to use only one variable's historical data to predict its future. The first advantage of this approach is that it needs only one variable to forecast it. It does not require a large dataset, with many different variables, which is very difficult to obtain and is not usually available in developing or emerging economies. Despite having no direct economic interpretation, many pieces of literature show the use of ARIMA or ARMA models to forecast a series. If the series is stationary in the level form, then no transformation is needed, and our model turns into an ARMA model.

3.1.1 ADF test for stationarity

In econometrics, the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test checks the null hypothesis to find whether a unit root is present in our series or not. The ADF testing procedure is similar to the Dickey-Fuller test, but it is applied to the model.

$$\Delta y_t = (\rho_1 - 1) y_{t-1} + \sum_{j=2}^{p} p_j \left(\Delta y_{t-j+1}\right) + \varepsilon_t$$
$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \sum_{j=2}^{p} p_j \left(\Delta y_{t-j+1}\right) + \varepsilon_t$$

This is called the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and is implemented in many statistical and econometric software packages. Where $\rho_1 = (\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta p$, $\gamma = (\rho 1 - 1)$ and $\Delta yt = yt - yt - 1$.

The test statistics value is computed as follows :

$$\text{DF} = \frac{\hat{\gamma}}{SE(\hat{\gamma})}$$

Where $\hat{\gamma}$ is the estimated coefficient and SE($\hat{\gamma}$) is the standard error of the estimated coefficient. The hypothesis test for the ADF test :

$$H_0 : \gamma = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \gamma < 0$$

The computed value of the test statistic is compared with the relevant critical value for the Dickey–Fuller Test. If the test statistic is less than the critical value, then reject the null hypothesis, and no unit root is present.

3.1.2 Model Selection and Forecasting

The correlograms examine the time series data by plotting the Autocorrelation Function (ACF) and Partial Autocorrelation Function (PACF) in order to get the functional form of the data. ACF represents the degree of persistence over respective lags of variables while PACF measures the amount of correlation between two variables, which is not explained by their mutual correlation with a specified set of other variables. Besides, the Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SIC), and Hannan-Quinn criterion are used to select a best model.

Forecasting performance of various types of ARIMA models will be compared by computing statistics like AIC, BIC, Root Mean Square Percentage Error (RSMPE), Mean Absolute Error (MAE), etc. The smaller is the statistics, the better will be the model. In addition, by plotting the residuals of the estimated model, the autocorrelation among errors is checked. If there is no autocorrelation, then the estimated model can be used for forecasting purposes.

3.2 VAR Model

The vector autoregressive (VAR) model was proposed by Christopher A. Sims in 1980. For the analysis of multivariate time series, VAR is considered as one of the foremost successful, flexible, and practical models. The univariate time series model cannot ensure any economic reason for inflation. But the VAR model uses multiple variables that highly affect the inflation rate of an economy. All variables in a VAR model enter in the same way : each variable has an equation, and its evaluation is based on its own lagged values, the lagged values of other model variables, and an error term.

Let, $Y_t = (y_{1t}, y_{2t}, \dots, y_{nt})$,denote an (nx1) vector of time series variable; such as (inflation,money supply, oil price, exchange rate, and interest rate). A VAR model can be expressed as :

$$Y_t = C + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 Y_{t-2} + \cdots + \gamma_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Where γ_i is an (nxn) coefficient matrix, $\varepsilon_t$is an (nx1) error matrix which are pure white noise and C is an (nx1) vector of constants (intercept).

It is problematic to use non-stationary time series in VAR modelling concerning statistical inference because the standard statistical test used for inference is based on the condition that all of the series used must be stationary. If the series are non-stationary, then we need to make the series stationary by first or higher-order differencing. In the VAR model, endogenous variables are expressed as a function of its own lags and lags of other variables. So, it is very important to select the lag length properly; otherwise, the VAR model cannot perfectly explain our model and will lose the degrees of freedom by adding unnecessary lags. In most cases, systematic lags are used to estimate the VAR models; that is, in all equations of the model, the same lag length is used for all variables. Frequently, the lag length is selected using an explicit statistical criterion such as the AIC, SIC, HQ, etc.

4. Results

This chapter displays the empirical results from the modelling of inflation using ARIMA and VAR models, respectively.

4.1 ARIMA Model

The following inflation series of Bangladesh displays a mean diverting process, which indicates the non-stationarity of our data. Since our data are not stationary in the level form, first-order differencing is necessary. That is why our model turns into an ARIMA model, where the integrating order I(d) is one.

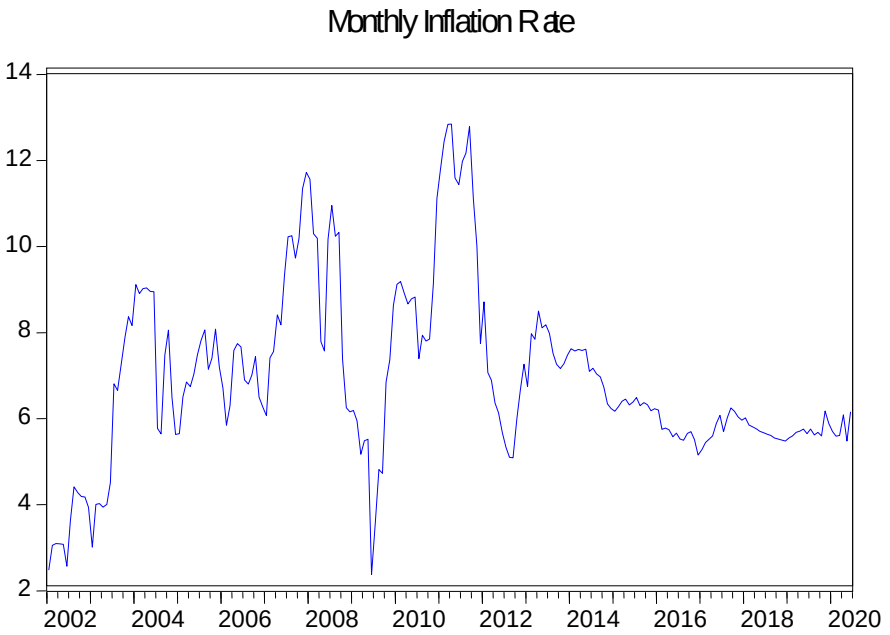


Figure 1 : Monthly Inflation Rate in Bangladesh (January, 2002 to June, 2020)

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test					
In level			**In First Difference**		
None	Constant	Constant and linear trend	None	Constant	Constant and linear trend
-0.579 (0.466)	-3.163 (0.024)**	-3.473 (0.045)**	-13.308 (0.000)***	-13.282 (0.000)***	-13.279 (0.000)***

Table 1 : Unit Root test of Inflation Rate

***, **, and * imply statistically significant at 1%, 5%, and 10% level, respectively. Probability values in the parentheses.

In level form, the inflation rate series is non-stationary with no constant and trend. But the series is stationary at 5% level of significance with constant, and constant and linear trend. To make our model more precise and correct, first difference is taken to stationarise the series. The correlogram result also gives us a similar result of being the series inflation rate non-stationary, which is ACF falling gradually and PACF is not significant after the first lag (see appendix-Figure : 5).

4.1.1 ACF-PACF Plots and Model Selection

To get a best fitted ARIMA model, we need to determine AR and MA process of a time series, after the series has been stationarised by taking the appropriate difference. We can identify the possible numbers of AR and/or MA terms that are needed, by looking at the autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation (PACF) plots of the differenced series. ACF plot is just a bar chart of the coefficients of correlation between a time series, and its lags, while the PACF plot is a plot of the partial correlation coefficients between the series, and its lags. The ACF and PACF suggest the significance of the 12th lag of AR and MA series (see appendix-Figure : 6). So our model turns to ARIMA (12,1,12) model, which minimizes all the information criteria. In-sample forecasting is necessary to compare the different models to forecast out of sample. It is generally accepted that a model which performs better within sample will better forecast out of sample.

Type of Model	Information Criteria		
	Akaike Info Criterion	Schwarz Criterion	Hannan-Quinn Criterion
ARIMA (12, 1, 12)	1.9699***	2.0019***	1.9828***
ARIMA (12, 1, 13)	2.1257	2.1577	2.1386
ARIMA (1, 1,1)	2.2493	2.2801	2.2617
ARIMA (12,1,1)	2.1407	2.1726	2.1536
ARIMA (1,1, 12)	2.0289	2.0598	2.0414

Table : Model selection based on Information Criteria
*** indicates lowest information criteria among the models.

4.1.2 Diagnostic checking

Various diagnostic checking of estimated regression is necessary to measure the accuracy of a model. Residual normality test and autocorrelation test are widely used in time series data. The following normality test indicates that our model is correctly specified.

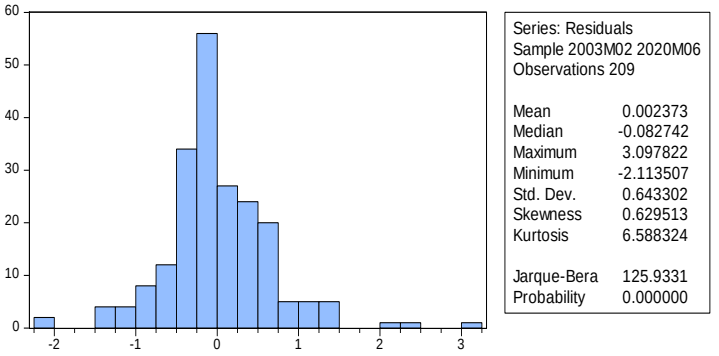


Figure 2 : Residual Normality Test

4.2 VAR Model Estimation and lag length selection

In the VAR model, we take the inflation series as dependent variable. The VAR contains five variables, money supply, interest rate, oil price, and exchange rate. The following figure at level form shows that all the variables are non-stationary. So, log transformation and then first difference is taken to make data stationary. In the following graph, all of the variables show a mean-reverting variable. Since log of money supply needs to take second-order differences to make the series stationary, we will use the first difference of log of money supply in our VAR model. The first difference of the log of money supply implies the growth rate of money supply. After estimating the VAR model, the VAR lag length criteria suggest two models based on the information criteria. Schwarz information criterion and Hannan-Quinn information criterion minimizes information at first lag, whereas Akaike information criterion suggests the 12^{th} lag for our model (see appendix-Table : 5).For the parsimony of our model, we have estimated the VAR model using first lag considering the minimization of information criteria based on Schwarz information and Hannan-Quinn information criteria. This implies that any change in the variables affect inflation immediately after the first lag. This matches with the normal economic theories. The post estimation test for accuracy of the model suggests that the model is free of heteroscedasticity and autocorrelation problem, which makes our model eligible for the forecasting purpose.

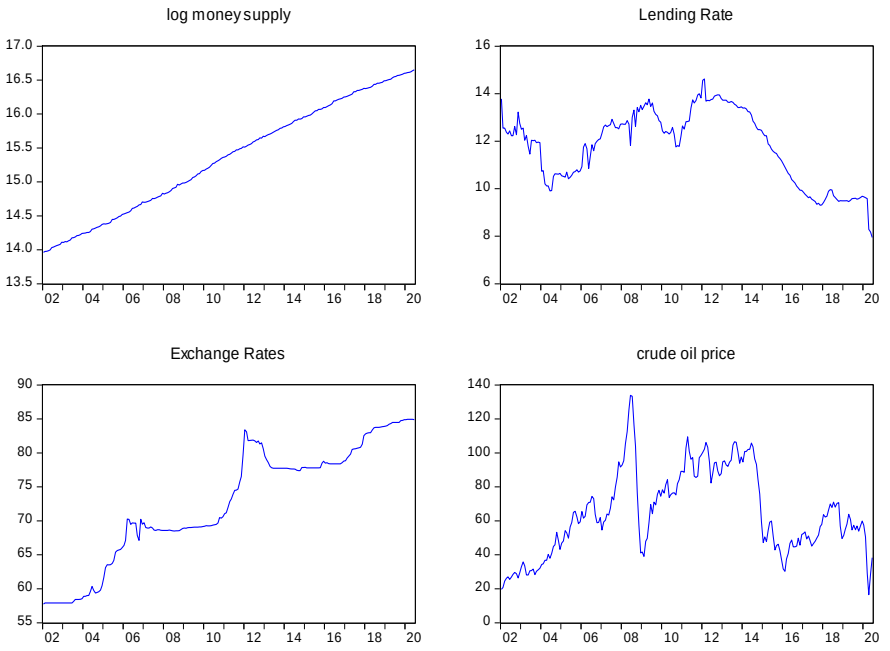


Figure 3 : Monthly Money Supply, Lending Rate, Exchange Rate and Crude Oil Price series

Variables	Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test					
	In level			In First Difference		
	None	Constant	Constant and trend	None	Constant	Constant and trend
Growth rate of money supply	-0.639 (0.439)	-1.627 (0.466)	-2.003 (0.596)	-15.967 (0.000)***	-15.936 (0.000)***	-15.938 (0.000)***
Exchange rate	2.187 (0.993)	-1.042 (0.738)	-2.180 (0.499)	-10.517 (0.000)***	-10.875 (0.000)***	-10.862 (0.000)***
Interest or lending rate	-1.427 (0.143)	-0.606 (0.865)	-0.959 (0.946)	-16.959 (0.000)***	-17.026 (0.000)***	-17.099 (0.000)***
Crude oil Price	-0.872 (0.334)	-2.954 (0.041)**	-2.840 (0.185)	-9.753 (0.000)***	-9.732 (0.000)***	-9.760 (0.000)***

Table 3 : ADF test of the series in level form and after first differences
***, **, and * imply statistically significant at 1%, 5% and 10% level respectively. Probability values in the parentheses.

4.3 Model comparison

Finally, we compare the ARIMA and VAR models' prediction accuracy. The model with smallest error is a better model to forecast inflation. In-sample forecasting suggests that the VAR predication minimizes all the error criteria (see appendix-Figure : 7). Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), and The inequality coefficient are lowest for VAR model. The estimated criteria table is shown in the following. In-sample forecasting comparison graph also suggests that the deviation from the actual inflation rate is lowest for the VAR model (see appendix-Figure : 7& Figure : 8).

Criteria	ARIMA model	VAR model
RMSE (root mean square error)	0.484	0.242
MAE (mean absolute error)	0.430	0.205
MAPE (mean absolute percentage error)	7.724	3.587
Thei inequality coefficient	0.041	0.021

Table 4 : Model selection based on Criteria

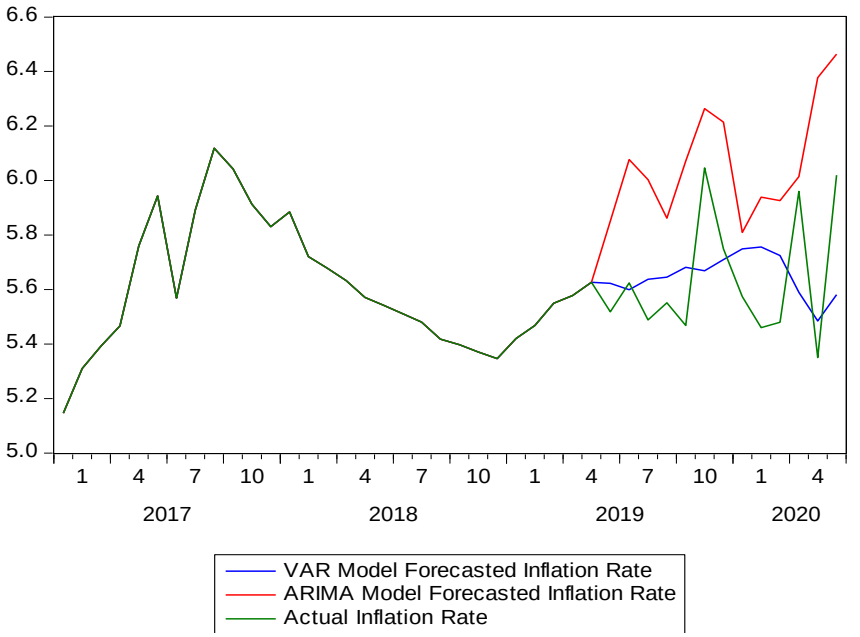


Figure 4 : In-sample forecasting comparison graph

5. Limitations

There are some limitations which may be noted for this study. Since the monthly data of the supply of money is not available for the period before 2001 M12, the data set used in this study is for a short period of time. However, the analysis of this paper is based on the monthly inflation data, meaning that the points of data seem enough to conduct the study. In the VAR model, there are many other factors that influence the inflation rate, such as- unemployment rate, gross domestic product (GDP), remittance, etc. The effect of these factors are not considered in the analysis of this study because of the unavailability of monthly data of those factors.

6. Conclusion

This study analyses a comparative evaluation of forecasting the monthly rate of inflation in Bangladesh using ARIMA and VAR models, where the forecasting power of historical inflation data are investigated. In the ARIMA model, we use the inflation rate from 2002M1 to 2020M6, where the best ARIMA (12,1,12) model is used for forecasting the inflation rate. The study shows that despite the exclusion of explanatory variables, there is evidence of substantial inflation inertia according to the definition of Solow(1969). This model is selected according to information

criteria; that is, the prediction power will be higher for lower information. VAR model takes into account the factors that affect the rate of inflation. By comparing ARIMA and VAR models using the post forecast comparison criteria, this study suggest that the VAR model performs better within-sample forecast and reduces all the forecasting error. That means, if a model performs better within the sample then it will also perform better out of the sample. Therefore, within the available monthly data of the macro indicators, forecasting the rate of inflation using VAR model is suggested by the analysis of this study.

References

C. A. Sims (1980). 'Macro economics and reality'. *Econometrica : journal of the Econometric Society*, 1–48.

C. Okafor & I. Shaibu (2013). 'Application of ARIMA models to Nigerian inflation dynamics'. *Research Journal of Finance and Accounting*, *4*(3), 138–150.

F. Faisal (2012). 'Forecasting Bangladesh's inflation using time series ARIMA models'. *World Review of Business Research*, *2*(3), 100–117.

G. G. Booth & C. Ciner (2001). 'The relationship between nominal interest rates and inflation : international evidence'. *Journal of Multinational Financial Management*, *11*(3), 269–280.

I. Fisher (1911). *The purchasing power of money : its' determination and relation to credit interest and crises*. Cosimo, Inc.

J. Hanke& D.Wichern (2008). *Business Forcasting, 9th edition; USA*, Person International Edition, ninth edition.

K. W. Chou & Y. H. Tseng (2011). "Oil price pass-through into CPI inflation in Asian emerging countries : the discussion of dramatic oil price shocks and high oil price periods." *British Journal of Economics* 1 (2011) : 1–13.

M. A. Hooker (2002). 'Are oil shocks inflationary? Asymmetric and nonlinear specifications versus changes in regime'. *Journal of money, credit and banking*, 540–561.

M. A. Taslim (1982). 'Inflation in Bangladesh : A reexamination of the structuralist–Monetarist controversy'. *The Bangladesh development studies*.

M. Brazoza Brzezina (2001). 'The Relationship between Real Interest Rate and Inflation'. *Research Department, WP*, *23*.

M. Friedman (1970). 'Counter-Revolution in Monetary Theory'. Wincott Memorial Lecture, Institute of Economic Affairs, Occasional paper 33.

M. O.Suliman& K. McCann (1991). 'Inflation : Some Empirical Evidence'. *The American Economist*, *35*(2), 49–59.

O. D. Anderson (1976). *Time series analysis and forecasting : the Box-Jenkins approach* (Vol. 19). London : Butterworths.

P. Fave & S. Auray (2002). 'Interest rate and inflation in monetary models with ingenious money growth rate'. *Economic Bulletin*, *5*(1), 1–10.

R. Solow (1969). *Price Expectations and the Behavior of the Price Level*. University of Manchester Press.

S. C. Zardi (2017). *Forecasting inflation in a macroeconomic framework : An application to Tunisia* (No. 07–2017). Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper.

S. E. Alnaa & F. Ahiakpor (2011). ARIMA (autoregressive integrated moving average) approach to predicting inflation in Ghana. *Journal of economics and international finance*, *3*(5), 328–336.

S. K. Sek, X. Q. Teo & Y. N. Wong (2015). 'A comparative study on the effects of oil price changes on inflation. *Procedia Economics and Finance*, *26*, 630–636.

S. M. Bokharı & M. Feridun (2006). Forecasting inflation through econometric models : an empirical study on Pakistani data.

T. T. Hoa (2017). *Forecasting inflation in Vietnam with univariate and vector autoregressive models* (No. BOOK). The Graduate Institute of International and Development Studies, International Economics Department.

V. Sinaj (2014). Models to forecast inflation in Albania. *International Journal of Scientific Research*, *5*(1), 2229-5518.

W. Robinson (1998). Forecasting inflation using VAR analysis. *Bank of Jamaica*.

W. T.Woo&P. Hooper (1984). Exchange rates and the prices of nonfood, nonfuel products. *Brookings Papers on Economic Activity*, *1984*(2).

Y. P. Mehra (1991). 'Wage growth and the inflation process : An empirical note'. *The American Economic Review*, *81*(4).

Appendix

Sample: 2002M01 2020M06
Included observations: 222

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.924	0.924	192.10	0.000
		2	0.836	-0.118	350.25	0.000
		3	0.753	-0.013	479.06	0.000
		4	0.675	-0.019	582.88	0.000
		5	0.596	-0.048	664.42	0.000
		6	0.514	-0.075	725.33	0.000
		7	0.436	-0.025	769.23	0.000
		8	0.360	-0.037	799.39	0.000
		9	0.280	-0.090	817.74	0.000
		10	0.212	0.025	828.26	0.000
		11	0.152	-0.007	833.71	0.000
		12	0.102	0.006	836.16	0.000
		13	0.091	0.223	838.11	0.000
		14	0.071	-0.121	839.31	0.000
		15	0.039	-0.096	839.68	0.000
		16	0.002	-0.063	839.68	0.000
		17	-0.030	-0.009	839.91	0.000
		18	-0.057	-0.033	840.70	0.000
		19	-0.058	0.172	841.51	0.000
		20	-0.065	-0.096	842.56	0.000

Figure 5 : ACF and PACF in level form after first difference

Sample: 2002M01 2020M06
Included observations: 221

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.105	0.105	2.4496	0.118
		2	-0.027	-0.039	2.6178	0.270
		3	-0.041	-0.034	2.9924	0.393
		4	-0.003	0.004	2.9951	0.559
		5	0.012	0.010	3.0297	0.695
		6	0.013	0.010	3.0708	0.800
		7	0.005	0.003	3.0767	0.878
		8	0.025	0.026	3.2236	0.920
		9	-0.090	-0.096	5.1057	0.825
		10	-0.069	-0.048	6.2017	0.798
		11	-0.081	-0.075	7.7594	0.735
		12	-0.335	-0.340	34.149	0.001
		13	0.101	0.176	36.580	0.000
		14	0.091	0.037	38.543	0.000
		15	0.045	0.014	39.023	0.001
		16	-0.042	-0.025	39.449	0.001
		17	-0.024	0.003	39.594	0.001
		18	-0.114	-0.138	42.760	0.001
		19	0.048	0.074	43.316	0.001
		20	-0.038	-0.069	43.666	0.002

Figure 6 : ACF and PACF

VAR Lag Order Selection Criteria

ndogenous variables : D(INFLATION RATE) D(DLNMS) D(EXCH_RATE) D(LEND_RATE) D(OIL_P)

Exogenous variables : C

Sample : 2002M01 2020M06

Included observations : 200

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-500.6078	NA	0.000108	5.056078	5.138536	5.089447
1	-416.4295	163.3059	5.98e-05	4.464295	4.959042*	4.664512*
2	-378.8722	70.98331	5.27e-05	4.338722	5.245759	4.705786
3	-358.5829	37.33222	5.53e-05	4.385829	5.705156	4.919741
4	-342.7928	28.26438	6.08e-05	4.477928	6.209544	5.178686
5	-290.4482	91.07947	4.64e-05	4.204482	6.348389	5.072088
6	-262.3964	47.40762	4.53e-05	4.173964	6.730160	5.208417
7	-241.3583	34.50242	4.74e-05	4.213583	7.182069	5.414884
8	-217.3973	38.09807	4.84e-05	4.223973	7.604748	5.592121
9	-202.8060	22.47050	5.44e-05	4.328060	8.121125	5.863056
10	-177.8651	37.16204	5.53e-05	4.328651	8.534005	6.030494
11	-94.85823	119.5299	3.15e-05	3.748582	8.366227	5.617272
12	-53.16546	57.95294*	2.73e-05*	3.581655*	8.611589	5.617192
13	-32.21575	28.07262	2.93e-05	3.622157	9.064381	5.824542
14	-15.76009	21.22780	3.30e-05	3.707601	9.562114	6.076833
15	-1.214960	18.03596	3.80e-05	3.812150	10.07895	6.348229
16	13.22335	17.18159	4.43e-05	3.917767	10.59686	6.620693
17	32.05143	21.46401	4.96e-05	3.979486	11.07087	6.849260
18	55.68119	25.75644	5.35e-05	3.993188	11.49686	7.029809
19	86.40372	31.95143	5.42e-05	3.935963	11.85192	7.139431
20	113.5153	26.84042	5.75e-05	3.914847	12.24310	7.285163

Table 5 : VAR Lag Order Selection Criteria
* indicates lag order selected by the criterion

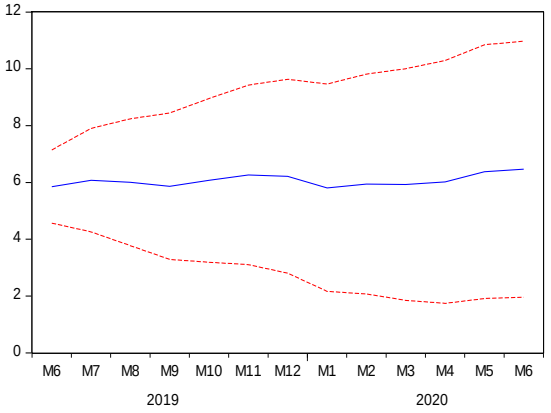
LR : sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE : Final prediction error

AIC : Akaike information criterion

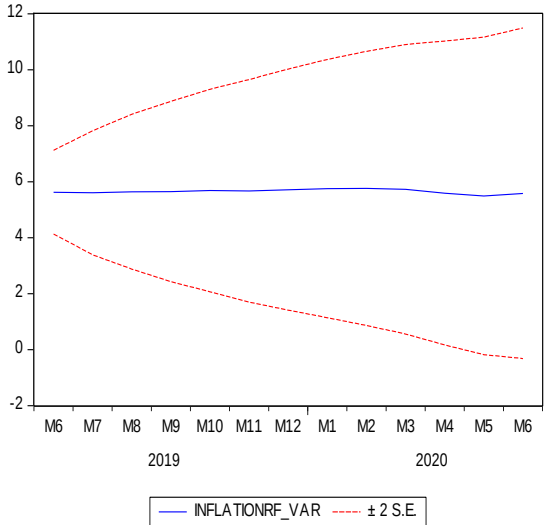
SC : Schwarz information criterion

HQ : Hannan-Quinn information criterion



Forecast: INFLATIONRF_ARIMA	
Actual: INFLATIONRATE	
Forecast sample: 2019M06 2020M06	
Included observations: 13	
Root Mean Squared Error	0.484043
Mean Absolute Error	0.429528
Mean Abs. Percent Error	7.724473
Theil Inequality Coefficient	0.041327
Bias Proportion	0.787436
Variance Proportion	0.002496
Covariance Proportion	0.210068

Figure 7 : ARIMA Model in Sample Forecasting



Forecast: INFLATIONRF_VAR	
Actual: INFLATIONRATE	
Forecast sample: 2019M06 2020M06	
Included observations: 13	
Root Mean Squared Error	0.241601
Mean Absolute Error	0.204842
Mean Abs. Percent Error	3.587270
Theil Inequality Coefficient	0.021395
Bias Proportion	0.002634
Variance Proportion	0.380878
Covariance Proportion	0.616488

Figure 8 : VAR Model in Sample forecasting

Understanding Semantic Taxonomy and Syntactic Realization of Conditional in French

Mizanur Rahman*

[Abstract : Conditional is one of the most difficult grammatical structures for the learners of French as a foreign language. The difficulty arises from the complexity inherent in the form and function of the conditionals. As a linguistic and cognitive complex structure, the conditional in French can take different forms and thereby can express a plethora of meanings. The purpose of this paper is to describe and illustrate different forms and functions of conditionals in French so that the learners of French as a foreign language can overcome the existing challenges of mastering a sound command over conditional.]

Introduction

Conditional is one of the most difficult grammatical structures for the learners of French as a foreign language. The difficulty arises from the complexity inherent in the form and function of the conditionals. As a linguistic and cognitive complex structure, the conditional in French can take different forms and thereby can express a plethora of meanings. According to Traugott (2009) cited in Abdollahi-Guilani et al. (2019), understanding of the conceptual and behavioral organization involved in the construction and interpretation of these kinds of sentences provides fundamental insights into the inferential strategies and the cognitive and linguistic processes of human beings. The purpose of this paper is to describe and illustrate different forms and functions of conditionals in French so that the learners of French as a foreign language can overcome the existing challenges of mastering a sound command over conditional. This is a descriptive research. Data have been collected through document analysis. A good number of existing literature which includes referred journals, text books and grammar books have been consulted for data collection.

Definition of conditional

The meaning of conditional can vary from language to language and structure to structure. Every language has a theory of forming conditional sentences (Traugott et al. 1986). These conditionals are expressed in various ways which differ from language to language (Sultan, 2011, Cited in Gardner et al. 2017).

Conditional in French conveys different meanings such as the sense of possibility, wish or regret and volition. In addition, conditionals convey cognitive

* Lecturer, Institute of Modern Languages, University of Dhaka.

reasoning and semantic nuances through factual, nonfactual or hypothetical events. Moreover, conditional sentences can be used to soften the force of suggestion or command. Conditional, according to Moulton (1942), is a misnomer conditional can be used in French both as a tense and as a mood. As a tense, the conditional (*le conditionnel)* expresses the future seen from a past point of view. As a mood, the conditional allows us to talk about a hypothetical or imagined reality that can only occur under certain circumstances.

Conditional in French can be expressed either in a simple sentence with the conditional form of the verb or in a complex sentence with si-clause (If clause). According to Schulz (2014), a conditional sentence is "a sentence that consists of a main or matrix sentence, called the consequent, and a subordinate sentence starting with if, called the antecedent." The main structure of conditionals contains a "protasis" (an antecedent clause) and an "apodosis" (a consequent clause) (Zhang, 2005; Polanska, 2006).

Direct conditions, which constitute the central use of conditionals, "convey that the situation in the matrix clause is directly contingent on that of the conditional clause i.e. the truth of the proposition in the matrix clause is a consequence of the fulfillment of the condition in the conditional clause" (Quirk, 1985 : 1088 cited in Raguseo, 2013).

Semantic versus syntactic approach

Conditional sentences are complex structures from both syntactic and semantic point of view. Conditionals have been generally taught from the point of view of form. This point of view is both incomplete and inappropriate to capture the subtle differences in meaning as it fails to reflect the wide variety of meaning it conveys as well as the inherent complexity of structures learners of French as a foreign language might encounter in authentic materials and situations in the target language.

Several researchers have talked about the semantic relationship of conditionals in different ways. For example, while Guilani et al (1999) and Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999) claims that conditionals can refer to three kinds of semantic relationship i.e. factual, future or predictive and imaginative conditionals, Yule (1998) and Wu (2012) says that conditionals consist of four types of semantic relationship : factual, predictive, hypothetical, and counterfactual. According to Abdollahi-Guilani et al (2019), conditionals can express three types of semantic relationships : (1) factual, (2) future or predictive and (3) imaginative. Each type of conditionals is subdivided into several subsets : Generic (the relationship which is true and unchanging), Habitual (similar to the generic condition except for the type of relationship relies upon habits, Implicit inference (An inference is indirectly made about specific time-bound relationships), Explicit inference (In explicit inference conditionals, neither of the clauses has parallel tenses and aspects.)

The use of conditional in French

Conditional in French is used in a plethora of situations. The most common situations are listed below.

a) To express a condition in the conditional sentences i.e. in the si-clause (if-clause).
   Example : Si j'avais le temps, je lirais une bibliothèque entière!
   Transcription : [si] [jave] [lə] [tɑ̃] [ʒə] [liʁɛ] [yn] [biblijɔtɛk] [ɑ̃tjɛʁ]
   Translation : If I had time, I would an entire library.

b) To express something politely especially in making a request or asking for something.
   Example : Pourrais-tu fermer la fenêtre s'il te plaît?
   Transcription : [puʁɛty] [fɛʁme] [la] [f(ə)nɛtʁ] [sil] [tə] [plɛ]
   Translation : Could you please close the window?

c) To convey a desire.
   Example : J'aimerais tellement que tu viennes chez moi.
   Transciption : [ʒɛməʁɛ] [tɛlmɑ̃] [kə] [ty] [vien] [ʃe] [mwa]
   Translation : I highly want that you come to my house.

d) To express a hypothesis.
   Example : Les pertes s'élèveraient à des milliards d'euros.
   Transcription : [le] [pɛʁt] [sel(ə)vʁɛ] [a] [de] [miljaʁ] [døʁo]
   Translation : The loss could mount to billions of dollars.

e) To express a future action mentioned in the indirect speech.
   Example : Il annonça que lorsque le vent s'élèverait, son bateau repartirait pour de bon.
   Transcription : [il] [anɔ̃sa] [kə] [lɔʁskə] [lə] [vɑ̃] [sel(ə)vʁɛ] [sɔ̃] [bato] [ʁ(ə)paʁtiʁɛ] [puʁ] [də] [bɔ̃]
   Translation : He annouced that when the wind picked up, his boat would set off for good.

f) To express an imaginative situation.
   Example : Toi, tu serais le cow-boy et, moi, je serais l'Indien.
   Transcription : [twa] [ty] [səʁɛ] [lə] [kaʊˌbɔɪ] [e] [mwa] [ʒə] [səʁɛ] [lɛ̃djɛ̃]
   Translation : You, you would be the cow-boy and I would be the Indian.

g) To express advice and suggestions.
   Example : Tu devrais aller chez le médecin.
   Transcription : [ty] [d(ə)vʁɛ] [ale] [ʃe] [lə] [med(ə)sɛ̃]
   Translation : You should go to the doctor's chamber.

h) To express reproach.
   Example : Tu pourrais arrêter de me faire des reproches!
   Transcription : [ty] [puʁɛ] [aʁete] [də] [mə] [fɛʁ] [de] [ʁ(ə)pʁɔʃ]
   Translation : You could stop blaming me.

i) To express regret.
Example : J'aurais aimé être un meilleur ami.
Transcription : [ʒɔʁɛ] [eme] [ɛtʁ] [ɶ̃] [mɛjœʁ] [ami]
Translation : I wish I had been a best friend.

j) To express a dream.
Example : J' aimerais devenir médecin.
Transcription : [ʒɛməʁɛ] [dəv(ə)niʁ] [med(ə)sɛ̃]
Translation : I would like to become a doctor.

k) To express the future from a past point of view.
Example : Elle pensait qu'elle pourrait partir en vacance.
Transcription : [Ɛl] [pɑ̃se] [kƐl] [puʁɛ] [paʁtiʁ] [ɑ̃] [vakɑ̃s]
Translation : She thought that, she could go on vacation.

l) To express a probability in the future.
Example : Elle viendra demain.Elle devrait arriver tôt.
Transcription : [Ɛl] [viɑ̃dʁa] [d(ə)mɛ̃] [Ɛl] [d(ə)vʁɛ] [aʁive] [to]
Translation : She will come tomorrow. She should arrive early.

m) To express an eventuality or possibility.
Example : Tu serais capable de diriger une équipe?
Transcription : [ty] [səʁɛ] [kapabl] [də] [diʁiʒe] [yn] [ekip]
Translation : Would you able to lead a team?

n) To express an information without certainty.
Example : Il se pourrait qu'il vienne demain.
Transcription : [il] [sə] [puʁɛ] [kil] [vien] [d(ə)mɛ̃]
Translation : He might come tomorrow.

o) To express a possible action or condition in the present. It is often used with exclamation or questions.
Example : Quelle heure serait-il? Il serait trois heures.
Transcription : [kel] [œʁ] [səʁɛtil] [il] [səʁɛ] [tʁwɑ] [zœʁ]
Translation : What time it could be? It could be three o'clock already.

p) Used by journalists and reporters to describe an action that is unsure or not known to be true.
Example : Il serait à Dhaka aujourd'hui.
Transcription : [il] [səʁɛ] [a] [daka] [oʒuʁdɥi].
Trasnlation : He might be in Dhaka today.

q) To describe an action that would happen in certain circumstances. In such situation the term"would" used before the main verb.
Example : Dans ce cas là, je partirais.
Transcription : [dɑ̃] [sə] [kɑ] [la] [ʒə] [paʁtiʁɛ]
Translation : In that case I would leave.

r) Used after certain conjunction such as quand, lorsque, au moment où, dès que, aussitôt que, tant que, pendant que, tandis quewhen the main verb is in conditional.
Example : Il lirait le livre quand il aurait le temps.
Transcription : [il] [liʁɛ] [lə] [livʁ] [kɑ̃] [til] [ɔʁɛ] [lə] [tɑ̃]
Translation : He would read the book when he had time.

s) Alsolso used after au cas où. In such situation, the main verb can be in any tense.
Example : J'attendrai encore une heure au cas où il viendrait.
Transcription : [ʒatɑ̃dʁɛ] [ɑ̃kɔʁ] [yn] [œʁ] [o] [ka] [u] [il] [viɑ̃dʁe]
Translation : I shall wait another hour in case he comes.

Types of conditional form of French verbs

Understanding how to conjugate French verbs into conditional form is one of the most effective initial steps to approach the conditional in French. The conditional form of French verbs can be mainly classified into two types: a) Present conditional, b) Past conditional. Again past conditional can take two distinct forms. Hence, French conditional verbs can take three different forms in total :

i) Present conditional form
ii) Past conditional first form
iii) Past conditional second form

The conjugation of the French verb "Parler" (To speak) shown in the following table illustrates three different types of conditional form of verb in French :

Present Conditional	**Past Conditional**	
	Past Conditional first form	**Past Conditional Second Form**
Je parlerais	J'aurais parlé	J'eusse parlé
Tu parlerais	Tu aurais parlé	Tu eussesparlé
Il, elle, on parlerait	Il, elle, on aurait parlé	Il, elle, on eût parlé
Nous parlerions	Nous aurions parlé	Nous eussions parlé
Vous parleriez	Vous auriez parlé	Vous eussiez parlé
Ils/elles parleraient	Ils/elles auraient parlé	Ils/elles eussentparlé

Table 1 : Present conditional and past conditional forms of verb "Parler"

Conjugation of French verbs in Present conditional

The present conditional is formed by adding the ending of imperfect tense (L'imparfait) i.e. ais, ais, ait, ions, iez, and aient to the stem of the future indefinite form. It is important to remember that the stem of the first group and second group verbs is similar to the base form of the concerned verb. However, since the verbs of

the third group are irregular, their stems undergo slight changes orthographically. The following table illustrates the orthographic changes of the three different group of French verbs.

Conjugation of first group of verbs	**Conjugation of second group of verbs**	**Conjugation of third groups of verbs**		
Danser [dɑ̃se] (Todance)	**Finir[finiʁ] (To finish)**	**Répondre [ʁepɔ̃dʁ] (To respond)**	**Être [ɛtʁ] (To be)**	**Avoir [avwaʁ] (To have)**
Je danserais	Je finirais	Je répondrais	Je serais	J'aurais
Tu danserais	Tu finirais	Tu répondrais	Tu serais	Tu auras
Il, Elle, On danserait	Il, Elle, On finirait	Il, Elle, On répondrait	Il, elle, on serait	Il, elle, on aura
Nous danserions	Nous finirions	Nous répondrions	Nous serions	Vous auriez
Vous danseriez	Vous finiriez	Vous répondriez	Vous series	Nous aurions
Ils, elles danseraient	Ils, elles finiraient	Ils, elles, répondraient	Ils,elles seraient	Ils, elles auraient

Table 2 : Conjugation of three groups of French verbs in present conditional form

Several French verbs have irregular roots in the future simple tense. The same irregular roots are used for forming conditional form.Some examples are given below.

Infinitive/base form of verbs	**Irregular Root**	**Infinitive/base form of verbs**	**Irregular Root**
Aller [ale] (To go)	Ir-	Avoir [avwaʁ] (To have)	Aur-
Devoir [d(ə)vwaʁ] (To have to)	Devr-	Être [ɛtʁ] (To be)	Ser-
Faire [fɛʁ] (To do)	Fer-	Falloir [falwaʁ] (To be needed)	Faudr-
Pleuvoir [pløvwaʁ] (To rain)	Pleuvr-	Pouvoir [puvwaʁ] (To have ability)	Pourr-
Savoir [savwaʁ] (To know)	Saur-	Valoir [valwaʁ] (To be worth)	Vaudr-
Venir [v(ə)niʁ] (To come)	Viendr-	Voir [vwaʁ] (To see)	Ver-
Vouloir [vulwaʁ] (To wish)	Voudr-		

Table 3 : Irregular root of most common French irregular verbs

However, there are a good number of French verbs which undergo several other internal changes when conjugated into present conditional form.

1. Verbs such as employer, ennuyer, envoyer, essayer, nettoyer, payer etc whose infinitive forms end in –oyer, -uyer and –ayer change –y- to –i- when conjugated into Present conditional.

Envoyer [ɑ̃vwaje]	**To send**
J'envoierais	I would send
Tu envoierais	You would send
Il, Elle, On envoierait	He, she, we would send)
Nous envoierions	We would send
Vous envoieriez	You would send
Ils, Elles envoiraient	They would send

2. When appeler and jeter verbs are conjugated into condiotional form, the last consonant letter is doubled.

Appeler [ap(ə)le]	**To call**
J'appellerais	I would call
Tu appellerais	You would call
Il, elle, on appellerait	He, she, we would call
Nous appellerions	We would call
Vous appelleriez	You would call
Ils, elles appelleraient	They would call

3. Verbs such as courir, parcourir, secourir, sourire, mourir etc which end with –rir or –rire drop the –ir or-ire and the first –r- is doubled. For example :

Secourir [s(ə)kuʀiʀ]	**To help out/rescue**
Je secourrais	I would help/rescue
Tu secourrais	You would help/rescue
Il, elle, on secourrait	He, she, we would help/rescue
Nous secourrions	We would help/rescue
Vous secourriez	You would help/rescue
Ils, elles secourraient	They would help/rescue

4. Verbs such as *acheter*, *mener*, *amener*, *emmener*, *promener* etc which contain a –e- immediately before the last syllable of the infinitive form, the –e- changes into –è- when conjugated in the present conditional form. For example :

Promener [pʀɔm(ə)ne]	**To take a walk**
Je promènerais	I would take a walk
Tu promènerais	You would take a walk
Il, elle, on promènerait	He, she, we would take a walk
Nous promènerions	We would take a walk
Vous promèneriez	You would take a walk
Ils, elles promèneraient	They would take a walk

Conjugation of the French verbs in past conditional form

Past conditional (Le conditionnel passé) corresponds to the English structure *would have + past participle*. These structure is used to look back on past situations and express alternative outcomes. To conjugate the past conditional (le conditionnel passé), we use the conditional form of avoir/être followed by the participe passé of the verb. As mentioned earlier, Past conditional in French has two forms :

I. Past Conditional first form
II. Past conditional second form.

The past conditional first form is formed by adding past participle form of the verb after the present conditional form of the verb être or avoir. The auxiliary verb *être* is used with reflexive verbs and with the 14 movement verbs i.e. *naître, mourir, aller, venir, montrer, descendre, arriver, partir, entrer, sortir, rester, retourner, tomber,* and *rentrer* and their related forms such as *revenir, remonter, redescendre, repartir* etc.

The second form of past conditional is formed by adding past participle form of the verb after the imperfect subjunctive form of the verb *être* or *avoir*. This form is used in standard language and is usually found in literature. The imperfect subjunctive form of the auxiliary verb *être* is used with reflexive verbs and with the 14 movement verbs. The following table illustrates the conjugation of past conditional first form and past conditional second form.

Past Conditional First Form	**Past Conditional Second Form**
Chercher [ʃɛʀʃe] (To search)	Chercher [ʃɛʀʃe] (To search)
J'aurais cherché (I would have searched)	J'eusse cherché (I would have searched)
Tu aurais cherché (You would have searched)	Tu eusses cherché (You would have searched)
Il, elle, on aurait cherché (He, she, we would have searched)	Il, elle, on eût cherché (He, she, we would have searched)
Nous aurions cherché (We would have searched)	Nous eussions cherché (We would have searched)
Vous auriez cherché (You would have searched)	Vous eussiez cherché (You would have searched)
Ils, elles auraient cherché (They would have searched)	Ils, elles eussent cherché (They would have searched)

Si Clauses

The conditional mood is generally taught by exploring *si clauses* (if clauses) first. Similar to English, there are three *si* clauses in French. All types of conditional sentences containing a si-clause have two parts : A *"protasis"* (condition clause)

and a apodosis (a result or main clause). Only four tenses of the indicative mood may normally be used in the *si* clause in French. These four tenses are the present tense, the present perfect tense (*passé compose),* the past progressive tense (imparfait), and the *plus- que- parfait.* The tense used in the main clause is the same in both French and English. In a conditional sentence, *si* is equivalent to "if" in English.

Si-clauses (condition clause) in French are used to express two types of conditions : real condition and unreal/counterfactual condition
Real conditions

A condition that describes what is possible or likely to happen in the present or past is called a "real" condition. The following sentence exemplifies a real condition.

Example : Si tu me téléphones, je te parlerai.
Transcription : [si] [ty] [mə] [telefɔn] [ʒə] [tə] [paʀleʀe]
Translation : If you call me, I shall speak to you.

The subordinate clause of the abovementioned sentence is a condition clause. Here, the condition is "*Si tu me téléphones"*(if you call me). The main clause of the condition expresses that the result of the condition "*je te parlerai" (*I shall speak to you)is very likely to happen.

The sequence of tenses used for a real condition is shown in the following table.

Type of Condition	**Tense used in the si-clause**	**Tense/mood used in the main clause**
a) A real possibility in the present or future	Present	Present, Future, or imperative mood
b) A real possibility in the past	Passé compose	The same tense one would use in English

As it is evident from the table, a present tense or a *passé composé* must be used in the condition clause (si-clause) to express a real condition. So the condition clause for *expressing* a real condition will have any of the following two forms : a) si+ present simple, or b) si+ *passé composé.*

a) **Si followed by simple present**

Example : Si j'ai soif, je bois de l'eau.
Transcription : [si] [ʒe] [swaf] [ʒə] [bwa] [də] [lo]
Translation : If I'm thirsty, I drink water.

b) Si followed by passé composé

Example : Si j'ai bien compris, elle a changé d'avis.
Transcription : [si] [ʒe] [bjɛ̃] [kəm prī] [ɛl] [a] [ʃɑ̃ʒe] [davi]
Translation : If I understood correctly, she changed her mind.

It is also very important to note that either clause may begin the sentence.If the sentence begins with a conditional clause, then a comma must be put between the condition clause and the subordinate clause. However, if the sentence begins with the main clause there is no need to use a comma. Example :

a) Tu réussiras si tu étudies beaucoup.
Transcription : [ty] [ʀeysiʀa] [si] [ty] [etydi] [boku]
Translation : You will succeed if you study a lot.

b) Si tu étudies beaucoup, tu réussiras.
Transcription : [si] [ty] [etydi] [boku] [ty] [ʀeysiʀa]
Translation : If you study well, you will succeed.

Unreal condition/Counter Factual Conditions

A conditional sentence that describes a situation or event that is unlikely to happen is called "contrary- to- fact" or "unreal". For example :

Example : S'il pleuvait, je ne sortirais pas.
Transcription : [sil] [*pløve] [ʒə] [nə] [sɔʀtiʀe] [pa]*
Translation : (If it rained, I wouldn't go out.)

The abovementioned example shows that the action did not occur because the condition mentioned in the conditional clause did not happen.

The sequence of tenses for an unreal/ a contrary- to- fact condition is shown in the following table :

Condition	**Tense used in the si-clause**	**Tense/mood in the main clause**
a) Unrealized, unreal, contrary-to-fact or unlikely in the present or future	Imparfait	Generally the conditional or may be the same as in English
b) Unrealized, unreal, contrary –to-fact, or unlikely in the past	Plus-que parfait	The same tense one would use in English

The table illustrates that in order to express an unreal/a counter-factual condition, a past progressive or a past perfect tense must be used in the condition clause (si-clause). So the condition clause for expressing an unreal condition will have any of the following two forms : si + imparfait, or si + *plus que parfait*.

i) Si + imparfait

Example : Si j'étais riche, je m'achèterais une nouvelle maison.
Transcription : [si] [ʒete] [ʀiʃ] [ʒə] [maʃ(ə)teʀe] [yn] [nuvɛl] [mɛzɔ̃]
Translation : If I were rich, I would buy myself a new house.

ii) Si+ plus que parfait

Example : Je serais venu *à* la gare, si j'avais su que tu venais.
Transcription : [ʒə] [səʁɛ] [v(ə)ny] [a] [la] [gaʁ] [si] [ʒave] [sy] [kə] [ty] [v(ə)nɛ]
Translation : I would have come to the station if I had known you were coming.

Based on whether the conditional sentence express likely, unlikely, or impossible, si-clauses are divided into three types

a) First conditional sentence : To express likely condition.
b) Second conditional sentence : To express unlikely condition
c) Third conditional sentence : To express impossible condition

First Conditional

The first conditional expresses that certain actions will take place in the future on the condition that an event occur in the present. The first *si* clause doesn't actually use the conditional mood at all, so the learners do not need to learn the conditional forms of French verbs. The structure of first conditional is *Si+ present/present perfect, present future or imperative mood*.

Example : Si j'ai le temps, je t'appellerai.
Transcription : [si] [ʒe] [lə] [tɑ̃] [ʒe] [tap(ə)leʁe]
Translation : If I have time, I'll call you.

Second conditional

The second conditional expresses an unlikely situation. It implies that certain action is possible but not likely to happen. The second *si* clause in French is constructed using the following structure : Si + imparfait (present progressive, present conditional.

Example : Si j'avais le temps, je t'appellerais.
Transcription : [si] [ʒave] [lə] [tɑ̃] [ʒe] [tap(ə)leʁɛ]
Translation : If I had time, I would call you.

Third conditional

This *si* clause expresses a certain amount of regret. It expresses the same idea that "should have" or "could have" convey in English. Like the *plus-que-parfait*, the past conditional is made up of the conditional of the auxiliary verb *être* or *avoir* and the past participle of the lexical verb. The structure of the third *si* clause in French is as follows : Si + Pluperfect, Past Conditional.

Example : Si j'avais eu le temps, je t'aurais appelé.
Transcription : [si] [ʒave] [o] [lə] [tɑ̃] [ʒe] [tɔʁe] [ap(ə)le]
Translation : If I had had time, I would have called you.

Negation in the Conditional

To negate an affirmative conditional sentences, ne(n') is used before the conditional verb and *pas* is used after the conditional verb.

Example : Je ne chanterais pas la chanson.
Translation : [ʒə] [nə] [ʃɑ̃teʁɛ] [pɑ] [la] [ʃɑ̃sɔ̃]
Transcription : I would not sing.

To negate an inverted question, *ne* and *pas* are put around the inverted form. It is important to note that all object and adverbial pronouns must remain before the conjugated form of the verb.

Example : Ne la consulterait- il pas?
Translation : [nə] [la] [kɔ̃syltɛʁɛtil] [pɑ]
Transcription : Wouldn't he consult her?

In negative sentences, the past participle comes after the second part of the negation *(pas)*.

Example : Je ne serais pas venu.
Transcription : [ʒə] [nə] [səʁɛ] [pɑ] [v(ə)ny]
Translation : I would not come.

To negate a sentence in the past conditional (*conditionnel passé*), simply put *ne* and the negative word around the conjugated helping verb. In case of reflexive verbs, the reflexive pronoun and the auxiliary verb are put between the two parts of the the negation i.e. ne…pas/jamais etc.

Example : Il ne les aurait jamais achetées ces livres.
Transcription : [il] [nə] [le] [zɔʁɛ] [ʒamɛ] [aʃ(ə)te] [se] [livʁ]
Translation : He never would have bought these books.

Questions in the conditional

To form a question using inversion, the order of the subject pronoun and the verb is reversed and joined with a hyphen

Example : *Travaillerais- tu en France?*
Transcription : [tʁavajeʁɛty] [ã] [fʁɑ̃s]
Translation : Would you work in France?

To negate an inverted question, *ne* and related the negative expressions i.e. *pas, jamais, personne* etc are used around the inverted form. It should be remembered that all object and adverbial pronouns must remain before the conjugated form of the verb.

Example : Ne travaillerais- tu pas en France?
Transcription : [nə] [tʁavajeʁɛty] [pɑ] [zã] [fʁɑ̃s]
Translation : Wouldn't you work in France?

Agreement of the participe passé in conditional sentence

The past pasrticple (*participe passé) of* certain verbs in French must agree in gender and number. For verbs constructed with *être*, the participle agrees in gender and number with the subject of the sentence.

Example : Il serait parti en voyage.
Transcription : [il] [səʁɛ] [paʁti] [ã] [vwajaʒ]
Transcription : [ɛl] [səʁɛ] [paʁti] [ã] [vwajaʒ]
Example : Elles seraient parties en voyage.

Translation : He would have gone on a trip.
Translation : They would have gone on a trip.

For verbs that are constructed using *avoir*, the past participle form agrees in gender and number with a direct object that comes before the verb. This direct object can take three possible forms : a personal pronoun *(me, te, le, la, nous, vous, les)*, the relative pronoun *que*, or a noun that comes before the verb (in questions and exclamations).

Examples : a) Il l'aurait interrogé.
Transcription : [il] [lɔʀɛ] [ẽtɛʀɔʒe]
Translation : He interrogated him.(Masculine gender singular number)

b) Il les aurait interrogées.
Transcription : [il] [le] [zɔʀɛ] [ẽtɛʀɔʒe]
Translation : He interrogated them. (Feminine gender plural number)

In the case of reflexive verbs (which always take *être* as their auxiliary in the *conditionnel passé*), the past participle form generally agrees with the subject.*For example :*Nous nous serions levés trop tard. (We would have got up too late). The exception to this rule concerns direct objects i.e. the participle does not agree if the reflexive verb is followed by a direct object.

Example : Elle se serait lavé les mains.
Transcription : [ɛl] [sə] [səʁɛ] [lave] [le] [mẽ]
Translation : She would have washed her hands
but: Elle se serait lavée.
Transcription : [ɛl] [sə] [səʁɛ] [lave]
Translation : She would have washed herself

Common mistakes in using Conditional in French

The conditional seems apparently quite simple but there are a few common mistakes which not only the foreign learners but also the native speakers often commit while using the conditional. One of the most common mistakes made is the overuse of the politeness aspect of the conditional. Some learners assume that because the conditional makes a sentence more polite, using conditional form of all verbs will make the sentences more polite. Unfortunately this is not the case. The politeness aspect of the conditional should be used only with verbs expressing desire, like *vouloir***,** *aimer***,** *and désirer* or with verbs that incite action from the other person—like *pouvoir* or *devoir***.**

Another mistake that is very commonly committed by French speaking people is using the conditional on both sides of the *si* clause. For example : *Si j'aurais su, je l'aurais fait.* (If I would have known, I would have done it.). This sentence is grammatically incorrect. The correct sentence construction would be : "*Si j'avais su, je l'aurais fait*." (If I had known, I would have done it.) The ground ruleis that one should never use the conditional form of the verb immediately after *si*in the conditional clause.

Why difficult for French as a Foreign Language Speakers

The learners of French as Foreign Language face several difficulties in understanding the form of French conditional as well as the meaning expressed by these forms. First of all, the term "le conditionnel" (conditional) in French can be misleading because all conditional sentences do not always include a verb in the conditional form. This is because the term 'conditional' do not refer to the mood of the verb. Rather, it refers to the fact that each conditional sentence includes a condition in the subordinate clause and the fulfillment of the result expressed in the main depends on this condition expressed in the subordinate clause.

Secondly, the conditional form is used to express the fact that the occurrence of a certain event is dependent on the fulfillment of a certain condition. In English, modal verbs like "would" and "could" are used in such case, In French, one needs to use a whole new form of conjugation to evoke the same meaning. This is one of the reasons that the conditional can seem very challenging to the foreign learners.

Thirdly, learners of French as a foreign language encounter a big obstacle in acquiring conditionals because of the different possible meanings expressed through conditional sentences, such as cognitive reasoning, counterfactual, possible and impossible, real and unreal, and hypothetical. More specifically, forms, meanings and time-tense relationships cause the major difficulties in conditional sentences (Nekoueizadeh and Bahrani 2013 cited in Gardner 2017). For example, the people who speaks English either as first language or as a second language, cannot differentiate the subtle differences between the uses of senses of the English word "would". The word "would" is used in English to refer to the same sense expressed by both imparfait and present conditional in French. For example : *J'irais à Dhaka.* (I would go to Dhaka.) *J'allais fréquemment à Dhaka*. (I would [used to] go to Dhaka frequently.) There is a difference between "would" as used to form the conditional and the verb *vouloir* in the imperfect or in the *passé composé* to express "would" in the sense of "to be willing" : *Sous ces conditions, il signerait le contrat.* (Under those conditions, he would sign the contract.) *Il ne voulait pas signer le contrat* or *Il n'a pas voulu signer le contrat.* (He wouldn't [wasn't willing to] sign the contract.)

There is also another difficulty rising from the use of could to refer to the sense expressed by both conditional and imparfait form of *pouvoir* verb. The conditional form of the verb pouvoir is used to mean "should be able to" but the imparfait form of the verb pouvoir is used to mean "was able to". However, only "could" isused in English to refer to the same sense. For example : *Il pourrait gagner*. (He could win.). *Il ne pouvait pas gagner* or *Il n'a pas pu gagner.* (He could not win.)

Is French conditional a Mood or a tense?

There is a controversy among the grammarian and the linguists regarding the status of conditional in French. Many claim that conditional is not actually a tense. They opine that the conditional in French is a mood. They think that the French conditional is erroneously referred to as a tense. According to them, conditional is somewhat of a misnomer. Like the indicative and the imperative mood, the conditional is a mood. Moods, unlike tenses, describe how an action takes place, not when. Conjugated verbs have a mood and a tense, and because the conditional can be conjugated in the past, it's a mood, not a tense. Most tenses are first learned in the indicative mood; then other moods such as the conditional, the imperative and the subjunctive are learned.

While others say that the conditional in French is a tense. For example, Grevisse et al. (2016) mentioned that the conditional in French was considered as a mood earlier. But now a days it is no longer considered as a mood.

The controversy has evolved along with the gradual development of French Language. According to Dailey (1942), conditional was not known in Latin. It came into being in French during the emergence of French language from Vulgar Latin. Gradually it has overtaken the function of the both a tense and a mood. In addition, it sometimes replaces the imperfect subjunctive, which seems destined to disappear from French.

Moulton (1942) attempted to provide a sound explanation of this situation. He mentioned that "besides, the Grammar of the French Academy, which defines the conditional as a mood which indicates an action or a state whose completion depends on a condition. He also mentioned that the French Academy in its grammar book (p. 185) mentioned that "the conditional has sometimes the value of mood and sometimes the value of time. Moulton (1942) also raised several valid questions on the issue i.e. "But if the conditional has the value of a tense, to what mood does it then belong? If it is no longer conditional, is it indicative or subjunctive? Moulton concluded his opinion saying that conditional "is a tense of the indicative which has been substituted little by little for the subjunctive, in indirect discourse, in conditional sentences, and in all its so-called potential uses. It is constantly being used to replace the subjunctive."

Conclusion

Conditional is one of the most difficult grammatical components not only in French language but also in all other languages. Like English conditional, French conditional is both linguistically and cognitively intricate. The difficulty of conditional sentences arises from the complexity of two clauses in the conditional sentences, the dependence of the matrix clause on the realization of the condition clause, the myriad number of semantic meanings, forms of the verbs and syntactic realization. This is why many non-native speakers struggle a lot in understanding and producing effective conditional sentence.

References

Abdollahi-Guilani, M. Yasin, M. S. M. Hua, T. K. (2019). 'A Comparative Analysis of Conditional Clauses in English and Persian : Text Analysis'. *The Southeast Asian Journal of English Language Studies* – Vol 18(2) : 83–93

C. Miguel (2013). *Vite et Bien (A1&A2).* CLE Internationals, Paris

C. Raguseo (2013). 'Semantic Taxonomy of Conditional Sentences and its Pedagogical Implications for ELT'. *Revista de Investigaciones y Propuestas Educativas. IES "Olga Cossettini".* Vol.11.

G. Moulton (1942). 'What is French Conditional?'. *The Modern Language Journal*, Vol. 26, No. 6 (Oct., 1942), pp. 461–463.

Hafz' Al Rdaat, S. Gardner (2018). 'An Analysis of Use of conditional Sentences by Arab Students of English'. *Advances in Language and Literary Studies.* Vol. 8 No. 2.

J. Giradet, J. Pécheur (2010), *Écho : Méthode de Français.* B1. Vol. 2. CLE International, Paris.

M. E. Coffman (1981). *Schaum's Outline of French Grammar.* McGraw-Hill Book Company, New York.

M. Grevisse, & M. Goosse (2016). *Le Bon Usage* (16th edition). De BoeckSupérieur. Bruxelles.

R. Colbert (1972). *Brief French Reference Grammar.* Heinle & Heinle Publishers, Boston.

R. Menand (2009). *Le Nouveau Taxi 2 : Méthode de Français.* Hachette, Paris.

R. Menand (2010). *Le Nouveau Taxi 3 : Méthode de Français*. Hachette, Paris.

T. A. Dailey (1942). What is the French Conditional? *The Modern Language Journal.* Vol. 26, No. 2 (Feb., 1942), pp. 133–136